আওয়ামী দুঃশাসন

একটি প্রামাণ্য দলিল

বাংলাদেশ গবেষণা কেন্দ্র ঢাকা

আওয়ামী দুঃশাসন
একটি প্রামাণ্য দলিল

সম্পাদনা পরিষদ

ড. মাহবুব উল্লাহ
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আফতাব আহমাদ
প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা

ড. আবদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর আব্দুন নূর
প্রফেসর, লোক প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা

ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব
প্রফেসর, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাহ আহমদ রেজা
বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

গবেষণা সহযোগী

মোকাররম হোসেন, মোঃ মনিরুজ্জামান
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম, মোঃ আমজাদ হোসাইন

বাংলাদেশ গবেষণা কেন্দ্র ঢাকা

আওয়ামী দুঃশাসনঃ একটি প্রামাণ্য দলিল

প্রকাশক: বাংলাদেশ গবেষণা কেন্দ্র
ধানমন্ডি, ঢাকা।

প্রকাশকাল: শ্রাবণ, ১৪০৮
জুলাই, ২০০১
জমাদিউল আউয়াল, ১৪২২

প্রচ্ছদ: ফরিদী নূমান

বিনিময়: ১০০.০০ টাকা
৫.০০ মার্কিন ডলার

AWAMI DUSHASHAN: EKKTI PRAMANNYA DALIL
(Awami Misrule: An Authentic Document)
Published by Bangladesh Gobeshana Kendra, Dhanmondi, Dhaka.
First Edition 2001 (July), Price: Tk. 100.00 (US $ 5.00).

প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের আজাদী-ইজ্জতের হেফাজত করতে গিয়ে রৌমারীর বড়াইবাড়ী সীমান্তে হানাদার হিন্দুস্তানী বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণকারী তিন *বিডিআর জওয়ান*

শহীদ ওয়াহিদ মিয়া,

শহীদ আব্দুল কাদের ও

শহীদ মাহফুজুর রহমান-এর

গর্বিত স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

মুখবন্ধ

১৯৭২-১৯৭৫ (আগষ্ট) এবং ১৯৯৬ (জুন) থেকে শুরু করে ২০০১ -এর জুলাই পর্যন্ত মোট দু'পর্বের আওয়ামী শাসনামলের প্রায় আট বছরের দুঃসহ নৈরাজ্য আর অপশাসনের একটি তথ্য সমৃদ্ধ প্রামাণ্য প্রতিবেদন হিসেবে উপস্থাপন করা হল **আওয়ামী দুঃশাসনঃ একটি প্রামাণ্য দলিল** -এ। বাংলাদেশে আওয়ামী শাসনের প্রথম পর্ব যা ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ (আগষ্ট) পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বছর স্থায়ীত্ব লাভ করেছিল, তা জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে 'মুজিবী আমল' বা 'বাকশালী দুঃশাসন' হিসেবে এক বিভীষিকাময় কাল হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের স্বৈরশাসনের ঐ দুঃসময় দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি, হত্যা, লুটপাট, চুরি-ডাকাতি আর ধর্ষণ-অপহরণের এক অবর্ণনীয় অধ্যায় হিসেবে দেশে বিদেশে চিহ্নিত হয়ে আছে।

১৯৯৬ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর জুন মাসে সুদীর্ঘ ২১ বছর পর মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আরোহণ করলে দেশে শুরু হয় আওয়ামী দুঃশাসনের দ্বিতীয় পর্ব। একুশ বছর পর ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পুনরায় শুরু করে সেই বাকশালী তান্ডব। দেশের নগরে-বন্দরে আর গ্রামে-গঞ্জে, হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি, চুরি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ঘুষ, ইসলামদলন, অপহরণ ইত্যাদির সয়লাব বয়ে যেতে থাকে। দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও শেখ হাসিনা নিজেই প্রকাশ্যে **'এক লাশের বদলে দশ লাশ ফেলে দেওয়ার'** ঘোষণা দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম, মন্ত্রী মায়া ও সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে হাইকোর্টের রায় ও বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল এবং চাপাতি-কিরিচ মিছিল বের হয় প্রকাশ্য রাজপথে। এমনি এক নৈরাজ্যময় ভয়াল পরিবেশে জাতি এক ঘন-তমশাচ্ছন্ন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির দিকে অসহায়ভাবে ধেয়ে যাচ্ছে। অসহায় বিপন্ন জাতির সম্বিত ফিরিয়ে এনে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনা এবং দেশী-বিদেশী সকল আগ্রাসী ও তাবেদার শক্তির ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত কে উন্মোচিত করে দেশের সম্বিতহারা জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মাধ্যমে পবিত্র স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হেফাজত করার জন্য আমাদের এ সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ।

আওয়ামী দুঃশাসনঃ একটি প্রামাণ্য দলিল মূলতঃ একটি সম্পাদিত ও সংকলিত গবেষণা গ্রন্থ। উপযুক্ত প্রমাণপঞ্জি ও তথ্য সমৃদ্ধ করে গ্রন্থখানা প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। গ্রন্থখানা সংকলনে দেশের বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য সাময়িক সংবাদপত্র থেকে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ কাজটিতে সূচী বিশ্লেষণ ও

পর্যালোচনা পদ্ধতির (Content Analysis Technique) গবেষণা কৌশল অনুসৃত হয়েছে। সংবাদপত্র ছাড়াও এ সংকলন তৈরীতে বিভিন্ন গবেষক ও লেখকের প্রামাণ্য তথ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন ভাষ্য ও গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এসব পুস্তকাবলীর মধ্যে প্রবীণ রাজনীতিবিদ মিজানুর রহমান চৌধুরীর *'রাজনীতির তিনকাল'*, লেখক আহমেদ মুসার *'ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ'*, সাংবাদিক ও লেখক মুনির উদ্দিন আহমদ -এর *'বাংলাদেশঃ বাহাত্তর থেকে পচাঁত্তর'*, লেঃ (অবঃ) আবু রুশ্দ -এর *'বাংলাদেশে 'র'*, উল্লেখযোগ্য। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সমূহের মধ্যে সূচী বিশ্লেষনে বহুল ব্যবহৃতগুলো হচ্ছেঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ইনকিলাব, যুগান্তর, ডেইলী স্টার, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সংগ্রাম, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, দিনকাল, মানবজমিন এবং সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, যায় যায় দিন, উইকলি হলিডে ইত্যাদি। আমরা আন্তরিকভাবে ঐসব গ্রন্থ ও সংবাদপত্রের সম্মানিত সম্পাদকবৃন্দ এবং লেখকদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আওয়ামী দুঃশাসনঃ একটি প্রামাণ্য দলিল সংকলনটির উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা, রচনা ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্বে আমরা অনেক সুহৃদ সুধীজনের সাহায্য লাভ করেছি। আমরা ঐসব সহৃদ সুধীজনের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। এ গ্রন্থের গবেষণা পর্বের জটিল ও কষ্টসাধ্য ধারায় সম্পৃক্তি সকল তরুণ-গবেষকবৃন্দ ও সংকলকদের কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। জাতিকে জাগানোর এ মহৎ উদ্যোগকে সফলতা দান করে আল্লাহ যেন তরুণ গবেষকবৃন্দকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা দান করেন -এ দোয়া আমাদের। পরিশেষে শ্রমসাধ্য এ গবেষণা কর্মের চূড়ান্ত প্রকাশনায় আন্তরিক সহযোগিতার জন্য সংশিষ্ট সকল মহল ও ব্যক্তিবর্গকে আমাদের তরফ থেকে হৃদয় নিঙড়ানো শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

তারিখ ঃ ৩০ জুলাই, ২০০১, ঢাকা। প্রকাশক

ভূমিকা

তস্‌বি-হেজাব পরে ইসলামী বেশভূষা ধারণ করে অতীতের (১৯৭২-১৯৭৫) বাকশালী ফ্যাসিস্ট অপশাসনের জন্য জাতির কাছে কাতর ক্ষমা প্রার্থনা করে ১৯৯৬-র জাতীয় নির্বাচনে মাত্র ৩৬ ভাগ ভোট পেয়ে শেখ হাসিনা তার নেতৃত্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ভারতপন্থী আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। ভারত বেষ্টিত দারিদ্রপীড়িত জনভারাক্রান্ত আমাদের প্রিয় মাতৃভুমির জনসাধারণ ভেবেছিল একুশ বছর পর ক্ষমতায় আসা এবারকার আওয়ামী লীগ হয়তো অতীতের ভুল শুধরে নিয়ে নতুন ধারায় দেশ-শাসনের মাধ্যমে দেশে শান্তি ও কল্যাণের পন্থা বেছে নিয়ে জনগণের কাছে অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্য করবে। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পরই নির্বাচনকালে ধার্মিকতার মুখোশ, কল্যাণের অঙ্গীকার এবং ওয়াদার কপট আর ছদ্ম-হেজাব খুলে ফেলে হাসিনার আওয়ামী লীগ খুব দ্রুতই হায়েনার হিংস্রতা আর ম্যাকিয়াভেলির ধূর্ততায় দেশের ১২ কোটি মানুষের ওপর চরম জিঘাংসা, তুঙ্গ আক্রোশ, আর নির্লজ্জ নিচতায় হত্যা, হামলা, লুটতরাজ ও ধ্বংশযজ্ঞে মেতে ওঠে। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগসহ অতীতের বাকশালের নবযুগের প্রেতাত্মাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহারে দেশের নগরে-বন্দরে আর গ্রামে-গঞ্জে এমনকি প্রতিটি জনপদেই গেষ্টাপো নৃশংসতা আর চেঙ্গিসী বর্বতার সয়লাব বইয়ে দিতে শুরু করলো। তাদের অপতৎপরতায় সরকারী বেসরকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা আর জনপদ পরিণত হল অরাজকতা আর নৈরাজ্যের এক একটি নরক কুন্ডে। দেশের জ্ঞান চর্চার উচ্চতর ক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রনিবাস সমূহ একে একে কাটা-রাইফেল ও কিরিচ-চাপাতির জোরে দখল করে নিলো ছাত্রলীগের গুন্ডা ও খুনী ক্যাডাররা। শামীম ওসমান, এরশাদ শিকদার, জয়নাল হাজারী, কামাল মজুমদার, হাজী সেলিম, হাজি মকবুল, 'বোমা মানিক', আর তাদের শত শত চ্যালা-চামুন্ডা নারকীয় উল্লাসে নতুন উদ্যোমে তাদের একুশ বছরের বুভুক্ষু রক্তলোলুপতা আর হিংস্র জিঘাংসা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফেনী, খুলনা, সিলেটসহ সারা বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে। স্নিগ্ধ-সবুজ শান্ত বাংলা অচিরেই পরিণত হল একটি চরম নৈরাজ্যের উপদ্রুত উপদ্বীপে। অফিস-আদালতে ঘুষ আর দুর্নীতির বন্যা বয়ে যেতে লাগলো। দেশের সীমান্ত অঞ্চল চোরাকারবারী ও চরমপন্থী সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হল। চাকুরী, ভর্তি আর পদোন্নতির প্রতিটি ক্ষেত্রে হীন দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের মহোৎসব শুরু হল। এমনকি উৎপীড়িত আর মজলুম জনগণের ন্যায়-বিচার লাভের শেষ আশ্রয়স্থল আদালতেও নগ্ন আওয়ামীকরণের তান্ডবে 'বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে' কাঁদতে শুরু করলো। বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজধানী ঢাকার উন্মুক্ত রাজপথে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় হাইকোর্ট-সুপ্রিমকোর্টের বিরুদ্ধে সম্মানিত বিচারপতিদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে লাঠি ও চাপাতি-কিরিচ-রামদা মিছিলেরও মহড়া হলো। উচ্চারিত হলো বিভিন্ন ভয়াল ও ভীতিকর শ্লোগান-হুংকার। প্রকাশ্য রাজপথে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি. চত্বরে নারী সমাজের

চরম অবমাননা করে জনসমক্ষে মহিলাদের বস্ত্র হরণেরও ঘটনা ঘটালো মুজিববাদী-ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এমনকি মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে ঘটা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সেক্রেটারী জসিম উদ্দীন মানিক ১৯৯৮ সনে তার "ছাত্রী-ধর্ষণের সেঞ্চুরী"-ও পালন করলো। ভয়, অপমান, আশংকা আর অনিশ্চয়তায় বাংলাদেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গ্রামীণ সকল নাগরিক স্তব্ধ আর বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। আওয়ামী প্রধান মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনা থেকে নিয়ে সকল ক্ষমতাসীন লীগ মন্ত্রী ও অন্যান্য নীতি-নির্ধারকবৃন্দ তাদের সীমান্তপারের প্রভু ভারত তোষণের পরম পারঙ্গমতা ও পরকাষ্ঠা প্রদর্শনের প্রতিযোগীতায় মেতে উঠলো মহাউল্লাসে ও চরম আনুগত্যে। এক কথায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ক্ষমতারোহণের পর আওয়ামী লীগ দেশের পরিবেশ পরিস্থিতিকে পুরোদমে নিয়ে গেলো তাদের সেই ঐতিহ্যগত চিরায়ত ফ্যাসিবাদী নৈরাজ্যের আঁধার খোঁয়াড়ে। দেশে আবার কায়েম হ'ল নব পর্যায়ে **'আওয়ামী জাহিলিয়াত'**।

১৯৯৬ এর জুন থেকে শুরু করে ২০০১ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের শাসনামল সাম্প্রতিক বা সমকালিন ইতিহাসের সকল অপশাসন আর সন্ত্রাস-নির্যাতনের রেকর্ডকে ম্লান-নিস্প্রভ করে দিয়েছে। বিগত পাঁচটি বছর ধরে বাংলাদেশের ধর্মভীরু মানুষ ভীত-বিহ্বল নয়নে অবলোকন করেছে ১২ কোটি মুসলমানের নিবাস বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুসলিম-দলন ও ইসলাম উৎখাতের এক নারকীয় উৎসব। **আওয়ামী জাহেলিয়াতের** কিছু চিত্র তুলে ধরাই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

সূচীপত্র পৃষ্ঠা নং

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

প্রথম অধ্যায়

শেখ হাসিনার শাসনামল
(১৯৯৬-২০০১)

আওয়ামী সন্ত্রাস

'আওয়ামী লীগ' ও 'সন্ত্রাস' শব্দদ্বয় সমার্থক। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসের মাধ্যমে পরিচালিত একটি দলের নাম। আওয়ামী লীগের ইতিহাস মূলতঃ সন্ত্রাসের ইতিহাস, চাঁদাবাজির ইতিহাস, খুন ও ধর্ষণের ইতিহাস।

ইতিহাস বিশ্লেষনে আ'লীগের এই ইতিহাসের শুধু নগ্ন চিত্রই চোখে পড়ে। শুধু যদি ক্ষমতাসীন আ'লীগের ইতিহাসের কথা বিবেচনায় আনা হয়, তবে দেখা যাবে তারা যখনই ক্ষমতায় ছিল তখন এই সন্ত্রাসের ভয়াবহতা আরো ভয়ংকর আকার ধারন করেছে। এই নগ্ন সন্ত্রাসের হাত থেকে প্রতিপক্ষ যেমন রক্ষা পায়নি তেমনি রক্ষা পায়নি নিজ দলের নেতা-কর্মীও। ১৯৭২-৭৫ সালের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তাদের সন্ত্রাসের ভয়াবহতায় গোটা জাতির নাভিশ্বাস উঠেছিল। মানুষের নিরাপত্তা বলতে কোন কিছুই তখন ছিলনা। বিরোধী দল ও মতকে নিমিষেই স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

একইভাবে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আ'লীগ ক্ষমতায় আসার পর তাদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, হত্যা, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বাধাঁদান ও সাংবাদিক নির্যাতন অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। সন্ত্রাসের কারণে দেশের চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, নরসিংদী, সিলেট সহ অন্যান্য জেলার সাধারণ মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত। বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা আওয়ামী হায়েনাদের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত। আওয়ামী হায়েনাদের ধর্ষণের কবল থেকে ৬ বছরের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত রেহাই পায়নি। অপহরণ করে মুক্তিপন আদায় যেন নিত্য নৈমত্তিক ঘটনায় দাড়ায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের উপর চোরাগুপ্ত নির্লজ্জ হামলা করে প্রাণনাশের অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। ভূয়া অজুহাত তুলে রাজধানীতে মিছিল সমাবেশ বিরোধী দলের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষনা করে আ'লীগ অহরহ মিছিল সমাবেশ করে। বিরোধী মতের দৈনিক, সাপ্তাহিকসহ মিডিয়াকে গতিরোধ করার নানা ষড়যন্ত্র করা হয়। সরকারী বিজ্ঞাপন ও নিউজপ্রিন্টের কোটা হ্রাসের মাধ্যমে পত্রিকা সমূহের সার্কুলেশন হ্রাসের হীন চেষ্টাও করা হয়। শুধু তাই নয়, সাংবাদিক নেতাদের হত্যার অপচেষ্টা ও সংবাদপত্র অফিসে হামলা করে এক জঘন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এই আ'লীগ সরকার। আওয়ামী সন্ত্রাসের কারণে সাংবাদিকরা এখন সত্য সঠিক কথা তুলে ধরতে পারছে না।

আমরা এ অধ্যায়ে আ'লীগের এ সব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কিছু তথ্য উপযুক্ত প্রমাণসহ তুলে ধরেছি -যার মাধ্যমে পাঠকরা আওয়ামী দুঃশাসনের সামান্য চিত্র উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখল

১। ১০ অক্টোবর ২০০০ যুবলীগের ক্যাডাররা রাজধানীর 'সড়ক ভবনে' দু'টি চাইনিজ কোম্পানীর দরপত্রের কাগজ ছিনতাই করে নেয়। মামলা হলেও কোন আসামী গ্রেফতার হয়নি এবং আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। এতে বিশ্বব্যাংক ও চাইনিজ দুতাবাস প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে। *(১১ অক্টোবর ২০০০, প্রথম আলো/ইত্তেফাক)*

২। নরসিংদী পৌর-চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মতিন সরকার নরসিংদীর অঘোষিত সম্রাট। অক্ষরজ্ঞানহীন এই সম্রাটের জন্য নরসিংদী এখন আতংকের জনপদ। শহরের খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, জায়গাজমি দখল প্রত্যেকটির সাথে মতিন বাহিনীর সদস্যরা জড়িত। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পরপরই মতিনের সন্ত্রাসী বাহিনী গঠিত হয় তার ভাই আশরাফুল সরকার, চাচাতো ভাই রিপন সরকার, বানু, তৌফিকুল, ঠোটকাঁটা লিটু, বস্তির মুবা, সুভাষ প্রমূখের নেতৃত্বে। পৌরসভা নির্বাচনে তার বিরোধীতা করায় মতিনের লোকজন '৯৯ সালের ২ নভেম্বর আলীজান জুটমিলের সিবিএ সেক্রেটারী আব্দুল হাইয়ের দুই পা কেটে দেয়। মতিন বাহিনী শহরের কাপড়, সূতা, রং, জুয়েলারী ব্যবসা থেকে প্রতিদিন লাখ টাকারও বেশী চাঁদা সংগ্রহ করে। কোন জায়গা বা বাড়ী মতিন বাহিনীর পছন্দ হলে রাতে ওরা গিয়ে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয় যাতে লেখা থাকে, " এই জমির মালিক আলহাজ আব্দুল মতিন সরকার"। এই পদ্ধতিতেই ভোলানগরে বৃদ্ধ জাবেদ আলীর ৯৬ শতাংশ জমি দখল করেছে মতিন বাহিনী। আওয়ামী লীগ নেতা মতিন সরকার প্রথম আলোর সাথে সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমার কথা শুনবা না, আবার বিরোধীতা করবা? হ্যাগো ঠ্যাং আমি ভাইঙ্গা ফ্যালামু, আমার টাকা আছে, লাঠিয়াল বাহিনী আছে। কোর্টে যাইব? তার আগেইতো কাম শেষ" *(১৩ মার্চ ২০০১, প্রথম আলো)*

৩। পুলিশ পাহারা সত্ত্বেও বগুড়ায় ট্রেজারি লুট ও ১৬ লাখ টাকার স্ট্যাম্প গায়েব। *(২১ সেপ্টেম্বর'৯৮, জনকণ্ঠ)*

৪। ২০ অক্টোবর ২০০০ সাতক্ষীরায় একজন সাংবাদিককে বেদম মারপিট করায় পুলিশ যুবলীগ কর্মী বিএম নূরুল ইসলামকে গ্রেফতার করলে সন্ধ্যায় প্রায় দেড় হাজার আওয়ামী লীগ কর্মী থানা ঘেরাও করে পুলিশের কাছ থেকে আসামীকে ছিনতাই করে নিয়ে যায়। *(২২ অক্টোবর ২০০০, ইত্তেফাক)*

৫। ৩০ নভেম্বর ২০০০ গুলিস্তানে হোটেল রাজে আওয়ামী লীগ কর্মীরা হামলা চালায়। একই দিন লালবাগে স্বর্ণের দোকানে বোমা ফাটিয়ে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ৭০ ভরি স্বর্ণ লুট করে নিয়ে যায়। *(১ ডিসেম্বর ২০০০, ইত্তেফাক)*

৬। ৩ সেপ্টেম্বর ২০০০ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে যুবলীগ নেতার আস্তানা থেকে পুলিশ ১২ হাজার বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। *(৪ সেপ্টেম্বর ২০০০, ইনকিলাব/যুগান্তর)*

৭। ২৬ আগষ্ট '৯৯ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড (ইউসিবিএল) এর হেড অফিসে বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের মিটিং-এ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক আখতারুজ্জামান বাবু ২৫-৩০ জন সশস্ত্র ক্যাডার নিয়ে ব্যাংকের কলাপসিবল গেট ও দরজা ভেঙ্গে বোর্ড রুমে ঢুকে পড়েন এবং অস্ত্রের মুখে চেয়ারম্যানসহ পরিচালককে তৈরী করে নেয়া কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। নিজেকে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ঘোষণা করে কাগজপত্র প্রস্তুত করান। উলেখ্য ১৯৯৩ সালের ৮ এপ্রিল এই ব্যাংকেরই অন্যতম পরিচালক হুমায়ূন জহীরকে তার বাড়ীর সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। আখতারুজ্জামান বাবু এই হত্যা মামলার এক নম্বর আসামী। *(২৭ আগষ্ট ১৯৯৯, প্রথম আলো/ ইনকিলাব)*

৮। সীতাকুণ্ড থানাধীন বাড়বকুন্ড রেলওয়ে ষ্টেশনের জন্য আমদানী করা ২৬টি স্লীপার গভীর রাতে ষ্টেশন মাষ্টারসহ স্টাফদের একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে লুট করে নিয়ে যায় স্থানীয় ১০-১২ জন আ'লীগ ক্যাডাররা। এগুলোর মূল্য আনুমানিক ৯ লাখ টাকা। *(২০ আগষ্ট '৯৯, দিনকাল/ ভোরের কাগজ)*

৯। ১৯ মে '৯৯ এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হবার ২ ঘন্টা পরে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে পরীক্ষা দেয় খুলনার আ'লীগ নেতা এস এম রবের পুত্র। *(২০ মে '৯৯, দিনকাল)*

১০। রাজশাহী শহর রক্ষা বাঁধের ১৭ কোটি টাকার কাজ নিতে স্থানীয় আ'লীগ নেতারা পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকৌশলীদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়ায় তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলীসহ কর্তব্যরতরা অফিস ছেড়ে পালিয়ে যায়। *(৮ মে '৯৯, দিনকাল)*

১১। স্থানীয় গ্রামীণ ফোন সংযোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী নেতাদের দাওয়াত না দেওয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরিশাল ত্যাগের পর পরই আ'লীগ কর্মীরা গ্রামীণ ফোন শোরুম ভাংচুর করে। লাঞ্ছিত করা হয় গ্রামীণ ফোনের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তাকে। হুমকি দেয়া হয় গ্রামীণ ফোনের কার্যক্রম বরিশালে বন্ধ করে দেবার। *(১৬ এপ্রিল ২০০০, জনকণ্ঠ)*

১২। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী শাহ আমানত সেতুর ইজারা নিয়ে পুলিশের শীর্ষ তালিকাভূক্ত সন্ত্রাসী মহানগর আ'লীগ নেতা আ.জ.ম. নাছির ও তার বাহিনী কর্তৃক সরাসরি হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠে। এদের ভয়ভীতির কারণে এবারে তিন দফায় সেতুটির টোল আদায়ের টেন্ডারে শতাধিক ঠিকাদার অংশ নিতে পারেনি। ফলে গতবারের চেয়ে এবার প্রায় অর্ধ-কোটি টাকার রাজস্ব কম আদায় হবে। *(১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০০, যুগান্তর)*

১৩। রাজধানীর শেরে বাংলা কৃষি কলেজে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা ব্যবহার করে পার্শ্ববর্তী প্রায় তিন শতাধিক বাড়ীতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। *(১৮ মে ২০০০, ইত্তেফাক)*

১৪। ১০ অক্টোবর ২০০০ চীনা কোম্পানির একটি টেন্ডার অস্ত্রের মুখে ছিনতাই করে নেয় যুবলীগের শীর্ষ সন্ত্রাসী লিয়াকত হান্নান। গোপালগঞ্জ-বরিশাল অঞ্চলে মোল্লারহাট ফিডার রোড নির্মাণের জন্য এই দরপত্র আহ্বান করা হয় -যার মূল্য

৬৪ কোটি টাকা। পুলিশ উক্ত অভিযোগে যুবলীগ নেতা এবং লীগ ক্যাডারদের চাপে লিয়াকতকে ২৯ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করে। *(২১ অক্টোবর ২০০০, বাংলার বাণী)*

১৫। কুমিল্লার যুবরাজ বলে খ্যাত টপটেরর জেলা যুবলীগের সভাপতি শহীদুল ইসলাম দখল করে নিয়েছে কুমিল্লা তথ্য অফিসারের পরিত্যাক্ত অফিস। এটি এখন তার বাসভবন। সন্ত্রাসী শাহীন ভবিষ্যতে ৯ একর জমি দখলের উদ্দেশ্যে বাগিচাগাও এলাকার প্রায় সোয়া'শ বছরের একটি পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন মসজিদ নির্মাণ করেছে । সে জোরপূর্বক পুরাতন মসজিদ কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে গঠন করে এবং নিজে তার সেক্রেটারী হয়ে বসে। *(৯ নভেম্বর ২০০০, মানব জমিন)*

১৬। ১২ নভেম্বর ২০০০ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মাদ নাসিমের ঘনিষ্ট আত্মীয় সিরাজগঞ্জের মোঃ ইসমাইল হোসেন রাত ১১টায় সেগুন বাগিচায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে অন্যান্য ঠিকাদারদের বের করে দিয়ে টেন্ডার ছিনতাই করেন। টেন্ডারটি ছিল নরওয়ের অনুদানে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পৌনে ১১ কোটি টাকার কাজ। *(২০ নভেম্বর ২০০০, প্রথম আলো)*

১৭। আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগকারী সাবেক সচিব ও সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাফউদ্দৌলাকে অজ্ঞাত পরিচয়ে টেলিফোনে প্রান নাশের হুমকি দিয়ে বলা হয় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কোন রকম বক্তব্য দিলে শেষ করে দেয়া হবে। *(৬ মার্চ ২০০০, ইত্তেফাক)*

১৮। "আমি চীফ হুইপের ছেলে যাকে টার্গেট করি শেষ করে ফেলি, টাকা রেডি রাখবি" ধানমন্ডীতে একটি বাড়ীতে জোরপূর্বক ঢুকে চাঁদা দাবি করার সময় হুইপপুত্র এই হুমকি প্রদান করে। *(৮ নভেম্বর ২০০০, সংবাদ/ যুগান্তর)*

১৯। দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় ধরনের বোমা বিস্ফোরণ যেমন, উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ, কমিউনিষ্ট পার্টির মহাসমাবেশে বোমা বিস্ফোরণ, প্রধানমন্ত্রীর হত্যার কল্পিত খবর পরিবেশন ও বোমাপুতে রাখা, রমনার বটমূলে বোমা বিস্ফোরণ, গোপালগঞ্জ গীর্জায় বোমা বিস্ফোরণ ও সর্বশেষ নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের অফিসে বোমা বিস্ফোরণে বিপুল সংখ্যক মানুষ হতাহতের ঘটনার সাথে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' জড়িত আছে বলেই জনগণ মনে করে। এসব বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের কোন ব্যবস্থা না করেই তদন্তের আগেই ইসলামীপন্থী দলসমূহের বা বিরোধী দলকে দায়ী করেছে আওয়ামী নেতা-কর্মীরা। পরবর্তীতে কোন ঘটনার তদন্ত কাজ অগ্রসর হতেও দেয়া হয়নি। *(১৮ মার্চ ২০০১, আজকের কাগজ)*

র : সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কোন দলীয় ক্যাডারকে গ্রেফতার পর্যন্ত করেনি আওয়ামী
া সরকার। সৌজন্যে : দৈনিক দিনকাল

র : আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি। খুন, হত্যা, ধর্ষণ,
ুপাটে চ্যাম্পিয়ন আওয়ামী লীগ। সৌজন্যে : দৈনিক সংগ্রাম
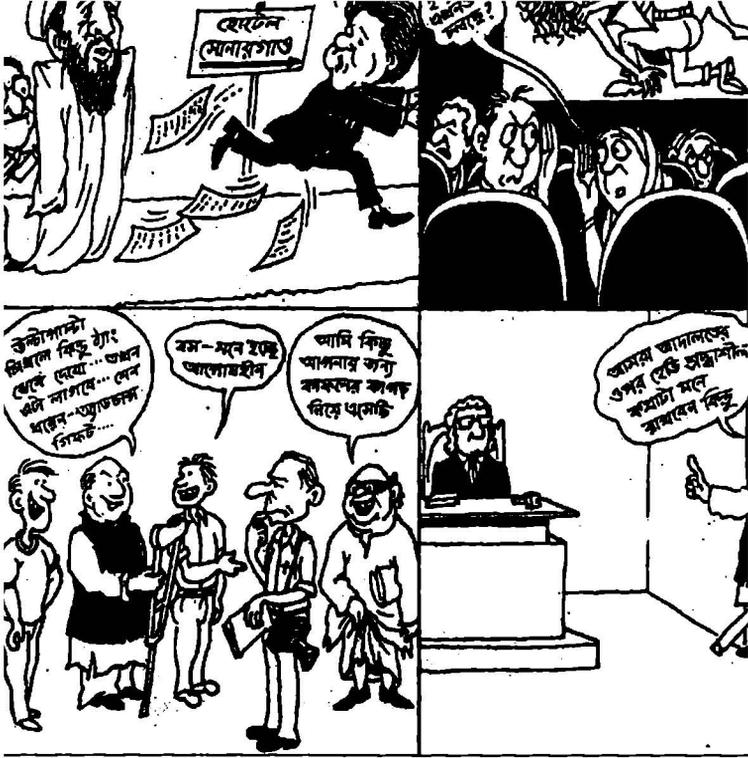
র : চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী আওয়ামী যুবলীগ নেতা মামুনুর রশীদ পত্রিকা অফিস ভেঙ্গে
ড়িয়ে দিলেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সৌজন্যে : দৈনিক প্রথম আলো

: সংসদে আইন পাশ করে শেখ হাসিনার গণভবন দখল।   সৌজন্যে : দৈনিক

খুন ও হত্যাপ্রচেষ্টা

১। ১৫ মার্চ ১৯৯৯ সুনামগঞ্জের ছাতকস্থ নিজবাড়ীতে বোমা তৈরীকালে বিস্ফোরণে ২ জন নিহত হয়। সরকার দলীয় এমপি মুহিবুর রহমান মানিকের বাড়ীতে তার ক্যাডারেরা দলীয় ভিন্নমতালম্বীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই বোমা বানাচ্ছিল। *(১৬ মার্চ ১৯৯৯,প্রথম আলো)*

২। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট নুরুল ইসলামকে অপহরণ করে লক্ষ্মীপুরের স্বঘোষিত পৌর চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তাহেরের ক্যাডার বাহিনী। লক্ষ্মীপুর জেলার এসপির ভাষ্যমতে, আবু তাহেরের পুত্র বিপ্লব ও তার ভায়রা হাসু ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে ডিসি ও এসপির কাছে এসে নুরুল ইসলামকে অপহরণ করার কথা স্বীকার করে। *(১১ অক্টোবর ২০০০, জনকণ্ঠ)*

৩। ৫ সেপ্টেম্বর ২০০০ লক্ষ্মীপুরে আবু তাহের বাহিনীর কিলিং স্কোয়াডের সদস্য লাবু ও মেহেদী গুলি করে সম্ভবনাময় তরুণ ছাত্রনেতা এ এস এম মোহসীনকে। লক্ষ্মীপুর শহরের সামাদ মডেল স্কুলে একটি অনুষ্ঠান থেকে বের করে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হয়। *(৬ আগষ্ট ২০০০ যুগান্তর/ সংগ্রাম/ ইনকিলাব)*

৪। ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০১ আওয়ামী সংসদ সদস্য ডা: ইকবালের উপস্থিতিতে ঢাকার মালিবাগ মোড়ে রাজধানীর শীর্ষ সন্ত্রাসী ও আওয়ামী -যুবলীগ নেতা লিয়াকত, হান্নানসহ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বিরোধী দলের মিছিলে গুলি চালালে ৩ জন নিরীহ লোক নিহত হয়। হরতালের স্বপক্ষে বিরোধী দলের মিছিলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ঢাকা সিটির সাবেক মেয়র মীর্জা আব্বাস। *(১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১, যুগান্তর/ ইনকিলাব/ জনকণ্ঠ)*

৫। ৮ ফেব্রুয়ারী '৯৯ হরতাল চলাকালে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে আওয়ামী গুন্ডারা বিএনপি ঢাকা মহানগর সভাপতি সাদেক হোসেন খোকাকে মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত করে দেয়। *(৯ নভেম্বর ১৯৯৯, প্রথম আলো/জনকণ্ঠ)*

৬। ২০ মে ২০০০ 'আমার ফাঁসি চাই' গ্রন্থের লেখক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান রেন্টুকে আ'লীগের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা গুলি করে। জনাব রেন্টু ঐ বইতে আওয়ামীলীগের নেত্রী শেখ হাসিনার স্বরুপ কিছুটা উম্মোচন করেছেন। *(২১ মে ২০০০, সংগ্রাম/ ইনকিলাব)*

৭। ১২ নভেম্বর '৯৭ চট্রগ্রাম আউটার ষ্টেডিয়ামে বিরোধীদলের মহসমাবেশে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে বন্দুক হামলা চালিয়ে ৭ জন লোককে খুন করে। *(১৩ নভেম্বর '৯৭, ইত্তেফাক/ জনকণ্ঠ/ ইনকিলাব)*

৮। ২০ আগষ্ট ২০০০ বিএনপি নেতা এডভোকেট হাবিবুর রহমান মণ্ডল ঢাকায় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গুলিতে আদালত প্রাঙ্গনে নিহত হন। এ হত্যাকান্ডে সূত্রাপুরের আওয়ামীলীগের ওয়ার্ড কমিশনার সাইদুর রহমান শহীদ জড়িত ছিল।

হত্যার দশদিন আগে কমিশনার শহীদ টপটেরর কালা জাহাঙ্গীরকে খুনের দায়িত্ব অর্পণ করে। *(২১ আগষ্ট ২০০০, প্রথম আলো/ দিনকাল/ যুগান্তর)*

৯। ফটিকছড়ি থানা হাজতে পুলিশ দারোয়ান নূরুল আবছারকে পিটিয়ে খুন করে। *(৬ আগষ্ট ৯৭, ভোরের কাগজ)*

১০। ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ জাসদ নেতা কাজী আরেফ নিজ নির্বাচনী এলাকা যশোরের দলীয় সভায় সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে নিহত হন। এই ঘটনায় আরও চারজন নিহত হয়। *(৭ ফেব্রুয়ারী '৯৯, ইনকিলাব/ জনকণ্ঠ/ সংগ্রাম)*

১১। ৮ অক্টোবর '৯৯ সালের খুলনায় কাদিয়ানীদের উপসনালয়ে বোমা হামলায় ৭ জন নিহত হয়। এই ঘটনায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। *(৯ অক্টোবর '৯৯, জনকণ্ঠ/ ইনকিলাব)*

১২। ১৩ জানুয়ারী '৯৮ ফেনীতে সকাল ১১টায় ট্রাঙ্ক রোডে হরতাল সমর্থিত জনতার মিছিলে আওয়ামী লীগ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে জেলা যুবদল যুগ্ম আহ্বায়ক নাছির উদ্দিন ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হয় এবং হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়। আহত হয় ৫০ জন। *(১৪ জানুয়ারী '৯৮, দিনকাল)*

১৩। ১৭ মার্চ '৯৭ পরীক্ষায় নকল করার অভিযোগে আ'লীগ নেতার পুত্রকে বহিস্কার করায় জয়পুরহাট জেলার পাঁচ বিবি থানার টিএনও আবুল হাসনাত খানকে ছাত্রলীগের কর্মীরা নির্মমভাবে প্রহার করে ও একজন ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাংচুর করে। *(১৮ মার্চ '৯৭, খবর)*

১৪। ২৩ জুলাই '৯৮ মিন্টু রোডের গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে ডিবি সদস্যদের নির্মম অত্যাচারে খুন হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্র শামিম রেজা রুবেল। এ ঘটনায় পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার আকরাম হোসেইনসহ ৬ পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতার হন। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রুবেলদের প্রতিবেশী সিদ্ধেশ্বরী এলাকার আওয়ামী লীগ নেত্রী মুকুলী বেগমকে গ্রেফতার করা হয়। *(২৮ ডিসেম্বর '৯৮, ভোরের কাগজ, ২৫ জুলাই '৯৮, ইনকিলাব)*

১৫। ৩ অক্টোবর '৯৮ নাটোর শহরের উত্তর পটুয়াস্থ কর্মীর মাঠ এলাকার জনৈক বেলাল মিয়ার স্ত্রী শহর বানুর স্তন ও পায়ের রগ কেটে দেয় যুবলীগ সদস্য ঠিকাদার ভরত। *(৫ অক্টোবর '৯৮, ইনকিলাব)*

১৬। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী থানার পোগলদিয়ার চকপাড়া গ্রামে ১৬টি বাড়ী ঘর ও দোকানপাট ভাংচুর করে প্রায় ৬ লাখ টাকার সম্পদ লুট করে। *(১ নভেম্বর'৯৮, দিনকাল)*

১৭। ৮ জুলাই '৯৮ মোমেনশাহীর গফরগাঁও থানা পরিষদে একদল আওয়ামী সন্ত্রাসী ইউপি চেয়ারম্যান কবির সরকারকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে। *(৯ জুলাই'৯৮, সংগ্রাম)*

১৮। ২৫ সেপ্টেম্বর '৯৮ চট্টগ্রাম মহানগরী পুলিশ ৩টি খুন ও অপহরণ মামলার আসামী যুবলীগ নেতা মামুনুর রশীদকে গ্রেফতার করে। *(২৬ সেপ্টেম্বর'৯৮, জনকণ্ঠ/ ইনকিলাব)*

১৯। মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট মতে, আওয়ামী সরকারের আমলে '৯৭ সালে থানা ও নিরাপত্তা হেফাজতে ৩৮ জন বন্দীর মৃত্যু হয়। *(২১ ফেব্রুয়ারী'৯৮, সংগ্রাম)*

২০। ঈদের পরদিন চট্টগ্রামে নাজিরহাট ফটিকছড়ি এলাকায় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে ২ জন নিরীহ যুবক খুন ও ৩০ জন আহত হয়। *(১১ এপ্রিল'৯৮, সংগ্রাম)*

২১। ১৪ মার্চ ২০০০, দৈনিক প্রথম আলো প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সন্ত্রাসের মুকুটহীন সম্রাট ফেনীর জয়নাল হাজারীর নাম প্রকাশ্যে কেউ উচ্চারণ করতেও সাহস পায় না। রিপোর্টে আরো বলা হয়, তার সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৫ হাজার।

২২। ১২ মার্চ ২০০০, দৈনিক যুগান্তরের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ফেনীর গডফাদার জয়নাল হাজারী বলেন, ***আমার ছেলেদের হাতে অস্ত্র আছে আত্মরক্ষার জন্য। কম্বিং অপারেশন শেষে জমা দেয়া হবে।***

২৩। ১৮ এপ্রিল ২০০০ শেখ মুজিব হত্যা মামলার বিচার কার্য পরিচালনায় হাইকোর্টের বিচারপতিগণ বিব্রত বোধ করলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল বের করে। *(১৯ এপ্রিল ২০০০, সংবাদ/ জনকণ্ঠ)*

২৪। ১১ মে ২০০০ রাজধানীর রাজাবাজার এলাকায় এক অভিযান চালিয়ে পুলিশ দীর্ঘক্ষণ উক্ত এলাকায় সন্ত্রাসীদের সাথে বন্দুক যুদ্ধের পর তেজগাঁও থানা যুবলীগের যুগ্মসম্পাদক সহ ৩ জনকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে। *(১২ মে ২০০০, আজকের কাগজ)*

২৫। পাবনার চাঞ্চল্যকর বিদ্যুৎ টাওয়ার বিধ্বস্ত ঘটনার সাথে আওয়ামী লীগ কর্মী জড়িত বলে পুলিশ চার্জশীটে উল্লেখ করে। অথচ এই ঘটনায় বিরোধী দল বিএনপির ৪ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। *(৩ ডিসেম্বর ২০০০, সংগ্রাম)*

২৬। ১৪ নভেম্বর '৯৯ পুলিশ পাবনার সদর থানার নাজীরপুর গ্রামের কাজীপাড়ার আ'লীগ নেতা বন্দের আলীর বাড়ী ঘেরাও করে। ঐ বাড়ী থেকে আওয়ামী নেতা আরমানকে আগ্নেয়াস্ত্র ও অস্ত্র তৈরীর বিভিন্ন সরঞ্জামাদিসহ গ্রেফতার করা হয়। *(১৫ নভেম্বর '৯৯, ইত্তেফাক/সংগ্রাম)*

২৭। ২১ ফেব্রুয়ারী '৯৯ ভোলায় শিল্প মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের গাড়ীর চাকায় আব্বাস উদ্দীন নামে ৮ বছরের ছেলে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। এই ব্যাপারে কোন মামলা করতে দেয়া হয়নি। *(২৩ মে '৯৯, দিনকাল)*

২৮। বিএনপির নেতা আতাউর রহমান আঙ্গুরকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত ঘোষণার জের হিসেবে আড়াইহাজারে আওয়ামী লীগ ব্যাপক সন্ত্রাসী হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটায়। *(২৯ জানুয়ারী '৯৯, দিনকাল)*

২৯। চিহ্নিত সন্ত্রাসী '৯৫ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলার ওয়ারেন্টভূক্ত আসামী জুলহাসকে ছাড়াতে আ'লীগ নেতারা রমনা থানা লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। *(৫ জুন '৯৯, ইনকিলাব)*

৩০। ৩১ জানুয়ারী '৯৭ মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে প্রকাশিত কান্ট্রি রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশে সন্ত্রাস, খুন, নির্যাতন ও মানবধিকার লংঘন ভয়ানক আকারে বেড়ে গেছে। *(১ ফেব্রুয়ারী '৯৭, ইত্তেফাক/ ইনকিলাব/ জনকণ্ঠ)*

৩১। ২২ জুন '৯৭ জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বর্তমান সরকারের প্রথম দশমাসে সারাদেশে ২২৯টি হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে। নির্যাতন মূলক বিশেষ ক্ষমতা আইনে ৩৩২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। *(২৩ জুন '৯৭, বাংলাবাজার পত্রিকা)*

৩২। ২৭ অক্টোবার '৯৭ ফেনীতে আ'লীগের গডফাদার জয়নাল হাজারীর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বিমলচন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তিকে ড্রিল মেশিন দিয়ে হাত পা ছিদ্র করে এবং মাথায় ইট ও রডের আঘাতে হত্যা করে। *(২৮ অক্টোবর '৯৭, আজকের কাগজ)*

৩৩। ৮ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ কারাগারে ১ জন হাজতির মৃত্যুর ঘটনায় সোনারগাঁওয়ে আ'লীগ হরতাল পালন করে এবং ব্যাপক ভাংচুর ও তান্ডব চালায়। *(৯ ডিসেম্বর '৯৭, সংবাদ)*

৩৪। ২ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ শিল্পপতি আশা অপহরণ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত আ'লীগ নেতাসহ দুজনের মুক্তির দাবিতে চুয়াডাঙ্গার ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস, আদালত, কালেক্টরেট ভবন এবং সেখানে রক্ষিত সরকারী সম্পদ ও গাড়ী ভংচুরের দায়ে পুলিশ ৮ জন নেতা কর্মীকে আটক করে। *(৩ ফেব্রুয়ারী ২০০০, প্রথম আলো)*

৩৫। ১৩ জানুয়ারী ২০০০ মরহুম বিচারপতি হাবিবুর রহমানের ছেলে ডাঃ জাহিদ ইকবাল ও তার স্ত্রী বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ও সংগীত শিল্পী খান আতার কন্যা ডাঃ রুমানা খান ইস্কাটন গার্ডেনস্থ খান আতার বাসা থেকে বের হয়ে গাড়ীতে উঠলে মোটর সাইকেল আরোহী যুবলীগের ক্যাডার মহসীন, সুমন প্রমূখ তাদের গাড়ী আক্রমণ করে গাড়ী ভাংচুর ও ডাঃ রুমানাকে লাঞ্চিত করে। *(১৫ জানুয়ারী ২০০০, বাংলাবাজার পত্রিকা)*

৩৬। ১১ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের পার্শ্বের রাস্তায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব নিকুঞ্জ বিহারী নাথ সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। *(১২ জানুয়ারী ২০০০, জনকণ্ঠ/সংগ্রাম)*

৩৭। ৫ আগষ্ট পুলিশ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে দুবাই পালানোর চেষ্টাকালে দু'জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করে। এরা হচ্ছে রাউজান ইউপি চেয়ারম্যান আবু জাফর ও মোশারফ। এদের দু'জনই ১২ জুলাই (২০০০) চট্রগ্রামের চাঞ্চল্যকর এইট মার্ডারের সাথে জড়িত। *(৬ আগষ্ট ২০০০, বাংলার বাণী)*

৩৮। আওয়ামী শাসনামলে ফেনীতে লাশের হিসাব

সময়কাল	মোট খুন	আ'লীগ	বিএনপি	নিরীহ
'৯৬ (জুন থেকে)	৬	৪	২	০
'৯৭	১৬	৯	৭	০
'৯৮	১০	৬	৪	০
'৯৯	১২	৪	৪	৪
২০০০	৩৫	১২	১৫	৮
২০০১ (জুন পর্যন্ত)	৫৮	১০	১৮	৩০
মোট	১৩৭	৪৫	৫০	৪২

(৮ ডিসেম্বর ২০০০, মানবজমিন)

৩৯। ২১ নভেম্বর '৯৭ দৈনিক মিল্লাতের এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়, শিল্প ও বন্দরনগরী খুলনায় ১৬ মাসে খুন হয়েছে ২৭ জন। অপরাধী সরকারী দলের হওয়ায় গ্রেফতার হয় না। ১৫ লাখ মানুষ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

৪০। ফেনীতে ইউপি নির্বাচনে স্থানীয় গডফাদার ও আওয়ামী সন্ত্রাসী হাজারীর মনোনীত প্রার্থী ছাড়া অন্য সকল প্রার্থীর এলাকা ত্যাগ। হাজারী বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে প্রার্থীরা। *(১৭ নভেম্বর '৯৭, জনকণ্ঠ)*

৪১। ১৮ নভেম্বর '৯৭ *আজকের কাগজের* এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়, ৩০ হাজার অস্ত্রবাজ সন্ত্রাসী ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ২১ দিনের বিশেষ অভিযান পুরাটাই ব্যর্থ হচ্ছে। গ্রেফতার হয়নি অধিকাংশই।

৪২। ৯ নভেম্বর '৯৭ দৈনিক ইত্তেফাকের এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়, বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ৩৩ লক্ষ মানুষ মাত্র ৪ শ' সন্ত্রাসীর হাতে জিম্মি। নগরীর জনজীবনে শান্তি ও স্বস্তি হরণকারী সন্ত্রাসী ক্যাডাররা নিজেদের পরিচয় দেয় ছাত্রলীগ নেতা হিসাবে। *(৯ নভেম্বর '৯৭, ইত্তেফাক)*

৪৩। জনকণ্ঠের রিপোর্ট-**"সন্ত্রাসের জনপদ ফেনী"**- হাজারীর দেয়া ৪৮ হাজার টাকা গ্রহণ করে এসপি এখন বিপাকে-**"পুলিশের ভাবমূর্তি ভূলুণ্ঠিত"**। *(৮ নভেম্বর '৯৭, জনকণ্ঠ)*

৪৪। ৯ নভেম্বর '৯৭ বরিশাল ঝালকাটি সড়কে ন্যাশনাল ব্যাংকের ৪০ লক্ষ টাকা লুট। স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতারা এই ঘটনার সাথে জড়িত বলে পুলিশ জানায়। *(১০ নভেম্বর '৯৭, ইত্তেফাক/ বাংলাবাজার পত্রিকা)*

৪৫। সরকারী দলের এমপি পুত্রের নেতৃত্বে একটি সন্ত্রাসী চক্র ধানমন্ডি থানার বিভিন্ন ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক চাঁদাবাজি করে। এদের সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির অপতৎপরতায় এলাকার ব্যবসায়ীরা ভীত সন্ত্রস্ত। *(২৪ জানুয়ারী '৯৯, ইনকিলাব)*

৪৬। ৬ এপ্রিল '৯৯ দলীয় কর্মী খুনের প্রতিবাদে আওয়ামী-ছাত্রলীগ যৌথভাবে রাজশাহী মহানগর থানায় হামলা চালিয়ে পুলিশকে ব্যাপক মারধর করে। *(৬ এপ্রিল '৯৯, সংগ্রাম)*

৪৭। ৫ এপ্রিল '৯৯ "যায় যায় দিন" ম্যাগাজিনে "শহর শহরতলী ও গ্রামের চিত্র" শীর্ষক এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয় "থানা আওয়ামী লীগ নেতা ঐসব থানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী"। এই রিপোর্টে রাজধানীর উত্তরা থানা, নারায়ণগঞ্জ সদর থানা এবং পিরোজপুরের স্বরূপকাটি থানার (যার বর্তমান নাম নেছারাবাদ) বেহাল অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৪৮। ২ জুন '৯৯ কুমিল্লা সমবায় ব্যাংকের সাড়ে আট কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে পুলিশ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতা আফজাল খানকে গ্রেফতার করে। ঘটনার প্রতিবাদে সশস্ত্র দলীয় কর্মীরা ব্যাপক গাড়ী ভাংচুর করে এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক বন্ধ করে দেয়। *(৩ জুন '৯৯, দৈনিক মুক্তকণ্ঠ)*

৪৯। ১৫ নভেম্বর '৯৯ উপ-নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্যে নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী সংসদ সদস্য এমদাদুল হক টাঙ্গাইলের সখিপুরে টাকা বিতরণ কালে জনতার হাতে আটক ও প্রহৃত হন। *(১৬ নভেম্বর '৯৯, আজকের কাগজ)*

৫০। ৮ নভেম্বর '৯৯ *দৈনিক জনকণ্ঠের* এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়, শাসক আওয়ামী লীগের বিশেষ নেতার প্রশ্রয়ে বরিশালে সর্বহারা সন্ত্রাস দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জান-মালের কোন নিরাপত্তা সরকার দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

৫১। ২০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা জুতাপেটা ও দিগম্বর করেছে সরকারী সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলামকে- যার ইন্ধনে থানায় ছাত্রলীগ নেতা টিপু খুন হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা এ সময় গুলি, বোমা, টিয়ারগ্যাস, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও ব্যাপক লুঠপাট করে। *(২১ সেপ্টেম্বর '৯৯ আজকের কাগজ)*

৫২। ২০ সেপ্টেম্বর '৯৯ তালায় আওয়ামী এমপি সৈয়দ কামাল বখ্‌তের নেতৃত্বে তান্ডব- "সন্ত্রাসী কায়দায় ৪টি ভূমিহীন পরিবার উচ্ছেদ। গরম পানি ঢেলে ৫ বছরের শিশুকে ঝলসিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। সাংবাদিক প্রহৃত"। *(২১ সেপ্টেম্বর '৯৯, সংগ্রাম)*

৫৩। ৩১ আগষ্ট '৯৯ প্রথম আলো প্রাকাশিত এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয় রাজধানীর আগারগাঁও বস্তির অপরাধী চক্র স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী" - এখন তারাই সন্ত্রাস ও মাদকবিরোধী বাহিনী গঠন করেছে। *(৩১ আগষ্ট '৯৯, প্রথম আলো)*

৫৪। ৭ সেপ্টেম্বর '৯৯ আটক ছাত্রলীগ কর্মীদের ছেড়ে দিতে তদ্বির না করায় আ. লীগ এমপি একরামুল হক মোস্তফা শহীদের বাড়ীতে হামলা, ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করে। *(৮ সেপ্টেম্বর '৯৯, সংবাদ)*

৫৫। ১৯ অক্টোবর '৯৯ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠের এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়, বরিশালে আইন-শৃংখলার অবনতির জন্যে আওয়ামী লীগারাই দায়ী। আওয়ামী নেতারা নিজেদের আধিপত্য বৃদ্ধির জন্য সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপসমূহকে ব্যবহার করছে বলে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

৫৬। ২৮ জুলাই '৯৯ সাতক্ষীরার তালায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ওয়াকার্স পার্টির নেতা - কর্মীদের উপর আওয়ামী লীগের দফায় দফায় হামলা। এতে প্রায় শতাধিক আহত হয়। *(২৯ জুলাই '৯৯, জনকণ্ঠ)*

৫৭। চট্টগ্রামের সন্দিপে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের চারপাশে আ.লীগ সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র অবস্থান "৫ আইনজীবী লাঞ্চিত" বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের জামিন দেয়া হচ্ছে না অভিযোগ পাওয়া যায়। (১১ মার্চ '৯৯, দিনকাল)

৫৮। ২২ মে '৯৭ - সতের কোটি টাকার টেন্ডার ১১ জন আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে ভাগভাগির উদ্যোগ। ৩'শ সন্ত্রাসী নিয়ে ক্রীড়া পরিষদ অফিসে হামলা, লুটপাট- "ঠিকাদারদের টেন্ডার জমা দানে বাধাদান"। *(২৩ মে '৯৭, দিনকাল)*

৫৯। ১৯ মে '৯৭ সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবি সমিতির তলবী সভায় আ. লীগ সমর্থক আইনজীবিদের চেয়ার নিক্ষেপ, ভাংচুর, মারমুখি আচরণে সভা ভঙ্গ হয়ে যায়। *(২০ মে '৯৭, সংবাদ/ সংগ্রাম)*

৬০। ২২ এপ্রিল '৯৭ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের টেন্ডার নিয়ে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ - "শাসক দলের এক নেতাকে কাজ দেয়ার সিদ্ধান্ত" - কোটি কোটি টাকা গচ্ছা। *(২২ এপ্রিল '৯৭, দিনকাল)*

৬১। ১১ মার্চ '৯৭ চট্টগ্রামের চন্দনাইশে আওয়ামী লীগের আর্মস ক্যাডারদের গুলিবর্ষণে দু'জন ছাত্র এবং একজন পথচারী গুলিবিদ্ধ হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা থানা ঘেরাও করে। *(১২ মার্চ '৯৭, দিনকাল)*

৬২। *দৈনিক সংগ্রামের* এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়, পাবনার বাংলাদেশ পানি উন্নয়নের বোর্ড টাওয়ার বিধ্বস্ত ঘটনার চার্জশীটে পুলিশ আওয়ামী লীগ কর্মী জড়িত বলে উল্লেখ করে। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের ১৪ মার্চ এই টাওয়ার বিধ্বস্ত করা হলে ৩৬টি জেলার লাখ লাখ মানুষকে চরম দূর্ভোগ পোহাতে হয়। *(৩ ডিসেম্বর, ২০০০ সংগ্রাম)*

৬৩। ৪ ডিসেম্বর ২০০০ ফেনীতে আওয়ামী লীগ ক্যাডারের গুলিতে যুবদল নেতা নিহত হয়। পুলিশের সহায়তায় বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ঘরে ঘরে তল্লাসী চালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। *(৫ ডিসেম্বর ২০০০, ইত্তেফাক/ সংগ্রাম/ ইনকিলাব)*

৬৪। বন্যাকে পুঁজি করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আওয়ামী লীগের ব্যাপক চাঁদাবাজি ও ত্রাণ বিতরণে চরম অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। *(৫ অক্টোবর ২০০০, জনকণ্ঠ)*

৬৫। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে যুবলীগ নেতা সেন্টুর আস্তানা থেকে ১২ হাজার বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। দীর্ঘ দিন থেকে সে এ ব্যবসার সাথে জড়িত বলে পুলিশ জানায়। *(৪ সেপ্টেম্বর ২০০০, প্রথম আলো)*

৬৬। দত্তপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র লুট ও কনষ্টেবল হত্যা মামলার চার্জশীটে আওয়ামী লীগের ২ নেতা অভিযুক্ত। উল্লেখ্য, ১ জুলাই, ২০০০ শিবচরের দত্তপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে শেখ হাসিনার আত্মীয় লিটন চৌধুরীর ক্যাডার বাহিনীর নেতা চান

মিয়া শিকদারের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী সশস্ত্র হামলা করে ১ জন কনস্টেবলকে হত্যা করে ও ব্যাপক লুটপাট করে। *(১৭ নভেম্বর ২০০০, দিনকাল)*

৬৭। ১ মে, ২০০০ রাজধানীর মিটফোর্ড থেকে ছিনতাইকৃত প্রায় ৬ লক্ষ টাকার ঔষধ স্থানীয় আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কার্যালয় থেকে উদ্ধার করা হয়। সূত্রমতে, পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় এই এলাকার ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষ নিয়মিত ছিনতাইকারীর শিকার হন এবং তারা সশস্ত্র ক্ষমতাসীন দলকে সমর্থন করে। *(ভোরের কাগজ)*

৬৮। ১৫ ডিসেম্বর '৯৮ রাজধানীর মিরপুরে জমি দখল ও ডাকাতি করতে গিয়ে স্পীকারের দেহরক্ষী পুলিশসহ ৭ জন আওয়ামী লীগ দুবৃত্ত আটক। *(১৬ ডিসেম্বর '৯৮, দিনকাল)*

৬৯। ১০ নভেম্বর '৯৮ রাজধানীর মৌচাক এলাকায় হরতাল সমর্থক একটি মহিলা মিছিলে আওয়ামী লীগের হামলায় ২৫/৩০ জন মহিলা লাঞ্ছিত হন। এ সময় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা মহিলাদের শাড়ী ধরে টানা-হেচড়া করে ও শরীরের বিভিন্ন অংশে সজোরে আঘাত করে। *(১২ নভেম্বর '৯৮, ইনকিলাব)*

৭০। ৪ অক্টোবর '৯৮ বরিশালে বিএনপির সমাবেশে আওয়ামী লীগের হামলা, আহত-৫০, অফিসে অগ্নিসংযোগ। আওয়ামীলীগের একজন কেন্দ্রীয় নেতার সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এই হামলা করে বলে জানা যায়। *(৫ অক্টোবর '৯৮ ,সংগ্রাম)*

৭১। কিশোরগঞ্জে আ'লীগ সমর্থিত ইউপি প্রার্থী হেরে যাওয়ায় মন্দিরে হামলা ও মূর্তি ভাংচুর। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ ও প্রাণনাশের হুমকি। *(১৯ জানুয়ারী '৯৮, দিনকাল)*

৭২। ১৬ এপ্রিল '৯৮ সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নারকীয় তান্ডব, ৩২টি ঘরে আগুন, বিএনপি নেতা গুলিবিদ্ধ। এলাকায় চরম উত্তেজনা। পুলিশের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা। *(২১ এপ্রিল '৯৮ ,সংগ্রাম)*

৭৩। সিরাজগঞ্জে সরকারী বাড়ী দখলের প্রক্রিয়া রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে স্থানীয় আওয়ামী নেতারা অর্ধশতাধিক সরকারী বাড়ী দখল করে ব্যক্তিগত ও দলীয় কাজে ব্যবহার করে । *(২১ জুলাই '৯৮, সংবাদের বিশেষ রিপোর্ট)*

৭৪। চট্টগ্রামে দু'বছরে খুন ১৪৮ জন, অপহরণ ৭৭ জন, সংঘর্ষ ১৭০। এসবের বেশীর ভাগের সাথে আ'লীগ নেতা কর্মীরা জড়িত। *(৭ ডিসেম্বর ২০০০, আজকের কাগজ)*

৭৫। বরিশাল ও খুলনা বিভাগে ৮ মাসে খুন ৩০০, ধর্ষণ ২৪০, নারী অপহরণ ৩৫৭। *(৯ অক্টোবর ২০০০, দিনকাল)*

৭৬। রাজধানীতে ২৪ ঘন্টায় ৬ জন খুন। ১০ ঘন্টায় ৩ জন খুন। *(১৪ অক্টোবর ২০০০, জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০০, আজকের কাগজ)*

৭৭। আওয়ামী লীগ সরকারের চার বছরের সারাদেশে ১৫ হাজার মানুষ খুন। এদের মধ্যে রয়েছে ছাত্র, রাজনৈতিক, সাংবাদিক, নারী প্রমুখ। *(১৯ জুলাই ২০০০, আজকের কাগজ)*

৭৮। বাংলাদেশ মানবাধিকার লংঘনকারীদের অভয়ারণ্যঃ এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল। *(১৫ জুন ২০০০, ইত্তেফাক)*

৭৯। চার বছরে সাড়ে ১৩ হাজার খুন। বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার ১৩ হাজার। (২৩ জুন ২০০০, মুক্তকণ্ঠ)

৮০। নিরাপত্তা হেফাজতে ৬ মাসে পুলিশী নির্যাতনে ২৬ জনের মৃত্যুঃ বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন। *(২ জুলাই ২০০০, বাংলাবাজার পত্রিকা)*

৮১। ৬ মাসেই পুলিশের বিরুদ্ধে ৭ হাজার অভিযোগ। অভিযোগের মধ্যে খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, দূর্নীতি, হয়রানি, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি আছে। *(২৭ জুন ২০০০, জনকণ্ঠ)*

৮২। আওয়ামী শাসনের তিন বছরে ঢাকা শহরের সূত্রাপুর থানায় খুন হয়েছে ২ শতাধিক। পুলিশের সাথে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের দহরম মহরমই এই হত্যাকান্ডের কারণ। (২২ সেপ্টেম্বর ২০০০, আজকের কাগজ)

৮৩। বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরোর মতে, শুধু অক্টোবর (২০০০) মাসে সারাদেশে ২৮০ জন খুন, ৮৫টি ধর্ষণ ও ১১টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। *(২ নভেম্বর ২০০০, ইনকিলাব)*

৮৪। রাজধানীতে প্রতিদিন গড়ে ৯ জন খুন ও ১২ জন ধর্ষণের শিকার । নয় মাসে ৩ শতাধিক হত্যাকান্ডঃ পুলিশের ভাষ্য। *(১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০, প্রথম আলো)*

৮৫। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার চার বছরের মধ্যে চার মহানগরীতে ১২৬৭ টি খুনঃ সাজা হয়নি কারো। *(৭ নভেম্বর ২০০০, যুগান্তর)*

৮৬। শুধু ২০০০ সালের মে মাসেই সারাদেশে ৩৮৬ জন খুন । ডেমোক্রোটিক রাইটস ইনষ্টিটিউটের তথ্য। *(৪ জুন ২০০০, বাংলার বাণী/ ইনকিলাব)*

৮৭। ২০০০ সালের আগষ্ট মাসে দেশে খুন ও ধর্ষণ ৩২০ জন। (৩ সেপ্টেম্বর ২০০০, বাংলার বাণী)

৮৮। প্রতিদিন ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হচ্ছে গড়ে চার জন। *(৫ সেপ্টেম্বর ২০০০, জনকণ্ঠ)*

৮৯। ২০০০ সালের প্রথম আট মাসে দেশে খুন ২৩২৫ এবং ধর্ষণ ৪২২ জন *(বাংলাদেশ মানবধিকার ব্যুরোর উদ্ধৃতি দিয়ে ইনকিলাব/বাংলার বাণী)*

৯০। আওয়ামী সরকারের প্রথম ২৫ মাসে নিরাপত্তা হেফাজতে ৮৫ জনের মৃত্যু। *(২৭ জুলাই '৯৮, সংগ্রাম)*

৯১। ১৯৯৮ সালে পুলিশ হেফাজতে নিহত-১৬, জেল হাজতে নিহত-৪৯ ও ধর্ষিত ২১ জন। *(১১ ডিসেম্বর '৯৮, ইনকিলাব)*

আওয়ামী শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) সংঘটিত অপরাধের তালিকা

বৎসর	অপরাধ	খুন	ডাকাতি	দাঙ্গা
১৯৯৬	৯৩,৩১০	৩,১৩১	৯২৪	৫,৯৮৬
১৯৯৭	১,২১,০৬১	৩,০৮৪	৯৩৩	৪,৯৬৭
১৯৯৮	১,২৪,০০০	৩,৫৩৯	১,০৪২	৪,২২৭
১৯৯৯	১,১২,০০০	৩,৭১০	১,০১৮	৪,০১৯
২০০০	১,২৪,৫৪০	৩,৩৮১	৮৪৫	২,০২৭
২০০১ (জুন পর্যন্ত)	৭৫,৯৮৯	২,৫৪০	১,২৫১	১,৫২৭
মোট	৫,৩৯,৩০০	১৯,২৮৫	৬,০১৩	২২,২৫৩

সূত্রঃ পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।

ধর্ষণ ও অপহরণ

১। বেগমগঞ্জ থানার কাদিরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শরীয়ত উল্যাহ ৮ম শ্রেনীর ছাত্রী কমলা বেগমকে মাইজদি শহরের হোটেল মিল্টনে তিনদিন আটকে রেখে ধর্ষণ করে। *(১৮ জানুয়ারী '৯৭, সংগ্রাম)*

২। রাজধানীর মিরপুরে আ'লীগের একদল কর্মী মেহেরুন্নেসা নামে এক গৃহবধুকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। *(৫ মার্চ '৯৭, দিনকাল)*

৩। ২২ মার্চ ২০০০, দৈনিক জনতার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে মীরপুরের জনৈকা সুন্দরী মহিলা ইয়াসমীন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আওয়ামী লীগ এমপি কামাল মজুমদার তার শ্লীলতাহানি ঘটায়। *(২৩ মার্চ ২০০১, জনতা)*

৪। আ'লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম তিন বছরের মধ্যে পুলিশের হাতে ধর্ষিত হয় ৫০ জন। (২০ আগষ্ট '৯৯, সংগ্রাম)

৫। ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০০ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর স্কুল ছাত্রী (১০) কে প্রতিবেশী জামির হোসেন নামের এক যুবলীগ কর্মী ধর্ষণ করলে পুলিশ তাকে আটক করে। পরে আওয়ামী লীগ ও মহিলা পরিষদের চাপে থানা মামলা নেয়নি। *(২০ ফেব্রুয়ারী ২০০০, সংগ্রাম)*

৬। কেরাণীগঞ্জ থানা আ'লীগ নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে গৃহবধু আনোয়ারা বেগমকে ধর্ষণের অভিযোগ পুলিশ তদন্ত করে। উল্লেখ্য যে, পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে বলে পুলিশ কর্মকর্তারা জানান। *(১৬ জুন '৯৮, দিনকাল)*

৭। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী কলোনী এলাকায় জিএম ভূঁইয়া নামে আওয়ামী লীগ নেতা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের সময় হাতেনাতে ধরা পড়লে স্থানীয় শালিশী বৈঠকে তাকে জুতাপেটা করে মুছলেকা নিয়ে বিদায় করা হয়। *(২০ এপ্রিল '৯৯, দিনকাল)*

৮। ২৫ এপ্রিল '৯৭ মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে মাকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে ষোড়শী দুই মেয়েকে পালাক্রকে ধর্ষণ ও চুল কেটে দিয়েছে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা। উল্লেখ্য যে, সন্ত্রাসী এই কাজের সাথে জড়িত দুলাল যুবলীগ নেতা এবং তার চাচা ইউসুফ আলী স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা। *(১৫ মে '৯৭, দিনকাল)*

৯। ২২ ফেব্রুয়ারী '৯৭ টুঙ্গীপাড়ায় আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার গণধর্ষণের শিকার হয়ে নববিবাহিতা নাজনীন এখন নির্বাক - এলাকাবাসী স্তম্ভিত, মহিলারা ভীত-সন্ত্রস্ত। *(সূত্রঃ ৩ মার্চ '৯৭, দিনকাল)*

১০। ২৬ মে '৯৮ রাঙ্গামাটিতে ধর্ষণের সময় আওয়ামী লীগ নেতা হাতে নাতে আটক। *(২৫ মে '৯৮, ইনকিলাব)*

আওয়ামী শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) নারী নির্যাতন

সাল	ধর্ষণ	নির্যাতন
১৯৯৬	২৬২	২০০০
১৯৯৭	৭৫৩	৬৮৪৮
১৯৯৮	১৪২৫	৮৭৮৮
১৯৯৯	১২৩৮	৯২৭০
২০০০	১৬৪৮	১১৫৪০
২০০১ (জুন পর্যন্ত)	১২৮৫	৯৮৯২

সূত্রঃ পুলিশ সদর দপ্তর/ আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকা।

অভ্যন্তরীণ কোন্দল

১। ১৭ অক্টোবর '৯৭ দিনভর বোমাবাজি, গুলিবর্ষণ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ছাতক থানা (সুনামগঞ্জ) সদর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ এমপি মহিবুর রহমান মানিকের জনসভাকে ঘিরে দলীয় বিবদমান দুই গ্রুপ এই লংকা কান্ড ঘটায় *(১৮ অক্টোবর '৯৭, বাংলাবাজার)*

২। ১৯ নভেম্বর ২০০০ বরিশালের মুলাদিতে আওয়ামী লীগের দু'গ্রুপের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৫০ জন আহত হয়। *(২০ নভেম্বর ২০০০, যুগান্তর)*

৩। ৩ দিন ধরে স্থানীয় আ'লীগ সমর্থিত দুই দল সন্ত্রাসীদের মধ্যে অব্যাহত বন্দুক যুদ্ধের ফলে কালিগঞ্জের বাসিন্দারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। *(৯ মে '৯৯, ইনকিলাব)*

৪। ১২ জানুয়ারী '৯৯ খুলনায় আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও পূর্ব শত্রুতার জের ধরে শাহজাহান নামে এক যুবলীগ কর্মী খুন হয়। *(১৩ জানুয়ারী '৯৯, সংবাদ)*

৫। ১১ সেপ্টেম্বর '৯৯ প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফর – আওয়ামী লীগের নেতাদের কোন্দলে চারটি সংবর্ধনা কমিটি। দলীয় নেত্রীর সুনজরে আসার জন্য ঐসব নেতারা নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগীতায় নেমেছে বলে জানা যায়। *(জনকণ্ঠ)*

৬। ২৭ অক্টোবর '৯৯ রাজধানীর সূত্রাপুরে আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল আলম সেলিম আভ্যন্তরীণ কোন্দলে খুন হয়। *(২৮ অক্টোবর '৯৯, সংবাদ)*

৭। ১৩ জানুয়ারী '৯৭ খুলনায় আ'লীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষে যুবলীগ নেতা নিহত হয়। চাঁদাবাজি ও এলাকায় কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই। *(১৪ জানুয়ারী '৯৭, সংবাদ)*

৮। ২৯ জানুয়ারী '৯৭ সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে আওয়ামী লীগের দু'গ্রুপের ব্যাপক সংঘর্ষ, বোমাবাজি ও বন্দুকযুদ্ধ। ছাত্রলীগ কর্মী খুন। *(৩০ জানুয়ারী '৯৭, জনকণ্ঠ)*

৯। ২৯ নভেম্বর '৯৭ খুলনায় সরকার দলীয় সশস্ত্র দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘাত। খুন-৬, অফিস ভাংচুর, লুটপাট - অগ্নিসংযোগ। *(৩০ নভেম্বর '৯৭, ইত্তেফাক/ আজকের কাগজ/ ইনকিলাব)*

১০। রাজধানীর নয়াবাজার এলাকার ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকজন স্থানীয় আওয়ামী লীগের দু'টি সন্ত্রাসী গ্রুপের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। এদের গডফাদার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা। *(১৬ নভেম্বর '৯৯, সংবাদ)*

১১। প্রভাব বিস্তার, ব্যক্তিস্বার্থ ও গ্রুপিং এর কারণে '৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে শুরু করে '৯৯ মে পর্যন্ত সময়ে দলীয় ৭ জন যুব ও ছাত্রলীগ কর্মী খুন হয়। একের পর এক হত্যাকান্ডে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। *(২৪ মে '৯৯, বাংলার বাণী)*

১২। ২৪ জুন '৯৯ টেন্ডারবাজি, হাট-ইজারার অর্থ ভাগাভাগি ও চোরাচালানির আধিপত্যকে কেন্দ্র করে বগুড়ায় আওয়ামী লীগের অন্তঃকোন্দলে তিন বছরে ৭ জন খুন। *(ইনকিলাব)*

১৩। ২ জুন ২৪ ঘন্টার মধ্যে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ২ জন ওয়ার্ড কমিশনার খুন। দলীয় কোন্দলেই তারা খুন হন বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। *(৩ জুন '৯৯, জনতা/ ইনকিলাব/ ইত্তেফাক/ অবজারভার)*

১৪। আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বে তিন মাসে আওয়ামী লীগের ৪২ জন নেতা-কর্মী খুন, আহত ৩ শতাধিক। বিষয়টি নিয়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে তোলপাড় চলে। *(১৬ জানুয়ারী '৯৯, বাংলাবাজার পত্রিকা)*

১৫। ২৩ ফেব্রুয়ারী '৯৭ রাজধানীর শাহীনবাগে আওয়ামী লীগের দু'দল বন্দুকধারীর মধ্যকার বন্দুক যুদ্ধে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র রুহুল আমীন খুন হয়। জানা যায়, স্থানীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও গার্মেন্টস এর টুকরো কাপড় ব্যবসা নিয়ে দিলীপ ও কাজল গ্রুপের দ্বন্দ্বে এই ঘটনা ঘটে। *(২৪ ফেব্রুয়ারী '৯৭, দিনকাল)*

১৬। ২ অক্টোবর, ২০০০ মুন্সিগঞ্জে আওয়ামীলীগের দু'গ্রুপে বন্দুক যুদ্ধে ২ জন নিহত, আহত- ১২৫, গুলিবিদ্ধ-৫০। প্রভাব বিস্তারের জের ধরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়। *(৩ অক্টোবর, ২০০১, বাংলার বাণী)*

১৭। ২ অক্টোবর ২০০০, বগুড়া চেম্বার নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী ও যুবলীগ কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় হয়। শত শত রাউন্ট গুলি ও বোমার বিস্ফোরণে এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করে। *(৩ অক্টোবর ২০০০, যুগান্তর)*

১৮। ২২ জুন, ২০০০ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে বাগেরহাটে আওয়ামী লীগের দু'গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে ২০ জন আহত হয়। (*২ জুন ২০০০, আজকের কাগজ*)

১৯। গাজীপুরে আওয়ামী লীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ। গুলি - বোমা - অগ্নিসংযোগ। শেখ মুজিব ও হাসিনার ছবি ভাংচুর। *(৭ আগষ্ট '৯৮, ইনকিলাব)*

২০। দৈনিক আজকের কাগজের বিশেষ রিপোর্ট ঃ চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানা অশান্ত। আওয়ামী লীগের দু'গ্রুপের কোন্দল চরমে, রক্ত ঝরছে সাধারণ মানুষের। *(২১ মার্চ '৯৮, আজকের কাগজ)*

২১। ২ মে '৯৮ কুষ্টিয়ায় আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন নিয়ে সংঘর্ষে আহত - ৪০, ১০০ রাউন্ড গুলিবিনিময়। মন্ত্রীদের উপস্থিতিতেই সশস্ত্র সংর্ঘষের সৃষ্টি হয়। *(৩ মে '৯৮, আজকের কাগজ)*

২২। ঝিনাইদহের কালিগঞ্জে আ. লীগ- ছাত্রলীগ দ্বন্দ্ব চরমে। থানা ছাত্রলীগ সভাপতি খুন। *(১৭ জুলাই '৯৮, বাংলাবাজার পত্রিকা)*

২৩। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ ঢাকার আদালত প্রাঙ্গনে ছাত্রলীগ/যুবলীগের শীর্ষ সন্ত্রাসী হুমায়ূন কবীর মিলন ওরফে মুরগী মিলন নিজদলের কালা জাহাঙ্গীর দ্বারা খুন হয়। *(২৭ সেপ্টেম্বর ২০০০, প্রথম আলো/যুগান্তর/সংগ্রাম)*

২৪। ১ আগষ্ট ২০০০ খুলনায় আওয়ামী লীগ নেতা এস এম এ রব দলীয় প্রতিপক্ষ গ্রুপের হাতে নিজ বাসার সামনে গুলি বিদ্ধ হয়ে খুন হন। *(১২ আগষ্ট ২০০০, প্রথম আলো/ যুগান্তর/ ইনকিলাব)*

২৫। ১৩ জানুয়ারী '৯৭ সকাল সাড়ে এগারটায় খুলনা মহানগরীর খালিশপুর এলাকায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত দুটি সশস্ত্র গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে শহীদুল ইসলাম নামে একজন নিহত ও অন্য তিনজন আহত হয়। *(১৪ জানুয়ারী '৯৭, সংবাদ)*

২৬। ২৭ এপ্রিল ২০০০ ঢাকার তেজগাঁও এলাকার কাওরান বাজারে যুবলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ৩৯ নং ওয়ার্ড যুবলীগ সেক্রেটারী আব্দুল খালেক গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হয়। *(২৮ এপ্রিল ২০০০, সংগ্রাম)*

২৭। ২০০০ সালের মে মাসে আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয়েছেন ৫ ব্যক্তি। *(১ জুন ২০০০, আজকের কাগজ)*

২৮। ২৫ জুন শরীয়তপুর জেলায় আওয়ামী লীগের দু'গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে ১ জন নিহত ও ২০ আহত হয়। *(২৬ জুন ২০০০, যুগান্তর)*

২৯। ১৯ ও ২০ নভেম্বর ২০০০ মাত্র বার ঘন্টার ব্যবধানে ফেনীতে যুবলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে চার যুবলীগ নেতাকর্মী নিহত হয়। *(২ ডিসেম্বর ২০০০, প্রথম আলো)*

৩০। ২ অক্টোবর ২০০০ আ'লীগের দুই গ্রুপের প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে বন্দুক যুদ্ধে মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর থানায় ২ জন নিহত ও ১২৫ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৫০ জন গুলিবিদ্ধ। *(৩ অক্টোবর ২০০০, বাংলার বাণী)*

৩১। জনপ্রিয় আ'লীগ নেতা ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কালিদাস বড়াল হত্যাকান্ডে বাগেরহাট জেলা যুবলীগের ২ প্রভাবশালী নেতাসহ ১৪ জন জড়িত বলে পুলিশ নিশ্চিত হয়। *(১১ সেপ্টেম্বর ২০০০, যুগান্তর)*

৩২। ২৯ নভেম্বর '৯৭ আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে প্রকাশ্যে শহরের ব্যস্ততম সড়কে ২ জন ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মী খুন। চাঁদাবাজি ও দখল নিয়েই এই বিরোধ বলে জানা যায়। *(৩০ নভেম্বর '৯৭,ইনকিলাব)*

৩৩। ১৬ জুন নারায়নগঞ্জের জেলা আওয়ামী অফিসে কর্মীসভা চলাকালীন এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ২২ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়। জেলা আওয়ামী যুবলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে এই নারকীয় বোমা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী বলে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য যে, বোমা বিস্ফোরণের ঠিক পূর্বমুহূর্তে স্থানীয় গডফাদার সংসদ সদস্য শামীম ওসমান অফিস থেকে কৌশলে বেরিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। *(১৭, ১৮, ১৯ জুন ২০০১, যুগান্তর/ মানবজমিন)*

৩৪। ৩ জুলাই ভোলা সদর থানা আওয়ামী লীগ অফিসে এক বোমা বিস্ফোরণে এক মহিলা ও ২ শিশু গুরুতর আহত হয়। বিস্ফোরণে স্থানীয় প্রেসক্লাবের দ্বিতল ভবন বিধ্বস্ত হয়। আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে আওয়ামী লীগের একাংশের নেতারা এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় বলে খবরে প্রকাশ। *(৪ জুলাই ২০০১, যুগান্তর/ ইনকিলাব)*

আ'লীগ ও ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহতদের তালিকা

বছর	আ'লীগ	ছাত্রলীগ
১৯৯৬	৮	১২
১৯৯৭	১৮	২১
১৯৯৮	২৪	৬
১৯৯৯	২৭	১৮
২০০০	২৩	১৭
২০০১ (জুন পর্যন্ত)	৩৯	২২
মোট	১৩৯	৯৬

সূত্রঃ পুলিশ সদর দপ্তর/ আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকা।

না সরকার বিভিন্ন বোমা হামলার কোন তদন্ত রিপোর্টই প্রকাশ করেনি নিজেরা
ার ভয়ে।   সৌজন্যে : দৈনিক সংগ্রাম

ীকে প্রয়োজনে মাটি খুঁড়ে বের করার ঘোষণা দিলেও জনগণের মালের
ত ব্যর্থ হয় আওয়ামী সরকার।   সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন

বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বাধাদান

১। ১৭ জুন আওয়ামী ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীরা গুলি ও রাস্তায় ব্যারিকেডের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দক্ষিণাঞ্চল সফরে বাধা দেয়। বিএনপি নেত্রী বহনকারী গাড়ীকে লক্ষ্য করে প্রথমে কেরানীগঞ্জের আব্দুল্লাপুরের কাছে রাজেন্দ্রপুরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা গুলিবর্ষণ করে। এরপর মাওয়া ফেরী ঘাটে পৌছলে বেগম জিয়ার জন্য নির্ধারিত ফেরীটি স্থানীয় আওয়ামী সংসদ সদস্য-এর নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীরা ছিনিয়ে নিয়ে ভাসিয়ে দেয়। এতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বেগম জিয়া ঢাকা ফিরে এসে পুনরায় সাভার হয়ে তাঁর নির্ধারিত সফরে যাওয়ার চেষ্টা করলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে এবং সামনে অগ্রসর হতে বিরত রাখে। *(১৮ জুন ২০০১, জনকণ্ঠ/ মানবজমিন/ যুগান্তর)*

২। ২৫ সেপ্টেম্বর মোমেনশাহীতে চারদলীয় জোটের মহাসমাবেশে যোগদানের সময় ও ফেরার পথে স্থানীয় আওয়ামী -যুব ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন আমীর ও জোট শীর্ষ নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের গাড়ী বহরে হামলা ও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। ভালুকা ও ত্রিশালের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা মুক্তিযোদ্ধা-ছাত্র-জনতার ব্যানারে অধ্যাপক গোলাম আযমের গাড়ী বহরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। তবে জামায়াত - শিবিরের নেতা-কর্মীদের প্রতিরোধের মুখে সন্ত্রাসীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। *(২৬ সেপ্টেম্বর ২০০০, ইনকিলাব/মানবজমিন/বাংলার বাণী)*

৩। ৫ অক্টোবর ২০০০ স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সহযোগীতায় পুলিশ ও বিডিআর বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে রাস্তায় ব্যরিকেড দিয়ে সাতক্ষীরা যেতে বাধা প্রদান করে। বেগম জিয়া বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য সাতক্ষীরা যেতে চেয়েছিলেন। *(৬ অক্টোবর ২০০০, প্রথম আলো/যুগান্তর)*

৪। ১৫ নভেম্বর ১৯৯৯ টাঙ্গাইলে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী প্রার্থীকে জিতানোর জন্য নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি করা হয়। প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যায় বিরোধী এক কর্মীকে গাছের সাথে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে যাতে সে ভোট দিতে না পারে। *(১৬ নভেম্বর ১৯৯৯, প্রথম আলো)*

৫। ২০ জানুয়ারী পল্টন হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ১ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ কমিউনিষ্টপার্টিসহ অন্যান্য বামদল হরতাল আহ্বান করে। হরতাল চলাকালে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিলে প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া জনাব সেলিমকে মারতে উদ্ধত হন। *(২১ ফেব্রুয়ারী ২০০১, ইত্তেফাক/ সংগ্রাম)*

৬। ৯ মার্চ ২০০০ বিকেলে ঢাকার আজিমপুরে চার বিরোধী দলের মিছিলে লালবাগের আওয়ামী এমপি হাজী সেলিমের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। *(১০ মার্চ ২০০০, সংবাদ)*

৭। সাতক্ষীরার তালা থানাতে কৃষকের জমিতে নোনা পানি ঢুকিয়ে চিংড়ি চাষ করার প্রতিবাদে স্থানীয় কৃষকরা একটি সমাবেশ করতে চাইলে সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। অন্য স্থানে এই সমাবেশ করতে চাইলে স্থানীয় সংসদ সদস্য আ'লীগের কামাল বখত সাকি তার পেটোয়া বাহিনী ও পুলিশ দিয়ে সাধারণ কৃষকের উপর হামলা চালায়। *(২৭ আগষ্ট'৯৯, ইনকিলাব)*

৮। ৩০ মে '৯৯ নকলা থানা সদরে সাবেক সংসদ সদস্য বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নির্ধারিত স্থানে মুক্তিযোদ্ধা জনতার সভা (!) থাকার অজুহাতে ১৪৪ ধারা জারি ও স্থানীয় সরকারী দলের সমর্থকদের বাধার কারনে পণ্ড হয়ে যায়। সংঘর্ষে দুই পুলিশ সহ ১০ জন আহত হয়। *(৩১ মে'৯৯, জনকণ্ঠ)*

৯। ১০ এপ্রিল ২০০০ লালবাগের আওয়ামী এমপি হাজী সেলিম তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ডাকাতির অভিযোগে ঢাকা-নারায়নগঞ্জ মহাসড়ক ছয়ঘন্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে। *(১১ এপ্রিল ২০০০, প্রথম আলো/ইনকিলাব)*

১০। ৯ জুন '৯৮ 'পার্বত্য শান্তি চুক্তি' নামের কালো চুক্তি বাতিলের দাবীতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটসহ সম্মিলিত বিরোধীদল পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে লংমার্চ করে। লংমার্চ কাচঁপুর ব্রীজের নিকট পৌছলে নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী গডফাদার শামীম ওসমান ও নাজমা রহমানের বাহিনী শতাধিক ট্রাক এলোপাথাড়ি ফেলে রেখে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। দীর্ঘ ৯ ঘন্টা অবরুদ্ধ থাকার পর বিরোধী দলের দৃঢ় অবস্থানের কারণে শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা ব্যারিকেড ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আওয়ামী ছাত্রলীগের গুন্ডারা ঢাকা -চট্টগ্রামগামী যাত্রী বাস থেকে নামিয়ে ১০ জন মহিলাকে গণধর্ষণ করে। বহু মহিলাকে করে লাঞ্ছিত। *(১০ জুন '৯৯, ডেইলী স্টার/ইনকিলাব)*

১১। ১২ সেপ্টেম্বর '৯৯ ব্যর্থ আওয়ামী সরকারের পদত্যাগের দাবীতে বিরোধীদলগুলো সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর পর সরকার এর আশেপাশে ১৪৪ ধারা জারি করে। শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘটের মধ্যে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে সমাবেশ পন্ড করে দেয়। *(১৩ সেপ্টেম্বর '৯৯, ইনকিলাব/প্রথম আলো)*

১২। শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের নির্বাচনী এলাকায় বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হককে নমিনেশন দেয়ার গ্রীন সিগন্যাল দেন প্রধানমন্ত্রী। তবে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বাধার মুখে তিনি ভোলায় ঢুকতে পারেননি। ঢাকায় ফিরে তিনি বলেন, "ভোলায় কোন আইন শৃঙ্খলা নেই। সেখানে সন্ত্রাস ও অরাজকতা বিরাজ করছে"। *(১০ অক্টোবর ২০০০, প্রথম আলো/যুগান্তর)*

১৩। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ২৪ মার্চ ঢাকার পল্টনে ছাত্র মহাসমাবেশ আহ্বান করে। কিন্তু সরকার নানা অজুহাতে পল্টন ময়দানে সমাবেশ করার অনুমতি দেয়নি। পরে ছাত্রঐক্যের বিশাল সমাবেশটি পল্টনে মোড়ে অনুষ্ঠিত হয়। *(২৫ মার্চ ২০০১, সংগ্রাম/যুগান্তর)*

১৪। ২৪ ডিসেম্বর '৯৯ বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগ নামের নতুন একটি দলের কনভেনশান আহ্বান করেন। উক্ত সমাবেশে জাতীয় নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, কূটনৈতিক, সাংবাদিকসহ গন্যমাণ্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আওয়ামী-ছাত্রলীগ গুন্ডারা প্রকাশ্যে দিবালোকে পিস্তল উচিয়ে গুলি করতে করতে সমাবেশ স্থলে প্রবেশ করে মঞ্চ তছনছ করে ও নেতৃবৃন্দকে হত্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়। *(২৫ ডিসেম্বর '৯৯ ইত্তেফাক/ইনকিলাব)*

১৫। ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর স্মরণে চারদলীয় ঐক্যজোট পল্টন ময়দানে সমাবেশের আয়োজন করলে সরকার ময়দান ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেনি। এমনকি প্যারেড গ্রাউন্ডে সমাবেশের অনুমতি চাইলেও সরকার তা বাতিল করে। *(৭ নভেম্বর ২০০০, যুগান্তর/সংগ্রাম)*

১৬। শেখ মুজিব বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার ও নির্যাতনের নিমিত্তে তৈরী করেছিলেন "বিশেষ ক্ষমতা আইন"। নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনা ওয়াদা করেছিলেন ক্ষমতায় গেলে "বিশেষ ক্ষমতা আইন" বাতিল করবেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর তিনি বলেন, " বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের প্রশ্নই উঠে না"। উপরোক্ত, হাসিনা সরকার বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেন মানবাধিকার বিরোধী "জননিরাপত্তা আইন" নামক আরো একটি কালা-কানুনের মাধ্যমে -যেখানে জামিনের সুযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রায় ৮০ হাজার বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে এই আইনে মামলা করা হলেও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা গুরুতর অপরাধ করা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা নেয়া হয়নি।

আওয়ামী পুত্রধনদের কীর্তিগাঁথা
(১৯৯৬-২০০১)

১। ২৫ মে ২০০০ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদারের পুত্র জুয়েল বনানীতে সেলুলার ফোন ব্যবসায়ী ইফতেখার আহমেদ শিপুকে গুলি করে হত্যা করে। শিপু আওয়ামী ক্যাডারকে বিনা মূল্যে একটি সেলুলার ফোন দিতে অস্বীকার করায় তাকে গুলি করা হয়। *(২৬ মে ২০০০, প্রথম আলো/ ইনকিলাব)*

২। ১৬ মার্চ ২০০১ চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর ছোট ছেলে আশিক তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ওয়াইযঘাটের হাইস্পিড ঘাটে বেশ কয়েকটি গাড়ী ভাংচুর, ড্রাইভার ও যাত্রীদের মারধর করে। দ্রুত গাড়ী না চালাতে পারার অজুহাতে এ সময় তারা রাস্তার ক'জন নিরীহ পথচারীকেও কিল ঘুষি ও থাপ্পড় মেরেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। আশিক ও তার চেলারা স্থানীয় লোকজনকে শাসিয়ে বলে টুশব্দ না করতে। *(১৭ মার্চ ২০০১, মানবজমিন)*

৩। ৭ নভেম্বর চীফ হুইপ আবুল হাস্‌নাত আব্‌দুল্লাহর ছোট ছেলে আশিক আব্‌দুল্লাহ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সাদী মোহাম্মদের ছোট বোন নাসরিন ইয়াকুবের ছেলের কাছে চাঁদা দাবি করে। টাকা দিতে অস্বীকার করায় আশিক তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে দারোয়ানদের মারধর করে এবং জোরপুর্বক বাসায় ঢুকে টেলিফোন সেট ভাংচুর করে। আশিক আব্‌দুল্লাহ যাওয়ার সময় হুমকি দেয় "আমি চীফ হুইপের ছেলে, যাকে টার্গেট করি শেষ করে ফেলি, টাকা রেডি রাখবি।" *(৮ নভেম্বর ২০০০, প্রথম আলো/ সংবাদ/ যুগান্তর)*

৪। বাগেরহাট আওয়ামী লীগ নেতা কালিদাস বড়াল সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হন ২০ আগষ্ট। এ হত্যাকন্ডের পিছনে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল জড়িত বলে স্থানীয় লোকদের ধারণা। এই হত্যাকান্ডের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক জনসভায় মঞ্চে উপবিষ্ট শেখ হেলালের উদ্দেশ্যে জনগণ জুতা-স্যান্ডেল নিক্ষেপ করে। (২১ আগষ্ট ২০০০, সংবাদ/ বাংলার বাণী)

৫। সাপ্তাহিক হলিডেতে প্রকাশিত একটি সচিত্র খবরে বলা হয় প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় আমেরিকায় যে ভিজিটিং কার্ড (নেম কার্ড) ব্যবহার করেন তাতে তিনি নিজেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেন। ভিজিটিং কার্ডে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ অ্যামবেসির ঠিকানা ও ফোন নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ এ্যামবেসিতে নাকি তার বসার স্থানও আছে। কয়েক সপ্তাহ আগে সকল নিয়ম নীতি ভঙ্গ করে আমেরিকায় ট্রেড রিপ্রেজেনটিভ অফিসে জয় বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। যদিও ঐ বৈঠকে যোগদেয়ার জন্য পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন। *(১০ নভেম্বর, উইকলি হলিডে, ১৪ নভেম্বর ২০০০, সাপ্তাহিক যায়যায়দিন)*

৬। ২৫ এপ্রিল ২০০০ শেখ হাসিনার ফুফাত ভাই চীফ হুইপ আবুল হাস্‌নাত আব্‌দুল্লাহর পুত্র সাদিক আব্‌দুল্লাহ কলাবাগান ডলফিন গলির ৯০ নম্বরের ৭ তলা বাড়িটি দখল করে নেয়। সাদিক আব্‌দুল্লাহ ১০ মার্চ (২০০১) ক্যান্টনমেন্ট গেইটে নুরুল হক শিকদারের স্ত্রী ও ২ মেয়েকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। *(২৬ এপ্রিল ২০০০, সংবাদ, ১২ মার্চ ২০০১, মানবজমিন)*

৭। ৮ নভেম্বর ২০০০ আওয়ামী লীগ এমপি ও চীফ হুইপ আবুল হাস্‌নাত আব্‌দুল্লাহ পুত্র আশিক আব্‌দুল্লাহ ও তার ৩ সহযোগীকে পুলিশ ধানমন্ডির জনৈকা মহিলার বাড়িতে অবৈধ প্রবেশ, মারধর, চাঁদা দাবি ও হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করে। *(৯ নভেম্বর ২০০০, আজকের কাগজ/প্রথম আলো)*

৮। মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার পুত্র দীপু চৌধুরী ও তার দলবল সহকারী অ্যাটার্নী জেনারেল সৈয়দ সাজ্জাদুল হকের পুত্র কামরুল হাসানকে অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। দীপু চৌধুরী উত্তরায় কয়েকবিঘা জমি দখল করে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে অবৈধভাবে সুপার মার্কেট নির্মাণ করে। পরে সে মার্কেটটি সিটি কর্পোরেশন বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়। *(৭ জুন '৯৯, প্রথম আলো)*

৯। ভিআইপি সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত মোহাম্মাদপুর-ধানমন্ডি এলাকা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী এমপি মকবুল আহমদের তিন পুত্রের মধ্যে মেজ মাসুদ ও ছোট পান্নার সাথে যোগাযোগ আছে রাজধানীর টপটেরর মোল্লা মাসুদ ইমন-মুন্না প্রমুখের। এলাকার হত্যা, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস এবং দখলের প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে মাসুদ-পান্না জড়িত। *(৩০ মে ২০০০, সংবাদ)*

১০। ১১ মাসের ভাড়া পরিশোধ না করেই বাড়ী ছাড়লেন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত পুত্র সাদিক আব্‌দুল্লাহ। জুন '৯৯ থেকে এপ্রিল ২০০০ পর্যন্ত ১১ মাস বাড়ী ভাড়া বাবদ ৫৫ হাজার টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল প্রায় ৪৮ হাজার টাকা পরিশোধ না করেই ৯০, কলাবাগানের একটি বাড়ীর সপ্তম তলা থেকে চলে যান মিঃ সাদিক। উল্লেখ্য তিনি জোর করে ঐ বাড়ীতে উঠে ভাড়া থাকতে শুরু করেন। *(৫ মে ২০০০, বাংলাবাজার/ইনকিলাব)*

১১। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা 'ব্যাংক বাবু' খ্যাত আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর গুণধর পুত্র সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ চট্টগ্রাম চেম্বারের নির্বাচিত সভাপতি জাফরুল ইসলাম চৌধুরীকে সরিয়ে অন্যায়ভাবে চেম্বার দখল করেন এবং স্বঘোষিতভাবে চেম্বার সভাপতি হন। *(প্রথম আলো)*

১২। শেখ হাসিনার ভাইপো, চীফ হুইপ আবুল হাস্‌নাত আব্‌দুল্লাহ তৃতীয় পুত্র আশিক আব্‌দুল্লাহ বিরুদ্ধে অপহরণ, মারধর, মুক্তিপণ আদায়, ব্লাক মেইলিং-এর অভিযোগে গত ১৮ জুন ২০০০ তারিখে ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলাকারি সেন্টার ফর বিজনেস ষ্ট্যাডিজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইয়াছিন। মামলায় মি. ইয়াছিন বলেন, তার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'ও' লেভেলের ছাত্রকে চীপ

হুইপ পুত্র আশিক আবদুল্লাহ তার সহযোগীদের সহায়তায় অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং ১৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। (*২৩ জুন ২০০০, জনকণ্ঠ*)

১৩। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী এম এ মান্নানের পুত্র আব্দুল লতিফ টিপুকে আসামী করে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ একটি মামলা করা হয়। মন্ত্রীপুত্র টিপু তার ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী নিয়ে দক্ষিণ পাহাড়তলী মৌজার ০.৫ একর জমি দখল করে নেয়। এছাড়াও টিপুর বিরুদ্ধে ঠিকাদারি ব্যবসায় আধিপত্য বিস্তার, আদম ব্যবসায় প্রতারণা ও মূল্যবান কাঠ পাচারের অভিযোগ আছে। (*২০ অক্টোবর ২০০০, যুগান্তর*)

১৪। প্রধানমন্ত্রীর ভাইপো চীফ হুইপের গুণধর পুত্র মঈন আবদুল্লাহ শুক্রাবাদের একটি আবাসিক হোটেলের কক্ষ ও বিলিয়াড ক্লাব দখল করে। এমনকি মঈন তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ধানমন্ডির একটি ক্লিনিক থেকে নার্সকেও অপহরণ করে। পুলিশের বক্তব্য, মঈনের নামে একটি বাহিনী পুরো ধানমন্ডি এলাকা চষে বেড়ায়। (*১৫ নভেম্বর ২০০০, জনকণ্ঠ*)

১৫। ১২ খন্ড শরীর। দু'টি মাথা, দু'টি ধড়, দুজোড়া হাত আর দু'জোড়া পা। কোন দুর্গম জঙ্গলে নয়, পড়েছিল খোদ রাজধানীর সূত্রাপুর থানার আওতাধীন এক বক্সকালভাটের ভিতরে। সন্ত্রাসীরা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০০ রাতে মহসীন ও সায়েম নামের দুজন যুবককে গেন্ডারিয়া রাইফেলস ক্লাবে হত্যা করে লাশ টুকরা টুকরা করে ড্রেনে ফেলে দেয়। হত্যার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত নাহিদ, লাল্টু, আমীর, দেলওয়ার স্বীকার করেছে যুবলীগ নেতা রাহীদ হাসান সুমনের নির্দেশেই তারা এদের হত্যা করে। সুমন হাসিনার বান্ধবী, মহানগর আ'লীগের সভানেত্রী ও ওয়ার্ড কমিশনার নসিবুন আহমদের পুত্র। সুমনের নেতৃত্বে আড়াই বছরে গোন্ডারিয়া ক্লাবেই ১০ জন খুন হয়। (*১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০, বাংলার বাণী/ প্রথম আলো/ আজকের কাগজ*)

১৬। ৮ ফেব্রুয়ারী ২০০১ মৎস্য প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার পুত্র দিপু চৌধুরী উত্তরায় তারাজ উদ্দীন নামে এক সমাজ সেবককে হত্যা করে। উত্তরায় দক্ষিণখানস্থ ৪৭ কাঠার একটি জমি নিয়ে তারাজউদ্দীনের সাথে তার খালাতো বোন আলেয়ার বিরোধ দেখা যায়। দীপু চৌধুরী আলেয়ার পক্ষ নিয়ে জমিটি দখল করার নিমিত্তে তারাজউদ্দীনকে হত্যা করে। (*৯ ফেব্রুয়ারী ২০০১, সংবাদ/ মানবজমিন*)

১৭। ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের পুত্র মোহাম্মদ সাঈদ খোকনের বিরুদ্ধে গুলশান লেক দখল করে বাড়ি তৈরী করার অভিযোগ বহুদিনের। (*২৬ ডিসেম্বর ২০০০, যায়যায়দিন*)

১৮। লক্ষ্মীপুরের আবুতাহের এডভোকেট নুরুল ইসলামসহ বহু বিরোধী নেতাকর্মী ও নিরীহ জনগণের হত্যাকারী। ধর্ষণ, চাঁদাবাজি প্রভৃতি অপকর্মের সাথে জড়িত "তাহের বাহিনী"। "তাহের বাহিনীর" নেতৃত্বে আছে তার ছেলে বিপ্লব। (*৮ অক্টোবর ২০০০, প্রথম আলো*)

১৯। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের এক ছেলে তার দলবল নিয়ে ধানমন্ডি থানায় ঢুকে হাজতবন্দী তার প্রতিপক্ষকে মারধর করে। পরবর্তীকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েও এ বিষয়ে মোহাম্মদ নাসিম কোন পদক্ষেপ নেয়নি। *(৩০ অক্টোবর ২০০০, যায়যায়দিন)*

২০। মিরপুরের আওয়ামী সংসদ সদস্য কামাল মজুমদারের প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক নেতা এসএম মান্নান কচি। শেখ মুজিবের ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এপিএস বাহাউদ্দীন নাসিমের মদদপুষ্ট হয়ে কচি মীরপুরে বর্তমানে প্রতাপশালী। *(মানবজমিন)*

২১। শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ রুবেল (শেখ হেলালের ছোট ভাই)। রুবেলের মাস্তানীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা থাকে তটস্থ্। শিক্ষা ভবনের চাঁদাবাজি করতে গণধোলাই খাওয়া ছাত্রলীগের শফিক গ্রুপের শেল্টার দাতা এই রুবেল। *(ইনকিলাব)*

২২। আওয়ামী ভূমি প্রতিমন্ত্রী রাশেদ মোশার্‌রফের দু'পুত্র সাজেদ মোশাররফ সেবক ও জাভেদ মোশাররফ রূপক। জামালপুরের ইসলামপুর পৌরসভার সব ঠিকাদারী জাভেদ রূপকের হাতে। ইসলামপুরে বাধঁ নির্মাণ ও হার্ড পয়েন্টের কাজ থেকে (১৮ কোটি টাকার কাজ) জাভেদ কমিশন নিয়েছে ১ কোটি। সাজেদ সাবেক ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান। পৌরসভার সব ঠিকাদারী কাজে তার ১০% কমিশন। (*১৫ মে, ২০০১ মানবজমিন)*

খবর : প্রতিমন্ত্রী মায়ার পুত্র দীপু চৌধুরী তরাজউদ্দীন নামে একজনকে খুন করেও ঘুরে বেড়ান প্রকাশ্যে।
–সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন

খবর : একটি বাড়ী দখল করে মাত্র পাঁচশত টাকায় জামিন পেয়ে যান ক্ষমতার অপব্যবহার করে।
সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন

আওয়ামী শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) সাংবাদিক নির্যাতন

১। আবু তাহের, লক্ষ্মীপুর আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর চেয়ারম্যান। ৪ অক্টোবর ২০০০ লক্ষ্মীপুরে এক সমাবেশে বলেন, "যে সব সাংবাদিক আমার বিরুদ্ধে লিখবে তাদের হাত-পা কেটে নদীতে ফেলে দেব"। উক্ত সমাবেশে আ'লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী আবু তাহেরকে আশ্বস্থ করে বলেন," অস্থির হওয়ার কোন কারন নাই, ক'দিন পরই লেখালেখি বন্ধ হবে- ঘটনা চাপা পড়ে যাবে"। *(৫ অক্টোবর ২০০০, প্রথম আলো/যুগান্তর, ১৬ আগষ্ট ২০০০, আজকের কাগজ)*

২। ২৫ অক্টোবর ২০০০ সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোজাম্মেল হোসেন তার দলের কর্মীদের সাংবাদিকদের আক্রমণ করতে উৎসাহ দিয়ে বলেন, "যেখানে আপনারা সাংবাদিক দেখবেন তাদের হাড় ভেঙ্গে দেবেন। থানায় কোন মামলা হবে না"। আওয়ামী এমপি আব্দুল মান্নান তাঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলে প্রথম আলোকে হুমকি দিয়ে বলেন, "আমি প্রথম আলোর আলো নিভিয়ে দেব।" *(২৬ অক্টোবর ২০০০, প্রথম আলো/ মানবজমিন, ১৭ নভেম্বর, এশিয়া উইক)*

৩। ২৬ অক্টোবর ২০০০ সাতক্ষীরার আ'লীগ নেতা নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল কর্মী স্থানীয় "সাতক্ষীরা চিত্র" সাংবাদপত্রের অফিস ভাংচুর ও তছনছ করে এবং পত্রিকার সম্পাদক আনিসুর রহিমকে চাকু ও রিভলভার দিয়ে মারধর করে। দুর্যোগ পীড়তদের জন্য ত্রাণ তহবিলের অর্থ তসরুপ সম্পর্কে ঐ সংবাদপত্রে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পরই সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদকের উপর এ হামলা চালানো হয়। *(২৭ অক্টোবর ২০০০, প্রথম আলো/ সংবাদ)*

৪। ২৯ মে ২০০০ দৈনিক আজকের কাগজ পত্রিকার রিপোর্টার ও ক্রাইম রিপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি আমিনুর রহমান তাজকে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার করা হয়। আজকের কাগজে ১৮ মে "পুলিশ প্রশাসনে দুই বান্ধবীর চার কোটি টাকার মিশন" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যাতে বলা হয়, একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর স্ত্রী (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম) ও একজন উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী দুর্নীতির সাথে জড়িত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম হুমকি দিয়ে বলেন, "সাংবাদিক কুত্তার বাচ্চাকে আমি দেখে নেব।" *(৩০ মে ২০০০, আজকের কাগজ)*

৫। ১৫ জানুয়ারী ২০০০ তিনজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ঝিনাইদহের সাংবাদিক দৈনিক বীর দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক মীর ইলিয়াস হোসেনকে গুলি করে হত্যা করে। সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যার হুমকি দিলে তিনি পুলিশী নিরাপত্তা চেয়েও ব্যর্থ হন। *(১৬ জানুয়ারী ২০০০, লোকসমাজ/ ভোরের কাগজ)*

৬। ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০০ নারায়ণগঞ্জের একটি আদালত আওয়ামী দলীয় এমপি শামীম ওসমানের অভিযোগের ভিত্তিতে দৈনিক দিনকাল সম্পাদক এবং অন্যান্য

কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে। *(২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০০, দিনকাল)*

৭। ২০ মে ২০০০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ডেইলী ষ্টার রিপোর্টার মো: আবুল কালাম আজাদ ও অবজার্ভার রিপোর্টার তৌহিদকে মারধর করে এবং হত্যার হুমকি দেয়। *(২১ মে ২০০০, ডেইলী ষ্টার)*

৮। ৫ আগষ্ট ২০০০ চট্টগ্রামের স্থানীয় পত্রিকা 'দৈনিক আজাদী'-তে ১২ জুন ২০০০-এ সংঘটিত চাঞ্চল্যকর 'এইট মার্ডার'-এর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে প্রমাণ করা হয় যে, এইট মার্ডারের জন্য ছাত্রশিবির নয়, ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলই দায়ী। এরপর সরকারের চাপে পত্রিকাটি ৬ আগষ্ট ঘোষণা দিয়ে রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নেয় এবং ঐ রিপোর্টারকে চাকুরিচ্যুত করে। *(৬ আগষ্ট ২০০০,আজাদী)*

৯। ১৬ জুলাই ২০০০ জনকণ্ঠের রিপোর্টার ও বিবিসির বাংলা বিভাগের প্রদায়ক সাংবাদিক শামছুর রহমান কেবলকে সন্ত্রাসীরা যশোর অফিসে গুলি করে হত্যা করে। ১৭ সেপ্টেম্বর সরকার পন্থী দৈনিক সংবাদে প্রকাশ, এই হত্যাকান্ডে ঘটানোর জন্য কোটচাঁদপুর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দীন কালু হত্যার মূল নায়ক রাসেলকে ২৬ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করে। শামছুর রহমান হত্যা মামলার সাক্ষীদের হুমকি দিয়েছে যশোর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শরিফ আব্দুর রাকিব। *(১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০, সংবাদ, ১৭ জুলাই ২০০০, জনকণ্ঠ / যুগান্তর)*

১০। ১৬ জুন '৯৭ সোমবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা দৈনিক সংগ্রাম ও আল-মুজাদ্দেদ পত্রিকার রিপোর্টারকে মারধর করে এবং হত্যার হুমকি দেয়। *(১৭ জুন '৯৭, সংগ্রাম)*

১১। ১৮ মার্চ '৯৮ 'সাপ্তাহিক সুগন্ধা' সম্পাদক মো: আলম রায়হানকে কোন কারণ ছাড়াই পুলিশ গ্রেফতার করে এবং জেলে প্রেরণ করে। *(২৭ মার্চ '৯৮, Weekly Evidence)*

১২। ২৫ জানুয়ারী ২০০১ আ'লীগ সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারীর 'হাজারী বাহিনী'-এর সদস্যরা ইউএনবির ফেনী সংবাদদাতা টিপু সুলতানকে মারধর করে হাত-পা ভেঙ্গে দেয়। জয়নাল হাজারীর দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের খবর প্রচার করার জন্যই তাকে এ ভাগ্য বরণ করতে হয়। *(২৭ জানুয়ারী ২০০১,প্রথম আলো/ যুগান্তর)*

১৩। ৩০ আগষ্ট '৯৮ যশোরের চার খাম্বার মোড়ে কয়েকজন বন্দুকধারী গুলি করে রানার সম্পাদক আর এম সাইফুল আলম মুকুলকে হত্যা করে। *(১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮,জনকণ্ঠ/ইনকিলাব)*

১৪। ১০ মে '৯৯ সাপ্তাহিক ইভিডেন্স-এর সম্পাদক মেজর (অব:) মঞ্জুর কাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এমনকি ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সাপ্তাহিকটির ডিক্লিয়ারেশনও বাতিল করা হয়। *(৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯, নিউনেশন)*

১৫। ১৩ নভেম্বর ২০০০ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র সহকারী সচিব বাদী হয়ে ইনকিলাব সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ঢাকা সিএমএম আদালত থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। ১৩ নভেম্বর রাতেই পুলিশ ইনকিলাব ভবন তছনছ করে এবং সম্পাদক ও প্রকাশকের বাড়ীতে তল্লাশী চালায়। ১৪ নভেম্বর পুলিশ ইনকিলাবের পরিচালক মঈনুদ্দিনকে বনানীর বাসা থেকে গ্রেফতার করে ৩০ দিনের আটকাদেশ দেয়। *(১৪,১৫ নভেম্বর ২০০০, ইনকিলাব/ প্রথম আলো)*

১৬। ১৯ নভেম্বর ২০০০ আওয়ামী যুবলীগের কর্মীরা প্রেসক্লাবের সামনে দৈনিক ইনকিলাবের কপিতে অগ্নিসংযোগ করে। *(২০ নভেম্বর ২০০০, ইনকিলাব)*

১৭। ৬ অক্টোবর ২০০০ লক্ষ্মীপুরে আবু তাহের বাহিনীর ক্যাডাররা পেশাগত দায়িত্ব পালন কালে প্রথম আলোর ষ্টাফ রিপোর্টার একরামুল হক বুলবুলকে গুলি করতে উদ্বত হলে তিনি কোনো রকমে একটি চলন্ত বাসে উঠে আত্মরক্ষা করেন। *(৭ অক্টোবর ২০০০, মানবজমিন/ প্রথম আলো)*

১৮। ৫ অক্টোবর ২০০০ লক্ষ্মীপুরে আওয়ামী গডফাদার আবু তাহেরের ক্যাডার এবং সাদা পোশাকধারী পুলিশ মানবজমিনের ষ্টাফ রিপোর্টার শেখ মামুনুর রশীদকে লক্ষ্মীপুর এমনকি নোয়াখালী ছাড়তেও বাধ্য করে। *(৬ অক্টোবর ২০০০, মানবজমিন)*

১৯। ১২ ডিসেম্বর ২০০০ স্বাধীন মত প্রকাশের কারণে বাসসের বিশেষ সংবাদদাতা ও প্রখ্যাত সাংবাদিক গিয়াসকামাল চৌধুরীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। বাসস কর্তৃপক্ষের মতে তাঁর বিরুদ্ধে "গুরুতর অসদাচারণের" (!) অভিযোগ আছে। *(১৪ ডিসেম্বর ২০০০, জনকণ্ঠ)*

২০। ১৩ মার্চ ২০০০ চট্রগ্রামে প্রথম আলোর রিপোর্টার রফিকুল বাহার আওয়ামী লীগের শ্রম মন্ত্রী এম এ মান্নানের পুত্র আব্দুল লতিফ টিপুর জমি দখলের সংবাদ প্রকাশ করলে তাকে হত্যার হুমকি দেয়া হয় । (১৭ মার্চ ২০০১, *ডেইলী ষ্টার)*

২১। ২৪ মার্চ ২০০১ একদল সন্ত্রাসী ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রুহুল আমীন গাজীকে মগবাজারে ছুরিকাহাত করে। ছুরিকাঘাত করে ও দুর্বত্তরা জনাব গাজীর কাছ থেকে টাকা পয়সা বা অন্য কোন কিছু দাবি করেনি। ধারণা করা হয় জনাব গাজীকে হত্যা করার জন্যই সরকারী ক্যাডাররা এই আক্রমণ করে। *(২৫ মার্চ , ২৯ মার্চ ২০০১, ইনকিলাব/সংগ্রাম)*

২২। ২৫ ডিসেম্বর '৯৬ অফিস থেকে ফেরার পথে ছাত্রলীগের গুন্ডারা কবি, সাংবাদিক আব্দুল হাই শিকদারকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে উপর্যুপরি ছুরিকাহত করে। জনাব শিকদার অজ্ঞান হয়ে পড়লে মৃত্যু হয়েছে ভেবে তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যায় সন্ত্রাসীরা। (২৭ *সেপ্টেম্বর ১৯৯৬,ইনকিলাব/ সংগ্রাম)*

এক নজরে

আওয়ামী শাসনামলে সাংবাদিক নির্যাতন
(১৯৯৬-২০০১)

বছর	নিহত	আহত
১৯৯৬	৩	৬০
'৯৭	০	৫৫
'৯৮	৩	৫৮
'৯৯	০	৮৫
২০০০	২	৪৫
২০০১ (জুন পর্যন্ত)	১	৭০
মোট	৯	৩৭৩

বি:দ্রঃ * এই সরকারের ৫ বছরে শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেই ৮ জন সাংবাদিক খুন ও ৫০ জন আহত হয়েছে। *(উৎস: ২২ এপ্রিল ২০০১, জনকণ্ঠ, ২৫ এপ্রিল ২০০১, ডেইলী ষ্টার)*

- শুধু রাজশাহীতে এক বছরে ৫১ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। *(১৫ মে ২০০১, মানবজমিন)*

২৩। যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক লোক সমাজ পত্রিকার কলোরোয়া (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি মোহাম্মদ সোহরাব হোসেনকে যুবলীগ ক্যাডার শহীদ অপহরণ করে এবং শারীরিক নির্যাতন চালায়। খালেদা জিয়ার সভাস্থালে 'ভাংচুর এবং ত্রাণসামগ্রী লুট হয় শহীদের নেতৃত্বে' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশ করার কারণে সোহরাবের উপর এই নির্যাতন চালানো হয়। *(২৩ অক্টোবর ২০০০, প্রথম আলো)*

২৪। ২৭ অক্টোবর ২০০০ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক ও মানবজমিনের কূটনৈতিক রিপোর্টার মনোয়ারুল ইসলামকে সন্ত্রাসীরা সেগুন বাগিচা থেকে অপহরণ করতে চাইলে তার সহকর্মীদের প্রতিরোধে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। *(২৮ অক্টোবর ২০০০, মানব জমিন)*

২৫। আওয়ামী ওলামা লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাবিবুল্লাহ কাঁচপুরী বলেন, "যে সব সাংবাদিক ও সংবাদপত্র জয়নাল হাজারীর জনহিতকর কাজকে ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করে তাদের ঝাড়ুপেটা করা হবে"। *(জনকণ্ঠ)*

২৬। ৮ এপ্রিল '৯৭ সালের চার আওয়ামী বুদ্ধিজীবী সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরী, শামছুর রাহমান, শওকত ওসমান দৈনিক ইনকিলাবে বিজ্ঞাপন প্রদান ও পত্রিকাটি পড়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। *(৯ এপ্রিল ১৯৯৭, জনকণ্ঠ/ইনকিলাব)*

২৭। ৯ ডিসেম্বর ২০০০ একটি অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে স্বাধীন মত প্রকাশের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও ভূতপূর্ব দৈনিক গণকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক ড: আফতাব আহমাদকে ১২ ডিসেম্বর ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তিন মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করেন এবং ঐ দিনই ছাত্রলীগের ক্যাডাররা তার রুম ভাংচুর ও পেট্রোল দিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। *(১৪ ডিসেম্বর ২০০০, যুগান্তর/ইনকিলাব)*

২৮। ১৪ আগষ্ট ২০০০ দৈনিক ইনকিলাবের যশোর সংবাদদাতা মিজানুর রহমান তোতাকে কথিত সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যা মামলায় গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ। *(১৫ আগষ্ট ২০০০, জনকণ্ঠ/ ইনকিলাব)*

২৯। ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০১ সরকারপন্থী দৈনিক জনকণ্ঠে বিবিসির বাংলা বিভাগের প্রধান সৈয়দ মাহমুদ আলীর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। জনাব আলী ঐ সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিব সম্পর্কে খোলামেলা মন্তব্য করায় আ'লীগ তার উপর ক্ষুব্ধ হয়। আওয়ামী সরকারের চাপের কারনে জনাব মাহমুদ আলীকে বিবিসি ১২ এপ্রিল তার পদ থেকে অপসারণ করে। *(১৩ এপ্রিল ২০০১, মানবজমিন/যুগান্তর)*

৩০। ২০ জুন ২০০০ 'আমার ফাঁসি চাই' গ্রন্থের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান রেন্টুকে আ'লীগের লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীরা ২০ জুন পুরোনো ঢাকার বি. কে. দাস রোডে গুলিতে আহত করে। শেখ হাসিনার এক কালের ঘনিষ্ট সহযোগী জনাব রেন্টু ঐ বইতে হাসিনার স্বরূপ কিছুটা উম্মোচন করেছেন বলে মনে করা হয়। *(২১ জুন ২০০০, সংগ্রাম/ইনকিলাব)*

৩১। সরকার পুলিশ বাহিনী দিয়ে বিরোধী সংবাদপত্রে হামলা চালিয়েছে বারবার। এর মধ্যে মাসিক জাগো মুজাহিদ, সাপ্তাহিক ইভিডেন্স, সাপ্তাহিক জনতার ডাক, দৈনিক সংগ্রাম ও দিনকাল অফিস অন্যতম। *(সংবাদ ভাষ্য)*

৩২। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই মত প্রকাশের স্বাধীনতার টুটি চেপে ধরার জন্য বিরোধী সংবাদপত্র যেমন ইনকিলাব, সংগ্রাম, দিনকালে সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়। *(সংবাদ ভাষ্য)*

৩৩। ১১ অক্টোবর '৯৯ বিরোধী দলীয় নেতাদের বক্তব্য (যেমন বিএনপির ঢাকা মহানগর সভাপতির সাক্ষাৎকার ও মাওলানা সাঈদীর তাফসীর) প্রচারের কারণে দেশের প্রথম বেসরকারী চ্যানেল এটিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাংবাদিক সালাহউদ্দীন শোয়েব চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। এমনকি আওয়ামী সরকার চ্যানেলটি বন্ধ করে দেয়। *(১২ অক্টোবর '৯৯, ইত্তেফাক/ ইনকিলাব)*

৩৪। ৩১ আগষ্ট '৯৯ সরকারপন্থী দৈনিক জনকণ্ঠে হামলার মিথ্যা অজুহাতে সরকার বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও প্রখ্যাত সাংবাদিক আনোয়ার জাহিদকে গ্রেফতার করে। *(১ সেপ্টেম্বর '৯৯, ইত্তেফাক/সংগ্রাম)*

৩৫। ২৯ মার্চ ২০০০ ঠাকুরগাঁও-৩ আসন থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ এমপি এমদাদুল হক বাংলাবাজার পত্রিকার রিপোর্টার বিশাল রহমানকে পীরগঞ্জ চৌরাস্তায় হত্যার হুমকি দিয়ে বলেন, "ঐ শুয়োরের বাচ্চা বাষ্টার্ড সাংবাদিকের দুই হাত কেটে নিয়ে আসো। ব্যাটাকে ঠাকুরগাঁও থেকে জোরপূর্বক তুলে এনে

মেরে লাচ্ছি নদীর বালিতে তার লাশ পুতে রাখ।" উক্ত আওয়ামী এমপির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির খবর প্রকাশ করায় বিশালের বিরুদ্ধে এই হত্যার হুমকি। *(৫ এপ্রিল ২০০১, বাংলাবাজার পত্রিকা/দিনকাল)*

৩৬। ১৮ এপ্রিল ২০০০ গভীর রাতে যুবলীগ নেতা ও শুলক্বহর ওয়ার্ড কমিশনার মামুনুর রশীদের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী চট্রগ্রামস্থ 'পূর্বকোণ' পত্রিকার চীফ সাব এডিটর ইস্কান্দার আলী চৌধুরী ও.প্রবীণ সাংবাদিক জালাল উদ্দিনকে বেধড়ক মারধর করে। এক পর্যায়ে মামুন রিভালভার দিয়ে ইস্কান্দার আলীকে গুলি করতে উদ্দত হয়। এর আগেও মামুন তার ক্যাডারদের দ্বারা 'পূর্বকোণ' অফিসে ভাংচুর করে। উল্লেখ্য, মামুন চট্রগ্রাম এলাকার মন্ত্রী এম এ মান্নান ও মেয়র মহিউদ্দীনের প্রত্যক্ষ মদদে এসব কর্মকাণ্ড ঘটায়। *(২০ এপ্রিল ২০০১, যুগান্ত র/জনকণ্ঠ)*

৩৭। ১০ মার্চ ২০০০ পুলিশ দৈনিক জনকণ্ঠের সংবাদদাতা মহিউদ্দীন মুরাদকে লক্ষ্মীপুর থেকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলার অভিযোগ দায়ের করে। *(১১ মার্চ ২০০০, জনকণ্ঠ)*

৩৮। ৮ মার্চ ২০০০ দৈনিক দিনকাল সম্পাদক, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রকাশকসহ সাংবাদিক শামছুল আলম লিটন ও নারায়নগঞ্জ প্রতিনিধি এম. আর কামালকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ দিনকাল অফিসে হামলা চালায়। অস্ত্রহাতে সাদা পোষাকধারী পুলিশ দিনকালের সাংবাদিক ও কর্মচারীদের নাজেহাল করে। পুলিশ অফিসের কম্পিউটার ও আসবাবপত্রের ব্যাপক ভাংচুর করে। *(৯ মার্চ ২০০০, ডেইলী ষ্টার/দিনকাল)*

৩৯। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরপরই রাষ্ট্র পরিচালিত চারটি পত্রিকা *দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমস, সাপ্তাহিক বিচিত্রা* ও *পাক্ষিক আনন্দ বিচিত্রা* বন্ধ করে দেয়। এর ফলে উক্ত পত্রিকাগুলোতে কর্মরত শত শত সাংবাদিক চাকুরী হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়।

৪০। ২৪ এপ্রিল ২০০১ আওয়ামী যুবলীগের ক্যাডাররা ইনকিলাবের খুলনা ব্যুরোর ষ্টাফ রিপোর্টার মুনীরউদ্দীন আহমদকে লাঞ্ছিত করে। এমনকি কোন কারণ ছাড়াই যুবলীগ ঐ রিপোর্টারকে খুলনায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। *(২৫ এপ্রিল ২০০১, সংবাদ/ ইনকিলাব)*

৪১। রাজশাহী মহানগরীর মাদক ও অস্ত্র সম্রাট হিসেবে খ্যাত আরমান ও তার সহযোগীরা প্রথম আলো ও জনকণ্ঠের রাজশাহী প্রতিনিধি আনু মোস্তফা ও আনিসুজ্জামানকে হত্যার হুমকি দিয়েছে কয়েকবার। পত্রিকাদ্বয়ে ২৪ এপ্রিল "পলাতক আসামী আওয়ামী লীগের মিছিলে, প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করার পরপরই ঐ দুই সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। *(২৮ এপ্রিল ২০০১, জনকণ্ঠ/ প্রথম আলো)*

৪২। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই প্রখ্যাত সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুনকে দৈনিক বাংলার সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করে। এমনকি সরকার তার বিরুদ্ধে নিউজপ্রিন্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে দূর্নীতির অভিযোগ আনেন। মিথ্যা মামলার অপমান সহ্য করতে না পেরে দু:খে বেদনায় তিনি ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আনিত দূর্নীতির অভিযোগ পরবর্তীতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। *(১৪ জানুয়ারী ২০০১, জনকণ্ঠ)*

৪৩। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর প্রচারের অপরাধে (?) চট্টগ্রামের স্থানীয় দৈনিক কর্ণফুলীর বিরুদ্ধে এ্যাকশান নেয়া হয়। পত্রিকার সম্পাদক কবি আল মাহমুদ ও প্রকাশক আফসার উদ্দীন চৌধুরীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়। *(ইনকিলাব/ সংগ্রাম)*

৪৪। ৩ মে ২০০১ 'বিশ্বসংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবসে'ই ফেনী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *অতএব*-এর বার্তা সম্পাদক ও *দৈনিক মানবজমিন* দাগনভূঞা সংবাদদাতা শহীদুল আলম ইমরান হাজারী বাহিনীর 'ক্লাস কমিটি'র ক্যাডারদের হাতে প্রহৃত হন। মানবজমিনে *হাজারিকা*'র (জয়নাল হাজারীর স্থানীয় পত্রিকা) চাঁদা সম্পর্কিত রিপোর্ট লেখার জন্য ক্লাস কমিটির ক্যাডার আলম ও সুরুজের নেতৃত্বে ৮/১০ জন সন্ত্রাসী স্থানীয় একটি হাটের পাশে উক্ত সাংবাদিককে মাটিতে ফেলে লাঠি ও বন্দুকের বাঁট দিয়ে এলাপাতাড়ি পিটাতে থাকলে তার বাঁ হাত ভেঙ্গে যায়। *(৫ মে ২০০১, মানবজমিন/ জনকণ্ঠ/ Independent)*

৪৫। ২০ এপ্রিল ২০০১ প্রবীর শিকদার সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হন। শেখ সেলিমের (শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই) বেয়াই মুসা বিন শমসের এর ক্যাডার বাহিনী প্রবীরের উপর হামলা করলে তার এক পা কেটে ফেলতে হয়। *(২২ এপ্রিল, ১২ মে ২০০১, জনকণ্ঠ/ ইনকিলাব)*

৪৬। ৩ জুলাই রাজধানীর বিজয়নগরে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশ ও স্থানীয় যুবলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে দৈনিক ইনকিলাবের স্টাফ রিপোর্টার আবু সালেহ আকন ও ফটোসাংবাদিক নাসিম সিকদার গুরুতর জখম হয়। *(৪ জুলাই ২০০১, ইনকিলাব)*

বর : আওয়ামী দু:শাসনের পাঁচ বছরে তাদের ক্যাডারদের হাতে ৯জন সাংবাদিক নিহত
। বহুসংখ্যক আহত হয়। সৌজন্যে : দৈনিক সংবাদ

বর : আওয়ামী মন্ত্রী রাজ্জাক ও পাতিমন্ত্রী ডা. মোজাম্মেল সাংবাদিকদের হাতপা ভেঙ্গে নদীতে
ফলে দেয়ার জন্য দলীয় ক্যাডারদের নির্দেশ দেন। –সৌজন্যে : দৈনিক প্রথম আলো

আওয়ামী ছাত্রলীগের অপকর্ম
(১৯৯৬-২০০১)

ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সন্ত্রাস রাহাজানি নতুন কোন বিষয় নয়। মুজিববাদী ছাত্রলীগ শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দল সমর্থিত ছাত্রসংগঠনের উপর হামলা-খুন-সন্ত্রাস করে থেমে থাকেনা - নিজেরা নিজেদের মধ্যে প্রায় প্রতিদিনেই আত্মকলহ ও সন্ত্রাসের উৎসবে মেতে থাকা একটা সংগঠন। বলা চলে সন্ত্রাস নির্ভর ছাত্ররাজনীতিই ছাত্রলীগের মূল নীতি।

মুজিববাদী ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠালগ্নের কথা বাদ দিয়ে যদি শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তাদের সন্ত্রাস, রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ ছিনতাইয়ের অধ্যায়ের উল্টানো হয় তবে তাও একটি বিশাল কালো ইতিহাস হিসাবে লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীন বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্রাশ ফায়ারে "সেভেন মার্ডার" ঘটনা দিয়ে ছাত্রলীগের খুনের রাজনীতির যাত্রা শুরু। এই হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে যেমন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ছাত্র হত্যার রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ তেমনি ছাত্ররাজনীতিতে এখনও তা 'কালো অধ্যায়' বলে বিবেচিত। সন্ত্রাস নির্ভর ছাত্রলীগ এরপর আর পিছনের দিকে তাকায়নি -শুধু সন্ত্রাস, ধর্ষণ, রাহাজানি - ছিনতাই-চাঁদাবাজি, দখল, টেন্ডারবাজি ও খুনের মধ্য দিয়ে সামনেই অগ্রসর হয়েছে। তারা যে শুধু প্রতিপক্ষকে হামলা করে ক্ষান্ত হয়েছে তা-না, একসাথে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও ভাগ-বাটোয়ারা বিরোধের জের ধরে নিজ দলের প্রতিষ্ঠাকে যখন-তখন খুন করেছে। ছাত্রলীগের এই নৃশংস কর্মকান্ড আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণের পর আরো বেপরোয়া গতি লাভ করে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর সশস্ত্র ছাত্রলীগ যত বিরোধী নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে -তার থেকে বেশী নিজ দলের নেতা-কর্মীদের হত্যা করেছে। সংবাদপত্রের ভাষ্য মতে, গত ৫ বছরে (১৯৯৬-২০০১) ৬ শতাধিক ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী নিহত হয়েছে -যার মধ্যে ৫ শতাধিক নিজ দলের প্রতিপক্ষের হাতে নিহতের ঘটনা ঘটেছে। বাকী অংশের বেশীর ভাগই সন্ত্রাস, ছিনতাই, টেন্ডারবাজি ও ধর্ষণের ঘটনায় জনতার হাতে প্রহৃত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

২১ বছর পর আ'লীগ ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগের নৃশংসতা অতীতের যে কোন মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। এই সশস্ত্র ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের প্রতিটি ক্যাম্পাসকে এক একটি মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বুক সেলফ গুলো এখন বইয়ের বদলে অস্ত্রের গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিরোধী ছাত্রসংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের আবাসিক হল ছাড়তে বাধ্য করা হয়। শেখ হাসিনা

যাদের 'সোনার ছেলে' হিসাবে থাকেন - সেই সোনার ছেলেরা (!) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণের সেঞ্চুরী উৎসব পালন করে ন্যাক্কারজনক অধ্যায়ের সূচনা করে। ইংরেজী নববর্ষের অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মডেল কন্যা বাধনকে বিবস্ত্র করে ফেলার ঘটনা ছাত্রলীগের হাতে ঘটে। রাজধানীর "ফাইভ স্টার" "সেভেন স্টার" গ্রুপ নামে নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে কোটি কোটি টাকার টেন্ডার ছিনতায়ের নেতৃত্বে থাকে এই ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসীরা। শুধু তাই নয়, এদের হাতে পবিত্র কোরআন হাদীস গ্রন্থ ছিড়ে ছুড়ে ফেলার কালো অধ্যায়ও রয়েছে।

আমরা এখানে এসব তথাকথিত সোনার ছেলেদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখল, খুন ও হত্যা প্রচেষ্টা, ধর্ষণ ও অপহরণ এবং আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কিছু সারসংক্ষেপ দেশের জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক থেকে সম্পাদিত করে তুলে ধরেছি। যার মাধ্যমে মুজিববাদী হায়েনাদের অপকর্মের একটা সারসংক্ষেপ পাঠকরা পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

খুন ও হত্যা প্রচেষ্টা

১। ১৭ সেপ্টেম্বর '৯৬ পাইন্দং গইন্যাটিলা এলাকা থেকে ছাত্রলীগের (শা-পা) সশস্ত্র ক্যাডাররা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক নজরুল ইসলাম চৌধুরীকে অপহরণ করে ধুরং খালের চরে নিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে নির্মমভাবে খুন করে। (*২৭ সেপ্টেম্বর '৯৬, ইত্তেফাক*)

২। ২৭ ডিসেম্বর '৯৬ যশোরের শার্শা থানার উত্তর বুরুজবাগানে আ'লীগের সশস্ত্র কর্মীদের হামলায় নুরুল ইসলাম ফকির নামে একজন জামায়াত কর্মী খুন হয়। (*২৮ ডিসেম্বর '৯৬, ইনকিলাব*)

৩। ৬ মার্চ '৯৭ চট্রগ্রামের ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গুলিতে শিবির কর্মী আব্দুল মান্নান নিহত হন। মান্নান ছিল ফটিকছড়ি কলেজের এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী। তাকে ছাত্রলীগের গুন্ডারা অপহরণ করে ও পরে গুলি করে হত্যা করে। (*৭ মার্চ '৯৭, ইনকিলাব/সংগ্রাম*)

৪। ২৯ মার্চ '৯৭ ফেনীতে বিএনপি আহুত হরতাল চলাকালে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গুলিতে স্থানীয় যুবদল নেতা শরীফউদ্দীন নাসির (২৭) খুন হয়। (*৩০ মার্চ '৯৭, ইত্তেফাক*)

৫। ১২ এপ্রিল '৯৭ নববর্ষ উদ্‌যাপনের নামে চট্রগ্রামের রাউজানের রাণীপাড়ার ছাত্রলীগের কর্মীরা স্থানীয় এক ব্যক্তির বাঁশ জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ করায় ছাত্রদল নেতা বাবুলকে খুন করে সন্ত্রাসীরা। (*১৩ এপ্রিল '৯৭, দিনকাল*)

৬। ৭ নভেম্বর '৯৭ রাজধানীর খিলগাঁও তিলপাপাড়া এলাকার যুবদল নেতা ওয়ালিউল ইসলাম স্বপনকে স্থানীয় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা জবাই করে হত্যা করে। সে ২৭ নং ওয়ার্ডের যুবদল সভাপতি ছিল। (*৮ নভেম্বর '৯৭, ইনকিলাব/দিনকাল*)

৭। ৯ নভেম্বর '৯৭ সাভার থানা যুবদল সভাপতি ও পৌর কমিশনার মোকসেদ আলী মোল্লা নান্নুকে থানা থেকে চল্লিশ গজ দূরে ছাত্রলীগের শান্তা, মঞ্জুরুল আলম ও রাজীব গংদের নেতৃত্বে খুন করা হয়। (*১০ নভেম্বর '৯৭, দিনকাল*)

৮। ৩ সেপ্টেম্বর '৯৭ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিববাদী ছাত্রলীগের অতর্কিত হামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমিনুল ইসলাম বকুল নিহত হয় এবং ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী মারাত্মকভাবে আহত হয়। (*৪ সেপ্টেম্বর '৯৭, ইত্তেফাক*)

৯। ৭ সেপ্টেম্বর '৯৭ রাজধানীর ডেমরায় ছাত্রলীগের দূবৃত্তরা আহসানুলাহ (৪০) নামে এক ব্যক্তির দু'হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তাতে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে দূবৃত্তরা খন্ডিত ঐ দুই হাত নিয়ে উল্লাস করে। (*৮ সেপ্টেম্বর '৯৭, ইত্তেফাক*)

১০। ১৯ নভেম্বর '৯৭ চট্টগ্রামে পার্বত্য কালো চুক্তির প্রতিবাদে বিরোধীদলের মহাসমাবেশে পুলিশ ও আওয়ামী-ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলায় পুলিশসহ ৭ জন নিহত হয় । মহাসমাবেশে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। (*২০ নভেম্বর '৯৭, অবজারভার*)

১১। ২ ফেব্রুয়ারী '৯৮ জাতীয়তাবাদী যুবদলের একজন স্থানীয় নেতা রাতে যশোর শহরের রেল রোডে ছুরিকাহত হয়ে নিহত হয়। যুবদলের দাবী মতে, এ হত্যাকান্ড ছাত্র ও যুবলীগের ছেলেরা ঘটিয়েছে। (*৩ ফেব্রুয়ারী '৯৮, জনকণ্ঠ*)

১২। ১২ ফেব্রুয়ারী '৯৮ ঝিনাইদহে ছাত্রলীগের অস্ত্রধারীদের গুলিতে বিএনপি নেতা জামাত আলী খুন হন। (*১৩ ফেব্রুয়ারী '৯৮, ইনকিলাব*)

১৩। ১৩ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বড় বিলে পুলিশ ও মুজিববাদী ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডারদের যৌথ হামলায় জামায়াতের কর্মী মো: লোকমান হোসেন (২৩) খুন হন। (*১৪ ফেব্রুয়ারী '৯৮, সংগ্রাম*)

১৪। ১৪ ফেব্রুয়ারী '৯৮ চট্টগ্রামের ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকা রেয়াজুদ্দীন বাজারে ছাত্রলীগের সশস্ত্র চাঁদাবাজরা গুলি করে ব্যবসায়ী পুত্র ছাত্রদল নেতা গফুরকে হত্যা করে। দাবীকৃত চাঁদা না পেয়ে তারা হত্যাকান্ড চালায় বলে জানা যায়। (*১৪ ফেব্রুয়ারী '৯৮, সংবাদ/ দিনকাল*)

১৫। ৪ মার্চ '৯৮ গাজীপুরের টঙ্গী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে জাতীয় ছাত্র সমাজের মিছিলে সশস্ত্র মুজিববাদী ছাত্রলীগের বন্দুক হামলায় ১ যুবক নিহত ও অপর ১৫ জন আহত হয়। (*৫ মার্চ '৯৮, ইত্তেফাক/ জনতা*)

১৬। ২৫ সেপ্টেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুরে আওয়ামী-যুব ও ছাত্রলীগের দূবৃত্তরা শিবির নেতা তৌহিদকে ঘাড় ও পায়ের রগ কেটে হত্যা করে। সন্ত্রাসীরা নিহতের মাথার মগজও বের করে ফেলে। (২৬ *সেপ্টেম্বর '৯৭, সংগ্রাম*)

১৭। ১৪ ডিসেম্বর ২০০০ শেখ মুজিবর রহমান হত্যা মামলায় হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের ২ জন বিচারকের ভিন্ন ভিন্ন রায় মনোপুত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ক্যাডাররা শত শত গাড়ী ভাংচুর করে এবং নীলক্ষেতের মোড়ে ছাত্রলীগের ক্যাডার হেমায়েত প্রকাশ্যে পিস্তল উচিয়ে গুলি করে একজন টেম্পু চালককে হত্যা করে। *(১৫ ডিসেম্বর ২০০০, প্রথম আলো/ইত্তেফাক)*

১৮। ৯ ফেব্রুয়ারী '৯৯ রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরীর মোড়ে ছাত্রদলের হরতালের সমর্থনে মিছিলের উপর স্থানীয় এমপি মকবুল হোসেনের নেতৃত্বে আ'লীগ-যুবলীগ-ছাত্রলীগের গুলিতে ছাত্রদল নেতা সজল খুন হয়। (১০ ফেব্রুয়ারী '৯৯, ডেইলী ষ্টার/ ইত্তেফাক/ দিনকাল/ সংবাদ/সংগ্রাম)

ধর্ষণ ও অপহরণ

১। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতা, দুর্ধর্ষ ক্যাডার ও খুনী জসীম উদ্দীন মানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ ছাত্রীকে ধর্ষণের উল্লাসে "সেঞ্চুরী উৎসব" পালন করে। এ ঘটনা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে জাবি'সহ দেশের সর্বমহলে নিন্দা ও ধিক্কারের ঝড় উঠে। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মানিককে বহিস্কার করে এবং গণরোষ থেকে বাঁচার জন্য সে সরকারের আতাতে বিদেশ পাড়ি জমায়। *(সেপ্টেম্বর, আগষ্ট '৯৮, ইত্তেফাক/মানবজমিন/ডেইলী স্টার)*

২। ২৯ মে '৯৮ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে শহীদ হাবিবুর রহমান হলে ছাত্রলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক ভর্তিচ্ছু লিটন ধর্ষিত। ক্যাম্পাসে তোলপাড়। *(৩০ মে '৯৮, দিনকাল)*

৩। ২৩ সেপ্টেম্বর '৯৭ শহীদ হাবিবুর রহমান হলের ১৯২ নং কক্ষে মুন্নুজান হলের ছাত্রী সেলিনা আকতার ছাত্রলীগ নেতা সাইদুর রহমান পান্না কর্তৃক ধর্ষিত হয় ও পরে নিখোঁজ হয়। এ ঘটনার ৫ দিন পর্যন্ত ধর্ষিত ছাত্রীর কোন খোঁজ না পেয়ে সাধারণ ছাত্রীরা হল অফিস ভাংচুর করে। *(২৪ মে '৯৭, ইত্তেফাক)*

৪। ১৫ জানুয়ারী '৯৭ বরিশালের গৌরনদী থানার সুন্দরদী গ্রামের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী ডালিয়াকে ছাত্রলীগের একদল সশস্ত্র কর্মী যাত্রীবাহী লঞ্চ থেকে অপহরণ করে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পবিত্র রমজান মাসে এ অমানবিক ঘটনাটি ঘটে। *(১৮ জানুয়ারী '৯৭, ইনকিলাব)*

৫। ২২ ফেব্রুয়ারী '৯৭ গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া শেখ মুজিবুর রহমান কলেজের সাবেক জিএস ছাত্রলীগ নেতা কালুর নেতৃত্বে একদল ছাত্রলীগ দূবৃত্ত নববিবাহিতা নাজনীন নামে এক গৃহবধুকে ধর্ষণ করে। *(৩ মার্চ '৯৭, দিনকাল)*

৬। ১ মে '৯৮ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার পূর্ব একলাশপুর গ্রামে ৮ বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে ছাত্রলীগ নেতা জাহের হোসেন (৩০) ওরফে জাইয়াকে পুলিশ গ্রেফতার করে। *(৩ মে '৯৮, ইনকিলাব)*

৭। ৩১ আগষ্ট '৯৮ ফরিদপুর শহরের পশ্চিম খানশামাপুর ইউনিট যুবলীগ সভাপতি নাজমুল হাসান বেপারী (লিটন) ও তার দু'সহযোগী কর্তৃক জনৈকা মহিলা দর্জি

শ্রমিককে ধর্ষণ করে। পরে মহিলার চিৎকারে জনগণ এসে যুবলীগ সভাপতি লিটনকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। (*১ সেপ্টেম্বর '৯৮, ইনকিলাব*)

৮। ৩১ ডিসেম্বর '৯৯ বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সিতে ছাত্রলীগ নেতা রাসেল, মামুন কর্তৃক মডেল কন্যা বাঁধনকে বিবস্ত্র ও ধর্ষণের চেষ্টা। সারাদেশে ধিক্কার ও নিন্দা। (*১ জানুয়ারী ২০০০, ইনকিলাব/ মানবজমিন/ প্রথম আলো/সংগ্রাম*)

৯। ২১ ফেব্রুয়ারী '৯৯ একুশের প্রথম প্রহরে ফুল দিতে আসা ইডেন কলেজের ছাত্রীদের ওড়না ধরে টানাটানি করে ২০/২৫ জনকে লাঞ্ছিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মীরা। (*২৩ ফেব্রুয়ারী '৯৯, বাংলাবাজার পত্রিকা*)

১০। ৫ অক্টোবর '৯৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রীকে অপহরণ করে বিয়ের চেষ্টা। তদন্ত কমিটি গঠন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা। (*৬ অক্টোবর '৯৯, সংবাদ*)

১১। ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ বরিশাল বিএম কলেজ ছাত্রাবাসে ছাত্রলীগের বহিরাগত এক কর্মী কলেজের জনৈক ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা। তদন্ত কমিটি গঠন। (*৮ ফেব্রুয়ারী ২০০১, ভোরের কাগজ*)

১২। ১৮ জানুয়ারী, ২০০০ দৈনিক প্রথম আলোর এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়, বর্ষবরণের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত তরুণী লাঞ্ছিত ঘটনায় সংগঠনের বেশ কয়েকজন নেতা -কর্মী জড়িত থাকার বিষয় নিয়ে ছাত্রলীগ বিপাকে পড়ে। (*১৮ জানুয়ারী ২০০০, প্রথম আলো*)

১৩। ৯ এপ্রিল, ২০০০ চট্টগ্রামে গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত ৩ তরুণীকে ছাত্রলীগের সশস্ত্র একটি সন্ত্রাসী গ্রুপের ৩ ক্যাডার বাসা থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে। পাঁচলাইশ থানা এলাকার এ ঘটনার জনগণের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। (*১২ এপ্রিল ২০০০, মানবজমিন*)

১৪। ২৮ জুন, ২০০০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বর এলাকায় এক তরুণীকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে ধর্ষণ করে সূর্যসেন হলের ৪ ছাত্রলীগ ক্যাডার। (*৩০ জুন, ২০০০, প্রথম আলো/ সংবাদ*)

১৪। ফেনীতে ছাত্রলীগ নেতা কর্তৃক কলেজ ছাত্রী অপহৃত, জোর করে বিয়ের চেষ্টা। (*২৩ আগষ্ট '৯৮, সংগ্রাম*)

১৫। ৩ আগষ্ট '৯৮ নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী-ছাত্রলীগ ক্যাডার শাহ আলম কর্তৃক জেলার মহিলা কলেজের ছাত্রী রিমাকে অপহরণ। (*৬ আগষ্ট '৯৮, সংগ্রাম*)

১৬। ২৫ জুলাই, ২০০০ ফেনীতে ছাত্রলীগ কর্মী কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষিকা অপহৃত। স্কুল-কলেজ শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহল আতঙ্ক। (*২৭ জুলাই ২০০০, ইনকিলাব*)

১৭। ৫ জুলাই, ২০০০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের জহুরুল হক হলের এক ছাত্রলীগ ক্যাডারের কক্ষ হতে জন্ম নিরোধক বড়ি, ওড়না, লিপষ্টিক, পারফিউম ও লেডিস

ঘড়ি উদ্ধার। জানা গেছে, জনৈক বান্ধবী নিয়ে ছাত্রলীগ ক্যাডার এমদাদ তার কক্ষে অপকর্ম চালাত। (*৬ জুলাই ২০০০, ইনকিলাব*)

অভ্যন্তরীণ কোন্দল

১। ২৮ আগষ্ট '৯৬ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়। দলীয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্লোগান দেয়াকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। (*২৯ আগষ্ট '৯৬, ইত্তেফাক*)

২। ২৮ আগষ্ট '৯৬ গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের (শা-পা) বিবদমান দু'টি গ্রুপের মধ্যে প্রচন্ড গুলি বিনিময় হয়। এতে ৩ জন কর্মী আহত হয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক। (*৩০ আগষ্ট '৯৬, ইত্তেফাক/সংগ্রাম*)

৩। ২১ আগষ্ট '৯৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলে অবস্থানকারী ছাত্রলীগের একটি বহিরাগত গ্রুপ অছাত্র শাহীন খানের নেতৃত্বে অপর গ্রুপের (শামীম) দখলে থাকা জগন্নাথ হলে আক্রমণ চালায়। জানা যায়, এই সময় শামীম ও তার গ্রুপ মহসীন হল দখলে ব্যস্ত ছিল। (*২২ আগষ্ট '৯৬, ইত্তেফাক/ ইনকিলাব*)

৪। ১৮ অক্টোবর '৯৬ চট্টগ্রামের নন্দনকানন এলাকায় দু'দল সশস্ত্র ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে কয়েক দফায় ধাওয়া, গোলাগুলি ও বোমাবাজির ঘটনায় স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অচল হয়ে পড়ে। সংঘর্ষকালে পথচারীসহ ১০ জন আহত হয়। (*১৯ অক্টোবর '৯৬, ইনকিলাব/ সংবাদ*)

৫। ২০ এপ্রিল '৯৭ চট্টগ্রামের চকবাজার সিনেমা হলের সামনে দলীয় প্রতিপক্ষের গুলিতে ছাত্রলীগ নেতা মামুন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। দীর্ঘদিনের বিরোধের জের ধরে মামুনকে খুন করা হয় বলে জানা যায়। (*২১ এপ্রিল '৯৭, ইনকিলাব/ ইত্তেফাক*)

৬। ১৪ মে '৯৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর ক্যান্টিন এলাকায় ছাত্রলীগের মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের সাথে দলীয় প্রতিপক্ষ বহুজাতিক গ্রুপের সংঘর্ষে ছাত্রলীগের দু'জনসহ ৫ জন আহত। (*১৫ মে '৯৭, ইনকিলাব/সংবাদ*)

৭। ৬ জুন '৯৭ চট্টগ্রামে আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে দলীয় প্রতিপক্ষের গুলিতে সিটি কলেজের ছাত্রলীগ নেতা ও ছাত্র সংসদের সদস্য আসিফ আহমদ নৃশংসভাবে খুন হয়। (*৭ জুন '৯৭, সংগ্রাম*)

৮। ৯ মার্চ '৯৭ রাজধানীর জুরাইন এলাকায় ছাত্র ও যুবলীগের দু'টি গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও গোলাগুলিতে ২ জন নিহত ও ২০ জন গুলিবিদ্ধ হয়। নিহতরা ছিলেন সম্পর্কে দাদী ও নাতনি। তাদের নাম যথাক্রমে কানন বিবি (৬০) ও মিনা খাতুন (১৬)। (*১০ মার্চ '৯৯, ইত্তেফাক/ সংগ্রাম*)

৯। দৈনিক ইনকিলাবের এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের মাঠে সাতজন দলীয় কর্মীকে খুনের মধ্যে দিয়ে ছাত্রলীগের অন্ত:কোন্দলের শুভ (?) সূচনা হয়। ১৯৭৮-এ লিয়াকত হোসেন, '৮২ তে সলিমুল্লাহ হলে অজ্ঞাত পরিচয় দু'জন, '৮৩ তে

মুহসীন হলে ১ জন, সেলিম ও দেলোয়ার '৮৫ তে, রাউফুন বসুনিয়া '৮৬ তে, আসলাম '৮৭ তে, বাবলু মইনুদ্দিন, নুর মোহাম্মদ, ওয়াদুদ, হালিম মুন্না আঃ রহিম '৮৮ তে পাগলা শহীদ '৯০ তে চুন্নু, নিমাই ও ডাঃ মিলন '৯১ তে লিটন, মাহবুবুর রহমান, গালিব, লিটন ও মিজান '৯২ তে, বাদল, লাক্কু, রাজু ও মামুন মাহমুদ ৯৪ তে, জাকির '৯৫ তে, জয়দীপ, ফরিদ দেওয়ানসহ একাশি জন শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ জন, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ জনসহ শিক্ষাঙ্গন গুলোতে প্রায় ৫ শতাধিক ছাত্র খুন হয়েছে - যার অধিকাংশ ঘটনার সাথে ছাত্রলীগের সোনার (!) ছেলেরা জড়িত ছিল। *(এপ্রিল ২০০১, ইনকিলাব)*

১০। ১৯ আগষ্ট '৯৭ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আদায়কৃত চাঁদাবাজির অর্থ ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া -পাল্টা ধাওয়া এবং প্রচন্ড গুলি বিনিময়। ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক। *(২০ আগষ্ট '৯৭, সংবাদ/সংগ্রাম)*

১১। ২৫ আগষ্ট '৯৭ যশোর সরকারী সিটি কলেজে মুজিববাদী ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে ঘন্টা ব্যাপী বন্দুক যুদ্ধে পুলিশের উপস্থিতিতে ২০ জন আহত হয়। ক্যাম্পাসে কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও চাঁদাবাজির আধিপত্যকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে। *(২৬ আগষ্ট '৯৭, বাংলাবাজার পত্রিকা/সংগ্রাম)*

১২। ২ অক্টোবর '৯৭ চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে ৫ জন আহত হয়। হল দখলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাবু গ্রুপ ও মহীউদ্দীন গ্রুপের কোন্দলে ক্যাম্পাসে বার বার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা, নেয়নি। *(৩ অক্টোবর '৯৭, ভোরের কাগজ/দিনকাল)*

১৩। ১৮ অক্টোবর '৯৭ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঁদার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে ১ জন গুলিবিদ্ধ হয়। *(১৯ অক্টোবর '৯৭, ইত্তেফাক)*

১৪। ১ নভেম্বর '৯৭ নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রলীগের বিবদমান দু'গ্রুপের সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ৭ জন আহত হয়। *(২ নভেম্বর '৯৭, দিনকাল)*

১৫। ২৫ মে '৯৮ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতার কাছে বাকি খাওয়ার পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে দোকানদার প্রহৃত হয়। এ নিয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় গোটা ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। *(২৬ মে '৯৮, ইত্তেফাক/ আজকের কাগজ)*

১৬। ৩০ মার্চ ২০০০ ফেনীর দাগনভূঁইয়ায় ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘাতে ১০টি বাড়ি ও ৪টি দোকান ভাংচুর ও লুট এবং মহিলাসহ ২০ জন গুলিবিদ্ধ হয়। *(৩১ মার্চ ২০০০, আজকের কাগজ)*

১৭। ১৯ সেপ্টেম্বর '৯৯ ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগের তৈয়ব গ্রুপের হাতে টিপু গ্রুপের প্রধান রাশিদুল আনোয়ার খুন হয়। চট্টগ্রামে এই দু'গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। (*২০ সেপ্টেম্বর '৯৯, সংবাদ/সংগ্রাম*)

১৮। ১৬ মার্চ ২০০০ চট্টগ্রামে ঈদুল আজহার আগের দিন ছাত্রলীগের আ.জ.ম. নাসির গ্রুপ ও কাদের গ্রুপের সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ২ জন খুন। নগরীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরোধের জের ধরে এ ঘটনা ঘটে। (*২০ মার্চ ২০০০, ইনকিলাব/ প্রথম আলো*)

১৯। চট্টগ্রামের পশ্চিম বাকালিয়ার ডি.সি. রোডে চাঁদাবাজির ঘটনার ছাত্রলীগের দু'উপ-দলের কোন্দলে দলীয় ক্যাডার শহীদ খুন হয়। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক এলাকায় ছেঁড়া আকবর ও তাহের গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয় দু'জন, আহত হয় অর্ধ শতাধিক। (*এপ্রিল ২০০০, সংগ্রাম/ ভোরের কাগজ*)

২০। ১১ জুলাই, ২০০০ চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগের টিপু ও তৈয়ব গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে তৈয়ব গ্রুপের ৩ জন ক্যাডার খুন হয়। (*১২ জুলাই ২০০০, প্রথম আলো/ ডেইলী স্টার*)

২১। ১২ জুলাই, ২০০০ চট্টগ্রাম টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্যানেল জমা নিয়ে ছাত্রলীগের আ.জ.ম. নাসির গ্রুপ ও ছেঁড়া আকবরের নেতৃত্বাধীন অপর একটি গ্রুপের সংঘর্ষে ৮ জন খুন। জানা যায়, দলীয় এ দু'গ্রুপ ছাত্র সংসদে জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। (*জুলাই ২০০০, সংগ্রাম/ নিউ নেশন/ দৈনিক আজাদি*)

২২। ৮ জুলাই ২০০০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ । গুলিবর্ষণ ও বোমাবাজির কবলে পড়ে সাধারণ ছাত্ররা হল থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। (*৯ জুলাই ২০০০, ইত্তেফাক/অবজারভার*)

২৩। ৩০ সেপ্টেম্বর '৯৮ রাজধানীর তেজগাঁও পলিটেকনিকে আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছাত্রলীগ কর্মী হাফিজুর রহমান কনক খুন। (*১ অক্টোবর '৯৮, প্রথম আলো/সংগ্রাম*)

২৪। ২০ এপ্রিল '৯৭ চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে দলীয় প্রতিপক্ষের গুলিতে ছাত্রলীগ নেতা মামুন খুন। নগরীতে চরম উত্তেজনা। (*২১ এপ্রিল '৯৭, ইনকিলাব*)

২৫। ২১ মে '৯৭ ছাত্রলীগ (শা-পা) অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের কাজির দেউড়ি এলাকায় দলীয় কর্মী মুন্না খুন । প্রতিপক্ষরা তাকে খুব কাছ থেকে মাথায় ও উরুতে গুলি করলে তার মৃত্যু ঘটে। (*২২ মে '৯৭, ইনকিলাব*)

২৬। ৬ জুন '৯৭ আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে প্রতিপক্ষের গুলিতে চট্টগ্রাম সিটি কলেজের ছাত্রলীগ নেতা আসিফ আহমদ খুন হয়। চাঁদাবাজির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে আসিফকে গুলি করে হত্যা করা হয় বলে পুলিশ জানায়। (*৭ জুন '৯৭, সংগ্রাম/ ইত্তেফাক*)

২৭। ১০ জুলাই '৯৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রলীগ নেতা অছাত্র ইমাম হোসেন তনাই দলীয় প্রতিপক্ষের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়। একাধিক সূত্র মতে, তনাই ছাত্রলীগের মহানগরী উত্তর শাখার সহ পাঠাগার সম্পাদক ছিল। অছাত্র তনাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ২১৮ নং রুমে থাকত। *(১১ জুলাই '৯৭, ইত্তেফাক/ সংগ্রাম)*

২৮। ২৭ সেপ্টেম্বর '৯৭ চট্টগ্রামের ব্যস্ততম মোমিন রোডের ঝাঁউতলায় দিনে দুপুরে ছাত্রলীগের অস্ত্রধারীরা ব্রাশফায়ার করে কাজী আসমত উল্লাহ্ নামে একজন দলীয় কর্মীকে খুন করে। ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হওয়ার ঘটনায় পুলিশ জাভেদ ও কামাল নামক দু'জন ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করে। *(২৮ সেপ্টেম্বর '৯৭, ইনকিলাব/আজকের কাগজ)*

২৯। ১২ নভেম্বর '৯৭ মাদারীপুর জেলার শিবচর থানায় ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের বিবদমান দুটি গ্রুপের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে ৫ জন নিহত ও ৪০ জন আহত হয়। নিহত ৫ জন হল আব্দুর রব মাতব্বর, ঠাণ্ডু সরদার, রাশেদ, সাইদুর রহমান সাইদ এবং হুমাউন তালুকদার। *(১৩ নভেম্বর '৯৭, দি ইনডিপেন্ডেন্ট)*

৩০। ২৯ নভেম্বর '৯৭ যশোর শহরের ব্যস্ততম আর এন রোড এলাকায় দু'যুবলীগ কর্মী খুন। নিহতরা হচ্ছে শহরের আর এন রোডের মৃত আব্দুস সাত্তার মিয়ার পুত্র ডাকু (২৮) ও বারান্দী মাঠপাড়ার নওয়াব আলীর পুত্র ববি (২৮)। অন্তঃকোন্দলের কারণে এ হত্যাকান্ড ঘটে বলে জানা যায়। *(৩০ নভেম্বর '৯৭, জনকণ্ঠ)*

৩১। ২৩ ফেব্রুয়ারী '৯৮ চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই থানাধীন নিজামপুর কলেজে ছাত্রলীগের দু'টি বিবদমান গ্রুপের মধ্যকার সংঘর্ষে ১ জন নিহত ও ৮ জন আহত হয়। *(২৪ ফেব্রুয়ারী '৯৮, ইনকিলাব)*

৩২। ১৬ মার্চ '৯৮ কুমিল্লা শহরের কান্দিরপাড় ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সেক্রেটারী জালাল উদ্দীন (২৩) কে গভীর রাতে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে একদল দূর্বত্ত খুন করে। ঘটনার অভিযোগে কোতোয়ালী পুলিশ ছাত্রলীগের 'মাসলম্যান' হিসেবে পরিচিত এহছানুল হক (মীশু) ও সামাদানীকে গ্রেফতার করে । *(১৮ মার্চ '৯৮, জনকণ্ঠ/ সংগ্রাম)*

৩৩। ২ এপ্রিল '৯৭ চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে বন্দুক যুদ্ধে ১ জন নিহত ও আহত হয় ১০ জন। ঘটনায় গাড়ী ভাংচুরও করা হয়। *(৩ এপ্রিল '৯৭, জনকণ্ঠ)*

৩৪। ৩০ নভেম্বর '৯৮ রাতে দলীয় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে কলেজ কমিটির সহ-সভাপতি প্রার্থী ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল করিম ডাবু খুন হয়। *(২ ডিসেম্বর '৯৮, ভোরের কাগজ)*

৩৫। ২৮ জুন ২০০০ কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামে আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে আলমগীর নামে এক ছাত্রলীগের নেতা নিহত হয়। *(২৯ জুন ২০০০, আজকের কাগজ)*

৩৬। ১৬ জুলাই '৯৯ টাঙ্গাইলে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের অন্তর্দ্বন্দ্বের জের ধরে ইমাম হোসেন নিকছন নামে এক ছাত্রলীগ কর্মী খুন হয়। *(১৭ জুলাই '৯৯, আজকের কাগজ/ সংগ্রাম)*

৩৭। ২০ মে '৯৯ বগুড়ায় আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ২ জন নৃশংসভাবে খুন হয়। ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা এ সময় ব্যাপক ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। *(২১ মে '৯৯, দিনকাল)*

৩৮। ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ বরিশালে বোমা বানাতে গিয়ে ছাত্রলীগ কর্মী ও বিএম কলেজের ছাত্র জাহিদ হাসান নোমান নিহত হয়। জানা গেছে, শহরের নিজ দলের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতেই সে বোমা বানাচ্ছিল। *(৫ ফেব্রুয়ারী ২০০০, সংবাদ)*

৩৯। ২০ মে '৯৯ বগুড়ার সুলতানগঞ্জ পাড়াহাকির মোড়ে জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে নিজ দলের প্রতিপক্ষের হামলায় শহর ছাত্রলীগ সভাপতি তানভীর হাসান ও ছাত্রলীগ কর্মী ফরহাদ খুন হয়। *(২১ মে '৯৯, ইত্তেফাক)*

৪০। ১৪ জানুয়ারী '৯৯ বগুড়া শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল হক মামুন খুন। পুলিশ বলেছে, অস্ত্রবাজি, ছিনতাইসহ একাধিক মামলার আসামী ছিল মামুন। সূত্রমতে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি টেন্ডারের কাজের বিরোধ ধরে দলের প্রতিপক্ষ গ্রুপ তাকে জবাই করে খুন করে। *(১৫ জানুয়ারী '৯৯, ভোরের কাগজ)*

৪১। ১২ ফেব্রুয়ারী '৯৯ চট্টগ্রাম পলিটেকনিক্ ইনষ্টিটিউট দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে ৬ ঘন্টা বন্দুক যুদ্ধে ২৫ জন গুলিবিদ্ধ। *(১৪ ফেব্রুয়ারী '৯৯, সংবাদ)*

৪২। ২৬ মার্চ '৯৯ সিরাজগঞ্জ পৌরসভার সরাধানভাড়া গ্রামের খা পাড়ায় বৌ মেলার জুয়ার টাকা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের বিবদমান দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ছাত্রলীগ কর্মী মিল্টন নিহত হয়। আহত হয় ১০ জন। উল্লেখ্য যে, প্রতিবছর ছাত্রলীগ কর্মীরা এখানে বৌ মেলার নাম করে মদ, জুয়া, হাউজীসহ নানা রকম অশ্লীলতার আসর বসায়। *(২৮ মার্চ '৯৯, সংগ্রাম)*

৪৩। ১০ মার্চ '৯৯ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজির ভাগবাটোয়ার বিরোধের জের ধরে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় ও ভাংচুরের ঘটনায় আহত হয় ৫ জন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী লাঞ্ছিত। ৬ ছাত্রলীগ কর্মী গ্রেফতার। *(১১ মার্চ '৯৯, ইত্তেফাক/ প্রথম আলো/ সংগ্রাম)*

৪৪। ২৪ এপ্রিল '৯৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে দলের প্রতিপক্ষ গ্রুপের নেতা মুন্সি সেলিমকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে জখম

করা হয়। ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ৭ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার করে। (*২৫ এপ্রিল '৯৯, ইনকিলাব/ প্রথম আলো/ অবজারভার*)

৪৫। ৮ মে '৯৯ চট্টগ্রামের নিউমার্কেট এলাকায় ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে এক রিক্সাচালক নিহত ও অপর ২ জন গুলিবিদ্ধ হয়। পুলিশ জানায়, উত্তর জেলা ও দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। (*৯ মে '৯৯, ভোরের কাগজ*)

৪৬। ১ মে '৯৯ চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানায় মন্ত্রী মোশাররফ হোসেনের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের থানা সম্মেলনে দলের দু'গ্রুপে বৃষ্টির মত গুলিবিনিময়ের সময় শতাধিক আহত। উল্লেখ্য, সম্মেলনে সংসদ সদস্য আবুল কাশেম মাস্টার ও ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনও উপস্থিত ছিলেন। (*২ মে '৯৯, আজকের কাগজ*)

৪৭। ৬ মে '৯৯ মুহুর্মুহু বোমা বিস্ফোরণ আর গুলির মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের নিজ দলের প্রতিপক্ষকে বের করে দখল করে ছাত্রলীগের নেতা টোকাই শামীম। নিক্ষিপ্ত বোমা, গুলি ও কাদানে গ্যাসে হলটি ছাত্রশূন্য হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, টোকাই শামীম ৪ বছর আগে এই হলের কেন্টিন বয় ছিল। (*৭ মে '৯৯, বাংলাবাজার পত্রিকা*)

৪৮। ১২ জুলাই '৯৯ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে ৪ পুলিশ কনষ্টেবল, ২ কর্মচারীসহ ৫০ জন গুলিবিদ্ধ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ, গ্রেফতার ৪। (*১৩ আগষ্ট '৯৯, সংবাদ*)

৪৯। ১০ মে, ২০০০ ফেনী শহরের কেন্দ্রস্থলে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে একজন কর্মী খুন ও আরেকজন পঙ্গু হয়ে যায়। সূত্রমতে, জয়নাল হাজারীর সন্ত্রাসী স্টিয়ারিং বাহিনীর সদস্যদের হাতে এ ঘটনা ঘটে। (*১১ মে ২০০০, , আজকের কাগজ*)

৫০। আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দলে গত ১ মাসে ১৬ জন খুন হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছে ৯০ জন, আহত ২০০ জন এবং ৫০টি গাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট হয়। (*১৮ জুলাই ২০০০, সংগ্রাম*)

৫১। ৭ ফেব্রুয়ারী '৯৮ ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ছাত্রাবাসে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ১ জন কর্মী খুন হয়েছে, আহত হয়েছে ১৫ জন। (*৯ ফেব্রুয়ারী '৯৮, ইত্তেফাক/ ইনকিলাব/ প্রথম আলো/ সংগ্রাম*)

৫২। ১ সেপ্টেম্বর, ২০০০ কুমিল্লায় ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে স্থানীয় দু'গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে সম্মেলন পন্ড। অস্ত্র প্রদর্শন, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন। (*২ সেপ্টেম্বর ২০০০, আজকের কাগজ*)

৫৩। ৯ নভেম্বর, ২০০০ রাজধানীর বাড্ডা ক্লাবের আধিপত্য, চাঁদাবাজির প্রভাব ও তিতুমীর কলেজে ভর্তির কোটা নিয়ে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ

ক্যাডারদের সাথে বিরোধে ছাত্রলীগ নেতা আঁখি খুন হয়। (*১১ সেপ্টেম্বর ২০০০, আজকের কাগজ/ ইত্তেফাক*)

সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখল

১। ১৯ জুন '৯৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলক্ষেত ও পলাশীতে ছিনতাই করার সময় পুলিশ ছাত্রলীগ নেতাসহ তিনজনকে রিভলভারসহ গ্রেফতার করে। (*২০ জুন '৯৬, ইনকিলাব/জনতা*)

২। ৫ নভেম্বর '৯৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুহসীন হলের ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ইমরুল হাসান বাবুল নামের একজন অতিথিকে লাঞ্ছিত করে তার স্বর্ণের চেইন ও নগদ সাড়ে ১১শ টাকা ছিনিয়ে নেয়। (*৬ নভেম্বর '৯৬, ইত্তেফাক*)

৩। ৩১ ডিসেম্বর '৯৬ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের খুলনাস্থ বি এল কলেজ শাখা বছরের শেষ দিনটি সেলিব্রেট করেছে বন্দুক মিছিল এবং গুলি বর্ষণের মাধ্যমে। দুপুর বারোটার দিকে ছাত্রলীগের বি. এল কলেজ শাখা কলেজের প্রধান গেটে বহিরাগত লুঙ্গিপরা শ্রমিক দিয়ে এক ছাত্র সমাবেশেরও আয়োজন করে। (*১ জানুয়ারী '৯৭, ইনকিলাব*)

৪। ৮ জানুয়ারী '৯৭ দলীয় কেন্দ্রীয় সভাপতির উপস্থিতিতে ছাত্রলীগ (শা-পা) হল দখলের অভিপ্রায়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত ভাড়াটিয়া সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগীতায় ইসলামী ছাত্রশিবির, এলাকা বাসী এবং পুলিশের উপর দীর্ঘ তিন ঘন্টা হামলা, গুলিবর্ষণ ও বোমা ফাটিয়ে ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত করে। (*৯ জানুয়ারী '৯৭, সংগ্রাম/ইনকিলাব*)

৫। চট্রগ্রামের আনোয়ারা থানায় শিলপাড়া গ্রামের একটি হিন্দু বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ পুলিশ স্থানীয় যুবলীগের ৫ জন নেতাকে গ্রেফতার করে। (*৯ জানুয়ারী '৯৭, সংগ্রাম*)

৬। ১৭ জুলাই '৯৭ খুলনা নগরীর নতুন বাজার এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের গুদাম থেকে কয়েক লাখ টাকার মাল চুরি করে ট্রাক ভর্তি করে নিয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা এবং মহানগরী শাখার সাবেক সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেনকে পুলিশ আটক করে। (*১৮ জুলাই '৯৭, বাংলার বাণী*)

৭। ২৯ জুলাই '৯৭ কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের গুনবতীতে পুলিশের ছত্রছায়ায় আওয়ামী-ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা নির্বিচারে গুলিবর্ষণ, ১টি মাদ্রাসা, ৪টি বাড়ী ও ৬০টি দোকানে লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ ৩ ঘন্টাব্যাপী নারকীয় তান্ডব চালায়। তাদের হামলায় ১২ জন গুলিবিদ্ধসহ ৩০ জন আহত হয়। (*৩০ জুলাই '৯৭, ইনকিলাব*)

৮। ৬ ডিসেম্বর '৯৭ দলীয় সন্ত্রাসীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা করে। (*৭ ডিসেম্বর '৯৭, আজকের কাগজ*)

৯। ১৭ জানুয়ারী '৯৮ নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগ পোশাক প্রস্তুতকারক মার্কেট এলাকার জনৈক আওয়ামীলীগ নেতার পুত্রের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের ডাকাতি। লাখ

লাখ টাকার মালামাল লুট, দারোয়ানকে জখম করে সন্ত্রাসীরা। (*১৮ জানুয়ারী '৯৭, দিনকাল*)

১০। ৭ জুন '৯৮ লংমার্চের প্রচার কাজে ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর ৬ জন কর্মী প্রহৃত হয়। দাউদকান্দি টোল প্লাজার নিকট আওয়ামী ছাত্রলীগের গুন্ডারা মাইক ছিনিয়ে নেয় এবং ২ জন জামায়াত ও ২ জন বিএনপি কর্মীকে মারধর করে। (*৮ জুন '৯৮, ইনকিলাব/মানবজমিন*)

১১। ৮ জুন '৯৮ পার্বত্য কালো চুক্তির বিরুদ্ধে বিরোধী দলের পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে লংমার্চকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের মিরসরাইতে জামায়াতের প্রচার মিছিলে ছাত্রলীগের হামলা ও ২ জন কর্মীকে অপহরণ এবং ৩ জন শিবির কর্মীকে মারধর করা হয়। বরিশালে প্রচারণা চালানোর সময় আওয়ামী লীগের তথাকথিত গণতন্ত্রিরা জামায়াতের কর্মীদের উপর হামলা চালায়। তারা এখানেও দু'জন জামায়াত কর্মীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। (*৯ জুন '৯৮, সংগ্রাম*)

১২। ৯ জুন '৯৮ মঙ্গলবার পার্বত্য কালোচুক্তি বাতিলের দাবীতে আহুত ঐতিহাসিক লংমার্চ রাজধানী থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর পরই কাঁচপুর ব্রিজের নিকট আওয়ামী -ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের সৃষ্ট ব্যারিকেডের সম্মুখীন হয়। দাউদকান্দি ও কাঁচপুর এলাকায় তাদের আক্রমনে গুলিবিদ্ধ হয় অনেকে। বিরোধী দলের লংমার্চ কর্মসূচীকে বাধা দেয়ার লক্ষ্যে আওয়ামী সংসদ সদস্য একেএম শামীম ওসমান ও সশস্ত্র ছাত্রলীগের ক্যাডার বাহিনী সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করে রাখে। সন্ত্রাসীরা সাধারণ যাত্রী ও লং মার্চে গমনেচ্ছুদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। এমনকি প্রাইভেট কার ও বাসের যাত্রীদের অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে যাবার মত ঘটনাই শুধু ঘটায়নি- সোনার ছেলেরা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী ৪ জন মহিলা যাত্রীকে ধর্ষণ করে, যার মধ্যে একজন নববধুও ছিল। এছাড়া সোমবার রাত ৯টার দিকে এক আওয়ামী ভন্ডপীরের নেতৃত্বে ৪/৫শ ক্যাডার শিমরাইল এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চট্টগ্রামমূখী বাস ট্রাক ও প্রাইভেট কার চাকা পাংচার করে দেয় ও খুলে নেয়। এ সময় কয়েকজন তরুণীকে তাদের স্বামী ও আত্মীয় স্বজনের সামনে থেকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। নোয়াখালীগামী যাত্রী গৃহবধু আলোকে গোধুলী সিনেমা হলে তার ওপর সারারাত ধর্ষণ চালানো হয় বলে তার স্বামী অভিযোগ করে। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসছিলেন নওগাঁর জনৈক শিক্ষক। তার সাথে ছিল এইচএসসি পাশ যুবতী কন্যা। মেয়েটির ১২জুন বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হায়! রাজা দাহিরের উত্তরসূরী ছাত্রলীগের সেঞ্চুরী মানিকের বন্ধুরা ধর্ষণ করে মেয়েটির সব স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করে দেয়। এভাবে শামীম ওসমানের নেতৃত্বে ছাত্র-যুবলীগের হাতে ২০ জন মহিলার সম্ভ্রম লুট হয়। (*১০, ১১ জুন '৯৮, সংগ্রাম/ মানবজমিন/ ডেইলী ষ্টার*)

১৩। ৫ জুন '৯৮ সিলেট সদর থানার খাদিমপাড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত বহর মৌজার ১৪২ দাগের প্রায় ৩১ একর সরকারী জমি দখল করে নেয় ছাত্রলীগের সোনার

ছেলেরা। আনুমানিক ৫ কোটি টাকা মূল্যের সরকারী জমি দখলের পর "বঙ্গবন্ধু আবাসিক এলাকা" নামে সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়া হয়। *(৬ জুন '৯৮, মানবজমিন)*

১৪। ১ জুন '৯৮ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের উপর ছাত্রলীগের সশস্ত্র আক্রমণ। সাধারণ ছাত্রসহ বেশ কিছু শিবির কর্মী আহত ও বিশ্ববিদ্যালয় সেক্রেটারী মঞ্জুসহ অপর দুই নেতাকে কোন প্রকার ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ আটক করে। *(২ জুন '৯৮, দিনকাল)*

১৫। ২ জুন '৯৮ খুলনা নগরীর বাইতিপাড়া এলাকায় পুলিশের একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে যুবলীগ নেতা জহির উদ্দীন খান পান্নাসহ তার স্ত্রী এবং ৩ সহোদরকে চারটি অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একটি অত্যাধুনিক স্প্যানিশ পিস্তল এবং ৩টি এক নলা কাটা বন্দুক রয়েছে। (৩ *জুন '৯৮, মানবজমিন)*

১৬। ২৫ মে '৯৮ বুয়েটে মুজিববাদী ছাত্রলীগ ইসলামী ছাত্রশিবিরের রুম ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে তান্ডবলীলা চালায়। রাত ১০ টার দিকে ছাত্রলীগ এক জঙ্গী মিছিল বের করে। 'ধর ধর শিবির ধর, সকাল বিকাল নাস্তা কর' প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে শহীদ মিনারে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন হলে হলে গিয়ে শিবিরের ৬টি রুম ভাংচুর করে জিনিসপত্র তছনছ করে ও আগুন ধরিয়ে দেয়। সংশ্লিষ্ট প্রভোষ্টকে এ ঘটনার কথা লিখিতভাবে জানালেও প্রভোষ্ট কিছুই করতে পারেননি। (২৬ *মে '৯৮, ভোরের কাগজ/সংগ্রাম)*

১৭। ২৪ জুলাই '৯৬ সীতাকুণ্ডু (চট্টগ্রাম) কলেজ এবং আলীয়া মাদ্রাসায় ছাত্রলীগ কর্মীরা কয়েকদফা হামলা চালিয়ে ১০ জনকে মারাত্মক আহত করে। পক্ষান্তরে পুলিশ মাদ্রাসা ছাত্রাবাসে এবং মসজিদের অভ্যন্তরে হানা দিয়ে ২০ জন শিবির নেতা-কর্মীকে আটক করে। *(২৫ জুলাই '৯৬, দিনকাল)*

১৮। ২৫ আগষ্ট '৯৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল থেকে ছাত্রলীগের ক্যাডার ও কেন্দ্রীয় নেতা শামীম আহমেদকে গ্রেফতার করার পর ৫০/৬০ জন ছাত্রলীগ কর্মী পুলিশের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়। *(২৬ আগষ্ট '৯৬, ইত্তেফাক)*

১৯। ১৬ সেপ্টেম্বর '৯৬ ঢাকা কলেজে ছাত্রদল আয়োজিত নবীনবরণ অনুষ্ঠান ছাত্রলীগ কর্মীরা বোমাবাজি করে পণ্ড করে দেয়। (১৭ *সেপ্টেম্বর '৯৬, ইত্তেফাক)*

২০। ৩০ অক্টোবর '৯৬ রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই থানাধীন রেশম বাগান চেকপোষ্টের পুলিশ ৩টি পাইপ গান, ৬ রাউন্ড তাজা গুলি ও ১ টি কিরিচ সহ ৮ জন ছাত্রলীগ নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করে। *(১ নভেম্বর '৯৬, ইনকিলাব)*

২১। ২১ ডিসেম্বর '৯৮ রাজশাহী পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে ঘাপটি মেরে থাকা বহিরাগতদের নিয়ে ছাত্রলীগের কয়েকজন সন্ত্রাসী নামায পড়তে যাওয়ার সময় শিবির কর্মী তরিকুল ইসলাম ও আবু সাঈদ ফারুকের উপর ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে। (২২ *ডিসেম্বর '৯৮, সংগ্রাম/ দিনকাল)*

২২।১ জানুয়ারী '৯৭ ইংরেজী নববর্ষের রাতে ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরা কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে শিবির কর্মীদের উপর আক্রমন চালিয়ে ২ জনকে গুরুতর আহত করে। (*২ জানুয়ারী '৯৭, সংগ্রাম*)

২৩। ২৩ ফেব্রুয়ারী '৯৭ ছাত্রলীগের একদল কর্মী ছাত্রদলের শেরে-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ নেতা মামুন রেজা খান তন্ময়ের মাথা ইট দিয়ে গুড়িয়ে দেয় এবং দাঁত উপড়ে ফেলে। সোহেলকে প্রাচীন যুগীয় কায়দায় ইট দিয়ে সমস্ত শরীর থেঁথলে ফেলা হয়। (*২৪ ফেব্রুয়ারী '৯৭, ইত্তেফাক/ দিনকাল*)

২৪। ২৩ মার্চ '৯৭ বিরোধী জোটের হরতাল চলাকালে রাজধানীর বিজয়নগরে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বয়োবৃদ্ধ বিএনপি নেতা আব্দুল মতিন চৌধুরীকে পুলিশের সামনেই ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা মারাত্মক আহত করেন। (*২৪ মার্চ '৯৭, ইত্তেফাক/সংগ্রাম*)

২৫। ২৭ এপ্রিল '৯৭ বন্দরনগরীর পাহাড়তলী থানা পুলিশ দিনের বেলা চট্রগ্রাম টিভি কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী সড়ক দিয়ে চোরাই মোটর সাইকেল নিয়ে পালানোর সময় অস্ত্রসহ ছাত্রলীগ কর্মী জিয়াউল কবীর ও জামসেদ আহমদকে গ্রেফতার করে। (*২৮ এপ্রিল '৯৭, দিনকাল*)

২৬। ৮ মে '৯৭ হত্যা মামলার আসামী ছাত্রলীগ নেতা শাহ আলমকে গ্রেফতারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সাথে ছাত্রলীগের ২ ঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধে কলেজ অধ্যক্ষ, এ এস পি, প্রভাষক, ১০ কনষ্টেবল সহ ৩৫ জন আহত হয়। (*৯ মে '৯৭, ইত্তেফাক*)

২৭। ১৮ জুন '৯৭ কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার গুনবতী বাজারে শিবির কর্মী মোহাম্মদ ওয়াসিমকে মুজিববাদী ছাত্রলীগের কর্মীরা মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত করে। আওয়ামী দূর্বৃত্তরা তার মূত্রথলি, কিডনি, হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয়। (*১৯ জুন '৯৭, সংগ্রাম*)

২৮। ১৮ নভেম্বর '৯৭ পাবনায় জামায়াতের মিছিলে ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীদের নারকীয় হামলায় জামায়াতের জেলা আমীরসহ ছাত্রশিবির ও জামায়াতের শতাধিক নেতাকর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। (*১৯ নভেম্বর '৯৭, আজকের কাগজ*)

২৯। ১৯ নভেম্বর '৯৭ পাবনায় ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা পাবনা শহরে জামায়াত ও শিবিরের অফিসে হামলা এবং জামায়াত নেতা ও আইনজীবি হামিদুর রহমানের বাসায় অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটতরাজ করে। দুপুর সাড়ে বারটায় শতাধিক ছাত্রলীগ কর্মী আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে মিছিল শেষে এ ঘটনা ঘটায়। (*২০ নভেম্বর '৯৭, সংগ্রাম*)

৩০। ২৭ নভেম্বর '৯৭ চট্রগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপর ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। বেগম জিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টা ব্যর্থ। বিএনপি নেত্রী বেগম জিয়া চট্টগ্রামে ভূমিকম্পে আহতদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য মেডিকেলে গেলে

পুলিশের সামনেই ছাত্রলীগের কর্মীরা এ ঘটনা ঘটায়। *(২৮ নভেম্বর '৯৭, ইনকিলাব/ইত্তেফাক)*

৩১। ১৬ জানুয়ারী '৯৮ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতারা কৃষি রসায়ণ বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড: শাহজাহান আলীকে গুলি করে হত্যার হুমকি দেয়। তাদের দাবী, তারা ৪বার ফেল করেছে এবং তাদেরকে পাশ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। *(১৭ জানুয়ারী '৯৮, আজকের কাগজ/ সংগ্রাম)*

৩২। ২৪ ফেব্রুয়ারী '৯৮ সরকারী দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান ও ম্যাজিষ্ট্রেটের চেম্বারে ঢুকে তাকে লাঞ্ছিত করায় সরকারী দলের ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে খুলনা জেলার বয়রা থানা ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা দায়ের করেন। *(২৫ ফেব্রুয়ারী '৯৮ ইনকিলাব)*

৩৩। ৬ ফেব্রুয়ারী '৯৮ চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের এক সন্ত্রাসী নেতার গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে লীগের সশস্ত্র কর্মীরা শ' শ' রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে ও বোমা ফাটিয়ে নগরীতে ব্যাপক তান্ডবলীলা চালায়। এ সময় তারা ব্যাপক গাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করে। *(৭ ফেব্রুয়ারী '৯৮,বাংলার বাণী)*

৩৪। ২৫ সেপ্টেম্বর '৯৬ ইডেন কলেজে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বোরকা পরে কলেজের হোস্টেলে ঢুকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রীদলের উপর হামলা চালালে প্রায় ৫০ জন ছাত্রী আহত হয়। আওয়ামী সংসদ সদস্য হাজী সেলিম এ সময় পার্শ্বে দাড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি অবলোকন করেন। *(৩০ সেপ্টেম্বর '৯৬, দিনকাল/ ইনকিলাব)*

৩৫। ২০ এপ্রিল '৯৭ বগুড়া শহরে সোনার দোকান লুট। জনতা কর্তৃক ছাত্রলীগ নেতা আটক করে পুলিশে সোপর্দ। *(২২এপ্রিল '৯৭, দিনকাল)*

৩৬। ২৩ আগষ্ট '৯৮ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ- বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা রেহনুমা ছাত্রলীগ ক্যাডারের হাতে লাঞ্ছিত। *(২৪ আগষ্ট'৯৮, মানবজমিন)*

৩৭। ২৬ জুন ২০০০ রাজধানীতে শিক্ষাভবনের সামনে অবৈধ গাড়ী পার্কিংয়ে কর্মচারীরা বাধা দিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা শফিকের নেতৃত্বে ব্যাপক গুলি বর্ষণ। গুলি বর্ষণের সময়েই কর্মচারীরা ছাত্রলীগের ঐসব ক্যাডারদের আটক করে গণধোলাই দেয় এবং পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। *(২৭ জুন ২০০০, সংবাদ/ প্রথম আলো /সংগ্রাম)*

৩৮। ২০ আগষ্ট '৯৯ চট্টগ্রাম এমইএস কলেজ ছাত্রলীগের অর্ধশতাধিক সশস্ত্র কর্মী চট্টগ্রাম জেলা কারাগার ঘেরাও করে জেল সুপারের উপর হামলার চেষ্টা চালায়। জানা যায়, কারাগারে বন্দী কলেজ ছাত্র সংসদের জি এস ও ছাত্রলীগ নেতা হেলাল আকবর চৌধুরী বাবরকে একজন কারারক্ষী কর্তৃক প্রহার করার ঘটনা কারাগারের বাইরে প্রকাশ পেলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা এ হামলা চালায়। *(২২ আগষ্ট'৯৯, ইনকিলাব)*

৩৯। ২৩ মে '৯৯ রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী কলেজ শাখার ছাত্রলীগ সভাপতি সিরাজউদ্দীন ভোররাতে ছিনতাই করে পালানোর সময় জনতা ও পুলিশের হাতে

অস্ত্রসহ ধরা পড়ে। ছাত্রলীগের এই ছিনতাইকারী নেতার নিকট হতে দুই রাউন্ড গুলিসহ একটি রিভলবার উদ্ধার করা হয়। *(২৪ মে '৯৯, ইত্তেফাক/দিনকাল)*

৪০। ১ এপ্রিল '৯৯ মেহেরপুর থেকে অবৈধ অস্ত্রসহ ছাত্রলীগ নেতা রিটুকে পুলিশ গ্রেফতার করে। *(২এপ্রিল '৯৯, দিনকাল)*

৪১। ৫ এপ্রিল '৯৯ রাজশাহী মহানগর পুলিশের রাজপাড়া থানায় নাগরিক সমাজের ব্যানারে ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় পুলিশের ১৫ জন আহত হয়। *(৬ এপ্রিল '৯৯, ইনকিলাব)*

৪২। ৬ জুন '৯৭ দিনাজপুরে নৈশকোচে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পুলিশ অস্ত্রসহ দুই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতার করে। *(৭ জুন'৯৭, আজকের কাগজ)*

৪৩। ২৪ ডিসেম্বর '৯৯ ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আওয়ামীলীগের বিদ্রোহী নেতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর নতুন দল গঠনের জন্য আহুত কনভেনশনে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে অর্ধশতাধিক ব্যক্তিকে আহত করে। এ সময় কাদের সিদ্দিকী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দকে প্রাণ নাশের চেষ্টাও চালানো হয় । *(২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯, জনকণ্ঠ/ সংগ্রাম/ প্রথম আলো)*

৪৪। ৯ জুলাই '৯৬ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ (শা-পা) নেতা-কর্মীরা প্রশাসনিক ভবনে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও ক্ষতিসাধন করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা ৭ জন অফিসারসহ ছাত্র-ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করে। *(১০ জুলাই '৯৬, ইনকিলাব)*

৪৫। ১৮ আগষ্ট '৯৮ আগারগাঁওয়ে শোক দিবস পালনের নামে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সোয়া একর জমির একটি বাড়ী দখল ও ৮ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করা হয়। *(১৯ আগষ্ট '৯৮, দিনকাল)*

৪৬। ২৩ আগষ্ট '৯৮ লক্ষ্মীপুরে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা ছাত্রদল নেতা জসিম উদ্দিনের ডান পায়ের রগ কেটে দেয় এবং পেটে ও পিঠে মারাত্মক ছুরিকাঘাত করে। *(২৪ আগষ্ট '৯৮, ইনকিলাব)*

৪৭। ১৮ মার্চ '৯৯ কুমিল্লার কোতোয়ালী থানার দারোগা মোশাররফ হোসেনের মোটর সাইকেল চুরি করে পালানোর সময় স্থানীয় ছাত্রলীগ ক্যাডার মিন্টু গ্রেফতার। *(২১ মার্চ '৯৯, সংগ্রাম)*

৪৮। ২২ মার্চ '৯৯ দলের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ পড়ায় ছাত্রলীগ কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনে ব্যাপক ভাংচুর করে। *(২৩ মার্চ '৯৯, সংবাদ)*

৪৯। ২১ ফেব্রুয়ারী '৯৯ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চা দিতে দেরী হওয়ায় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা মাওলানা ভাসানী হলের সম্মুখস্থ দোকানে গুলি ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে ৬ জন গুলিবিদ্ধ এবং ২০/২৫ দোকান ভস্মিভূত হয়। *(২৩ ফেব্রুয়ারী '৯৯, সংগ্রাম)*

৫০। *২০ এপ্রিল '৯৯,* দৈনিক ভোরের কাগজের এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি আবাসিক হলে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের অত্যাচারে সাধারণ ছাত্ররা অতিষ্ট হয়ে উঠে। হল দখল, পাল্টা দখল, ক্যান্টিনে দেনা-পাওনা, দলীয়

মিছিলে যেতে বাধ্য করা, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, ছাত্রদের কক্ষে আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে বাধ্য করার ঘটনায় সাধারণ ছাত্ররা সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে জীবনযাপন করে।

৫১। ২১ মে '৯৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী কর্তৃক চাঁদার দাবীতে ব্যবসায়ীকে অপহরণ, পুলিশ ও প্রক্টরের মাধ্যমে উদ্ধার, ছাত্রলীগ কর্মীসহ গ্রেফতার ২। (*২২ মে '৯৯, ইনকিলাব/ সংবাদ*)

৫২। ১৪ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট চলাকালে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের মিছিলে মুজিববাদী ছাত্রলীগের বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও বোমা হামলা, ৩জন ছাত্রীসহ ১৩ জন গুলিবিদ্ধ। (*১৫ অক্টোবর '৯৯, ইনকিলাব*)

৫৩। ২২ সেপ্টেম্বর '৯৯ রাজধানীর আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রলীগ সেক্রেটারী মনির হোসেন বক্সীবাজারস্থ এক হোটেলে খেতে গেলে খাবার পরিবেশন দেরীর অজুহাতে (!) ব্যাপক ভাংচুর করে হোটেলটি গুড়িয়ে দিয়েছে। (*২৩ সেপ্টেম্বর '৯৯, ইনকিলাব*)

৫৪। ১১ ডিসেম্বর '৯৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ছাত্র পরিচালিত মেসে (কেন্টিন) "ফাও" খাওয়ার দাবিতে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা প্রভোষ্টকে তার কক্ষে ৪ ঘন্টা আটকিয়ে রাখে। (*১২ ডিসেম্বর '৯৯, বাংলার বাণী*)

৫৫। ৪ ডিসেম্বর ২০০০ রাজশাহী মেডিকেল কলেজে চাঁদা না পেয়ে ছাত্রলীগের তিন নেতা এক ইন্টারনী ডাক্তারকে মারধর করে দিগম্বর করে ফেলে। ছাত্রলীগের সাথে ডাক্তারদের সংঘর্ষ, লাগাতার ডাক্তার ধর্মঘট, রোগীদের দূর্ভোগ। (*৫ ডিসেম্বর ২০০০, প্রথম আলো*)

৫৬। ১২ এপ্রিল ২০০১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র দলের মিছিলে পুলিশ ও ছাত্রলীগের যৌথ হামলা। গুলি, বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে নারকীয় তান্ডব, ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে আতংক, তদন্ত কমিটি গঠন। (*১৩ এপ্রিল ২০০০, ইনকিলাব*)

৫৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আশেপাশে এলাকার ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ছিনতাইয়ের কাজে জড়িত। প্রায় প্রতিদিন এখানে সশস্ত্র ছিনতাই, রাহাজানির ঘটনা ঘটছে। পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ ঘটনাসমূহ দেখেও না দেখার ভান করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। (*২৬ এপ্রিল ২০০০, সম্পাদকীয়, দৈনিক জনতা*)

৫৮। দৈনিক বাংলার বাণীর এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়, সন্ত্রাস, ছিনতাই, ছাত্রী লাঞ্ছনা, অপহরণ করে মুক্তিপান আদায়সহ বহুবিধ অপকর্মে জড়িত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে বীর দর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নির্দেশ সত্ত্বেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে না বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেন।

৫৯। "চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের বিবদমান গ্রুপসমূহের মধ্যে কোটি টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে" -প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে নেতারা। জেলার

বিভিন্ন স্থানের দোকান-পাট, ঠিকাধারী, চাঁদাবাজি থেকে এই অর্থ আসে বলে জানা গেছে। (*১৯ জুলাই ২০০০, যুগান্তর*)

৬০। ৩ নভেম্বর '৯৮ মেহেরপুরের স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তরে হামলা ও নির্বাহী প্রকৌশলীসহ ৪ জনকে মারধরের অভিযোগে সদর থানা পুলিশ ছাত্রলীগ কর্মীদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ কর্মীরা শহরে ব্যাপক ভাংচুর করে। (*৫ নভেম্বর ৯৮, ইত্তেফাক*)

৬১। ১৮ অক্টোবর ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও আইন-শৃংখলা ভঙ্গসহ বিভিন্ন অভিযোগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগের ৩ জন নেতা -কর্মীকে বহিষ্কার করে। (*১৯ অক্টোবর '৯৮, জনকণ্ঠ*)

৬২। ১৩ অক্টোবর '৯৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি আবাসিক হলে প্রায় ২৫০ জন ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ক্যান্টিনে ২ মাসে ৩ লাখ টাকা ফাও খেয়েছে। ক্যান্টিনগুলো বন্ধ হওয়ার উপক্রম ও সাধারণ ছাত্রদের চরম ভোগান্তি। (*১৩ অক্টোবর '৯৮, বাংলারবাণী*)

৬৩। ২১ আগষ্ট '৯৮ চট্টগ্রামের মিমি সুপার মার্কেটে দু'টি সোনার দোকান ডাকাতির ঘটনার জড়িত থাকায় ছাত্রলীগের ৪ জন নেতা-কর্মী গ্রেফতার। (*২২ আগষ্ট '৯৮, সংবাদ*)

৬৪। ২১ আগষ্ট '৯৮ বরিশালে সহকর্মীকে খুন করতে গিয়ে হাসপাতালের ওটি থেকে সশস্ত্র ছাত্রলীগ ক্যাডার গ্রেফতার। (*২২ আগষ্ট '৯৮, সংগ্রাম*)

৬৫। ৩০ জুলাই , ২০০০ রাজধানীর তেজগাঁও কলেজ শাখা ছাত্রলীগ ১৫ আগষ্ট উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের নামে হাজার হাজার টাকা চাঁদা আদায় করে। (*৩১ জুলাই ২০০০, প্রথম আলো*)

৬৬। ৩১ জুলাই, ২০০০ চট্টগ্রামের রাউজানে অপহরণ করে আদায়কৃত মুক্তিপনের টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে আওয়ামী লীগ - ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ১ জন নিহত হয়। একই রাতে জেলার পটিয়া থানায় ছাত্রলীগের এক গ্রুপের হাতে দলের অন্য একজন খুন হয়। (*২ আগষ্ট ২০০০, সংগ্রাম*)

৬৭। ১০ আগষ্ট, ২০০০ চট্টগ্রামের বিআরটিসি বাসস্ট্যান্ডে চাঁদাবাজি ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যকার সংঘর্ষে পথচারী মহিলা নিহত ও ৫ জন আহত হয়। (*১১ আগষ্ট ২০০০, ইনকিলাব*)

৬৮। ১২ আগষ্ট, ২০০০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন দুটি হলের চাঁদাবাজির আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গভীর রাতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে ব্যাপক গুলি বিনিময়। ক্যাম্পাস উত্তপ্ত, পুলিশের নিষ্ফল তল্লাশি। (*১৪ আগষ্ট ২০০০, সংবাদ*)

৬৯। ১৭ অক্টোবর , ২০০০ রাজধানীর মিরপুর বাংলা কলেজের পার্শ্বস্থ ছাত্রলীগের এক নেতার বাসায় পানি না থাকায় কর্মীরা স্থানীয় ওয়াসা ভবনে হামলা করে

১০/১২টি গাড়ী ভাংচুর করে। কর্মচারীদের ধর্মঘট। মামলা হলেও আসামীর উল্লেখ নেই। (*১৮ অক্টোবর ২০০০, ইনকিলাব*)

৭০। ১৯ নভেম্বর, ২০০০ দাউদকান্দি উপজেলার গৌরীপুর কলেজ ছাত্র সংসদের ছাত্রলীগের ভিপি- জিএস এর নেতৃত্বে ব্যাংকে জমা দিতে আসা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা ডাকাতি। ২ ছাত্রলীগ কর্মী ও মাইক্রোবাস চালক আটক। (*২১ নভেম্বর ২০০০, দিনকাল*)

ইসলাম দলনে আওয়ামী লীগ

একাল ও সেকাল

আওয়ামী লীগ ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী গোষ্ঠীর টার্গেট সব সময় মুসলমানদের জীবন-দর্শন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। বাংলাদেশ থেকে ইসলামের মূল উচ্ছেদের জন্যে এই দুই গোষ্ঠী সব সময় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ১৯৭২-৭৫ সালে সেই আওয়ামী লীগ সরকার যেমন তাদের শাসনামলের শুরু থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের নীল-নক্শা বাস্তবায়ন করে তাদের ব্রাহ্মন্যবাদী প্রভূ রাষ্ট্রের বাসনা পূরণ করে কৃপা আদায়ের চেষ্টা করেছিল। ঠিক তেমনি ২১ বছর পর শেখ হাসিনা মাথায় হেজাব ও হাতে তজবি নিয়ে ক্ষমতায় এসে ইসলাম ও মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করার কাজ শুরু করে। শেখ হাসিনার সরকারের আমলেই দেশের সর্বজন শ্রদ্ধের আলেম -ওলামাদের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অর্ধ লক্ষাধিক আলেমদের জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে-দ্বীন বয়োবৃদ্ধঃ শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হককে কথিত পুলিশ হত্যাকারী হিসাবে গ্রেফতার করে বর্বরভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়।

মৌলবাদের ধুয়া তুলে সারাদেশে দাড়ি-টুপি ওয়ালা ধর্মভীরু মানুষদের ভৎর্সনার পাত্রে পরিণত করেছে এই আওয়ামী সরকার। ইসলামী প্রতিষ্ঠান গুলোতে তথাকথিত তালেবানী ট্রেনিং -এর অজুহাতে কয়েকশত মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং কয়েক হাজার মাদ্রাসার সরকারী অনুদান বন্ধ করে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গুলোকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার চক্রান্ত করা হয়। ইসলাম দলনের সর্বশেষ পন্থা হিসাবে নেয়া হয় হাইকোর্টের দুইজন বিচারক কর্তৃক ইসলামের মূলনীতি ফতোয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রায়ের মাধ্যমে। এরপর বিশেষ মহল থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার দাবিও তোলা হয় আওয়ামী সরকারের আমলে।

আওয়ামী সরকারের আমলেই জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে পুলিশ নগ্ন হামলা করে। রাজধানীর সেগুন বাগিচা জামে মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নির্বিচারে গুলি করে ৯ জন আলেম মাদ্রাসা হাফেজকে হত্যা করা হয়।

এ অধ্যায়ে আমরা আওয়ামী সরকারের সেকাল (১৯৭২-৭৫) ও একালের (১৯৯৬-২০০১) ইসলাম বিদ্বেষী তৎপরতার যৎসামান্য কিছু চিত্র তুলে ধরেছি। যার মাধ্যমে মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশে আ'লীগের ইসলাম বিরোধী চক্রান্তের নমুনা পাঠক-পাঠিকারা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আল্লাহ, রাসুল (দঃ) সম্পর্কে জঘন্য মন্তব্য, কোরআন অবমাননা, মসজিদে হামলা ও দখল

একাল (১৯৯৬ - ২০০১)

১। রাষ্ট্রীয় সহযোগীতায় আহুত ইমাম সম্মেলনে ২৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইমামদের সার্টিফিকেট বিতরণকালে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত ১৩টি আচরণবিধির ১টিতে '*আল্লাহু আকবর*' ধ্বনি দেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। *(৪ মে ১৯৯৯, সংগ্রাম)*

২। আওয়ামী সরকারের আমলে মূর্তির (স্বরস্বতী দেবী) পায়ের নীচে কোরআনের আয়াত ছাপানো হয়েছে। ইসলামী ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা হিন্দুদের 'বাণী অর্চনা' অনুষ্ঠানের দাওয়াত কার্ডে স্বরস্বতীর পায়ের নীচে কোরআনের আয়াত ছাপায়। *(১৬ জানুয়ারী ১৯৯৯, সংগ্রাম)*

৩। বাংলাদেশের স্রষ্ঠা কে? ক) আল্লাহ খ) রাসুল গ) ফেরেশতা ঘ) বঙ্গবন্ধু, ময়মনসিংহের মুকুল বিদ্যানিকেতন উচ্চবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা ১৯৯৬ এর নবম শ্রেণীর ইসলাম ধর্মের নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে উপরোক্ত প্রশ্নটি করা হয়। *(১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬, ইনকিলাব)*

৪। মুসলিম জাতির পিতা কে? ক) শেখ মুজিবর রহমান খ) ওমর (রাঃ) গ) ইব্রাহীম (আঃ) ঘ) নূহ (আঃ), এমনি একটি প্রশ্ন করা হয় ময়মনসিংহের আরেকটি স্কুলে। *(২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৬, ইনকিলাব)*

৫। মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাকের বই "বাংলা ভাষায় *মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি*" শিরোনামের পান্ডুলিপি থেকে মুসলিম শব্দ বাদ না দেয়ায় বাংলা একাডেমী তা প্রত্যাখ্যান করে। *(৫ অক্টোবর ১৯৯৭, সংগ্রাম/ইনকিলাব)*

৬। আওয়ামী সরকারের আমলে বিভিন্ন স্থানে কোরআন শরীফ নর্দমায় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২ জুন ১৯৯৯ মিরপুরে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০০, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ রাজশাহীতে উলেখযোগ্য। *(বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট)*

৭। আওয়ামী ছাত্রলীগের ক্যাডাররা পবিত্র কোরআনকে পোড়াতে মোটেও দ্বিধা করেনি। এর মধ্যে বরিশাল ও মানিকগঞ্জে উল্লেখযোগ্য। *(২৩ জুলাই ২০০০, সংগ্রাম)*

৮। ১৪ জুলাই ২০০০ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মহানগর সার্বজনীন পুজাকমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্যপরিষদের নেতারা অবিলম্বে সংবিধান থেকে '*বিস্‌মিল্লাহ*' বাতিল করার দাবি জানান। উল্লেখ্য, ঐক্যপরিষদের নেতারা যেমন মেজর (অবঃ) সি আর দত্ত, নিমচন্দ্র ভৌমিক, বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবী হিসেবেই পরিচিত। *(১৫ জুলাই ২০০০, ইনকিলাব)*

৯। ১০ জুন ২০০০ আ'লীগ সমর্থিত একদল মুসলিম নামধারী ভন্ড বায়তুল মোকাররম মসজিদের মেহরাবে একজন মুসল্লীকে মেরে রক্তাক্ত করে। *(১১ জুন ২০০০, সংবাদ/প্রথম আলো)*

১০। ২৫ জুলাই '৯৭ বায়তুল মোকাররম মসজিদে জুমার নামাজ শেষে ফেরার পথে আওয়ামী লীগ 'জয়বাংলা' স্লোগান দিয়ে হামলা চালানো হলে ২৫ জন মুসল্লি আহত হয়। *(২৬ জুলাই ১৯৯৭, ইনকিলাব/সংগ্রাম)*

১১। কুমিল্লা জেলা যুবলীগের সভাপতি শহীদুল ইসলাম শাহীন ৯ একর ওয়াক্‌ফকৃত জমি দখলের উদ্দেশ্যে বগিচাগাঁও এলাকায় প্রায় সোয়াশ বছরের একটি পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে দেয়। জনরোষ থেকে রক্ষার জন্য নামে মাত্র সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। এমনকি পুরাতন মসজিদ কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে জোরপূর্বক নতুন মসজিদ কমিটি গঠন করে সে এতে স্বঘোষিত সেক্রেটারী হন। *(৯ নভেম্বর ২০০০, মানব জমিন)*

১২। ১২ মার্চ ২০০১ গভীর রাতে ফেনীতে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ক্যাডাররা শহরের দাউদপুর ব্রীজের দক্ষিণপার্শ্বে আরামবাগ এলাকায় তিন বছর আগে প্রতিষ্ঠিত একটি পাঞ্জেগানা জামে মসজিদকে রাতারাতি গায়েব করে ফেলে। মসজিদটি খাস জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জমিটি দখল করার জন্য আওয়ামী ক্যাডাররা সম্পূর্ণ মসজিদটিই রাতের আঁধারে গায়েব করে ফেলে। *(১৫ মার্চ ২০০১, মানব জমিন/ যুগান্ত র)*

১৩। ৬ এপ্রিল ২০০১ শুক্রবার জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেইট থেকে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করার চেষ্টা করলে পুলিশ মিছিলের ব্যানার কেড়ে নেয় এবং টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এর পর বায়তুল মোকাররম মসজিদে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, গুলি এবং বুট-জুতা পায়ে শত শত পুলিশ মসজিদে প্রবেশ করে জাতীয় মসজিদের পবিত্রতা ভুলণ্ঠিত করে। গোয়েন্দা পুলিশ লাঠি হকিস্টিক, রড দিয়ে জামায়াত শিবির কর্মী ও নিরীহ মুসল্লীদেরকে মারধর করে রক্তাক্ত করে এবং কয়েকশত নিরীহ মুসল্লিকে গ্রেফতার করে। এমনকি ডিবি পুলিশের একটি গ্রুপ খতিব ওবায়দুল হকের রুমের দরজা লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলে। *(৭ এপ্রিল ২০০১, ইনকিলাব/সংগ্রাম/মানবজমিন/যুগান্তর)*

১৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য নির্মিতব্য একটি আবাসিক হলের ডিজাইন থেকে মসজিদ বাদ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫'শ মুসলিম ছাত্রের জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে অমর একুশে নামে এই হলটি নির্মান করা হয়েছে। কার্জন হল সংলগ্ন পুরাতন জাদুঘরের পাশে নির্মিতব্য এই হলে মূল ডিজাইনার প্রকৌশলী নিশ্চিত করে বলেন, নতুন হলটির ডিজাইনে কোন মসজিদ নেই। *(৬ নভেম্বর ১৯৯৯, ইনকিলাব)*

১৫। ৬ জুন ২০০০ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী ঘরানার সংগঠন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্যপরিষদের নেতারা মুসলমানদের নামের আগে 'মোহাম্মদ' ও 'আলহাজ্ব' বাদ দেয়ার দাবি জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে আওয়ামী নেতা সি আর দত্ত, সুধাংশ শেখর হালদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। *(৭ জুন ২০০০ যুগান্তর/ইনকিলাব)*

১৬। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ আলী আজগর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সন্ত্রাসী (নাউযুবিল্লাহ) হিসেবে আখ্যায়িত করে। জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ এস কে সাদেক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকলেও কোন প্রতিবাদ করেননি। *(সংবাদ ভাষ্য)*

১৭। এ সরকার ক্ষমতায় এসেই জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি করে। এমনকি শুক্রবার জুমার নামাজে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে মুসল্লিদের প্রবেশ করানো হয়। (*সংবাদপত্রের রিপোর্ট*)

সেকাল (১৯৭২ - '৭৫)

১। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নাম ধারণ করে। কিন্তু ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক সম্মেলনে অদৃশ্য কারণে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। *(আওয়ামী লীগের ইতিহাস, আবু আল সাঈদ)*

২। ১৯৭০ সালে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কোরআন সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাশ করা হবে না এই অঙ্গীকার করে নির্বাচনে বিজয়ী হন। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর যে সংবিধান গ্রহণ করা হয় তাতে ইসলাম সম্পর্কে একটি শব্দও লেখা হয়নি। এমনকি, সংবিধানের শুরুতে *বিসমিল্লাহ* পর্যন্ত লেখা হয়নি। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের অনুকরণে কুফরী মতবাদ 'সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

৩। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ঢাকা বোর্ডের মনোগ্রাম থেকে যথাক্রমে *'রাব্বি জিদনী ইলমান'* ও *'ইকরা বিছমে রাব্বিকাল্লাজী খালাক'* বাদ দেওয়া হয়। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে *'মুসলিম'*, ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে 'মুসলিম' এবং জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মুসলিম' বাদ দেয়া হয়। ঢাকার ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম পরিবর্তন করে নজরুল ইসলাম কলেজ এবং পরবর্তীতে 'ইসলাম' বাদ দিয়ে শুধু নজরুল কলেজ করা হয়। চরম মুসলিম বিদ্বেষী সূর্য সেনের নামে 'সূর্য সেন' হল করা হয়।

আলেম-ওলামা নির্যাতন, মাদ্রাসা বন্ধকরণ, ফতোয়া নিষিদ্ধকরণ ও ইসলামী কর্মকান্ডে বাধাদান

একাল (১৯৯৬ - ২০০১)

১। আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই প্রায় ৩০০টি মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করে দেয়। উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে ইসলামিক হিস্ট্রি, ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় নতুন করে অনুমোদন প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে। এসব বিষয়ে নতুন করে কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। ৬ জুলাই ১৯৯৯ দেশে ৩০০টি মাদ্রাসার অনুদান

বন্ধের প্রতিবাদে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে জাতীয় সংসদে তুমুল বাক-বিতন্ডা হয়। (*২৭ আগষ্ট, ১৯৯৯, ইনকিলাব, ৭ জুলাই ১৯৯৯, দিনকাল*)।

২। আওয়ামী সরকার প্রতিটি হত্যাকান্ডে যেমন যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে হত্যাকাণ্ড (৬ মার্চ, ১৯৯৯), কবি শামসুর রাহমানকে কথিত হত্যা প্রচেষ্টা (২ জানুয়ারী ১৯৯৯), কাজী আরেফ হত্যাকাণ্ড (৬ ফেব্রুয়ারী '৯৯), সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যাকাণ্ড, (১৬ জুলাই ২০০০), সিপিবি'র মহাসমাবেশে বোমা বিষ্ফোরণে হত্যাকাণ্ড (২০ জানুয়ারী ২০০১), কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীকে কথিত হত্যা প্রচেষ্টা (২০ জুলাই ২০০০), ১লা বৈশাখে রমনার বটমূলে বোমা বিষ্ফোরণে হত্যাকান্ড (১৪ এপ্রিল ২০০১) আলেম ওলামাদের জড়িয়ে শতশত আলেম ওলামা ও ইসলাম পন্থীদের গ্রেফতার করেছে। এ পর্যন্ত সরকার ৩০ হাজার আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা মামলা দায়ের করেছে। অথচ এসব ঘটনার কোনটিতেই আলেম ওলামা বা ইসলামপন্থীরা জড়িত প্রমাণিত হয়নি। (*২৫ মার্চ ২০০১, দিনকাল*)

৩। সরকার ইসলাম বিরোধী এনজিওদের কৃপা লাভের আশায় ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ হাই কোর্টের দু'জন বিচারপতির (বিচারপতি গোলাম রব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা) সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের রায়ে ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ *ফতোয়া* নিষিদ্ধ ঘোষণার রায় প্রদান করে। (*১ জানুয়ারী ২০০১, সংগ্রাম/প্রথম আলো*)

৪। ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১ মোহাম্মদপুরের একটি মসজিদে কথিত পুলিশ হত্যার অভিযোগে প্রখ্যাত আলেম ইসলামী ঐক্য জোটের শীর্ষ নেতা শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতি আমিনীকে গ্রেফতার করা হয়। (*৫ ফেব্রুয়ারী ২০০১, ইনকিলাব/যুগান্তর*)

৫। ৩ ফেব্রুয়ারী ২০০১ হরতাল চলাকালে পুলিশ আলেম-ওলামা, দাঁড়ি-টুপিধারীদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন চালায়। ৪ ফেব্রুয়ারী ডেইলী স্টারে প্রকাশিত একটি চিত্রে দেখা যায়, পুলিশ একজন আলেমকে উলঙ্গ করে পিচঢালা রাস্তায় টেনে হেচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ বায়তুল মোকাররম মসজিদের *"আল্লাহু আকবার"* লেখা লোগাতে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে। আরেক দল পুলিশ বুট জুতা পায়ে বীরদর্পে মসজিদ থেকে বের হচ্ছে। (*মানবজমিন, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১*)।

৬। ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১ পুলিশ / বিডিআর যৌথ অ্যাকশানে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ১০ জন নিরাপরাধ মাদ্রাসা ছাত্র ও হাফিজে- কোরআনকে গুলি করে হত্যা করে। (*৭ ফেব্রুয়ারী ২০০১, যুগান্তর/ইনকিলাব*)

৭। ১১ সেপ্টেম্বর '৯৯ চট্টগ্রামের ইস্পাহানি স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষা ও আওয়ামী ঘরানার সংগঠন 'মহিলা পরিষদ' নেত্রী হাসিনা বেগম ঐ কলেজের ছাত্রী মিস আতিয়া ইসলামকে (চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ আতহার আলীর কন্যা) হিজাব পরার কারনে কলেজ থেকে বহিস্কার করেন। (*১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, ইনকিলাব/সংগ্রাম*)

৮। ২০ সেপ্টেম্বর '৯৯ হলে হলে ছাত্র-ছাত্রীদের কুরআন-শিক্ষা দেয়া ও নিজে কুরআন পড়ার কারনে আওয়ামী ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের বিভিন্ন ছাত্র ও ছাত্রী হল থেকে নামাজী ছাত্র-ছাত্রীদের বের করে দেয়। এমনকি শেফালী দাস, সোমাদত্ত, গীতা অধিকারী, জয়ন্তী রানী প্রমুখ অমুসলিম ছাত্রী পবিত্র কোরআন শরীফ ছিড়ে বাইরে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ হামলাকারী ছাত্রীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে বরং ৪ জন ইসলামপন্থী ছাত্রীকে হল থেকে বহিস্কার করে। *(২৪, ২৫, ২৬, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, সংগ্রাম/প্রথম আলো / ইনকিলাব)*

৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগে মেধাবী মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে আওয়ামী সরকার। বাংলা, আইন, সমাজবিজ্ঞান, ইংরেজীসহ বিভিন্ন বিষয়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। *(৩০ মে ১৯৯৯, ইনকিলাব/সংগ্রাম)*

১০। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হঠাৎ করে কোন কারণ ছাড়াই পবিত্র কোরআন তেলওয়াত ও তাফসীর বন্ধ করে দেয়া হয়। *(৯ অক্টোবর ১৯৯৬, ইনকিলাব)*

১১। ৩১ অক্টোবর '৯৬ বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতিবের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে এক সমাবেশে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের সহযোগী ইনুপন্থী জাসদ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাইয়ুম তার বিরুদ্ধে সিএমএম আদালতে একটি নালিসী মামলা দয়ের করে। *(১ নভেম্বর ১৯৯৬, সংগ্রাম)*

১২। ২৮ জানুয়ারী ২০০১ শেখ মুজিবের নামে কুটক্তি করার মিথ্যা অজুহাতে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ফরিদপুর সদর থানার বায়তুল মোকাদ্দেস জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা নুরুল ইসলামকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে। এর পর তারা ইমামকে পুলিশে সোপর্দ করে। *(২৯ জানুয়ারী ২০০১, ইনকিলাব)*

১৩। আ'লীগ সরকার জনগণের নিরাপত্তাদানে ব্যর্থ হলেও পেটোয়া বাহিনী দিয়ে তাফসীর মাহফিল, সীরাত মাহফিল, ওয়াজ মাহফিলে ১৪৪ ধারা জারি করতে বড়ই পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছে। এর মধ্যে প্রখ্যাত আলেম মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীর ১১ নভেম্বর ২০০০ চট্টগ্রাম ও ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০১ ফরিদপুরের তাফসীর মাহফিল নিষিদ্ধ উলেখযোগ্য *(১২ নভেম্বর ২০০০, যুগান্তর ও ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১, মানবজমিন)*

১৪। ধর্ম ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে ১৯৯৮ সাল থেকে ১৯৯৯ সালে সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্ব যাত্রীদের সংখ্যা ১ হাজার ৪১ জন কম হয়। মক্কা শরীফে বাড়ী ভাড়ার নামে হাজীদের টাকা আত্মসাৎ, হেরেম শরীফের বহু দূরে দুর্গম পাহাড়ের ওপর কষ্টকর যাতায়াত, মোটা অংকের ফি দেয়ার পরও হজ্ব অনুষ্ঠানে মোয়াল্লেমদের গাফিলতিসহ নানা অনিয়মের ফলে সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্বযাত্রী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। *(২০ ফেব্রুয়ারী ২০০০, দিনকাল)*

১৫। পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণে (সেখানে মাইকে আযান দেয়া নিষিদ্ধ) রমযানের সময়ই নীলফামারীতে মাইক ব্যবহার করে রোযাদারদের ডাকানো নিষিদ্ধ করা হয়। নীলফামারী জেলা প্রশাসন এই নিষেধাজ্ঞা জারী করে। *(২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯, সংগ্রাম)*

১৬। ১৩ অক্টোবর '৯৯ চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান আওয়ামী নেতা নসু চৌধুরীর মদদপুষ্ট একদল সন্ত্রাসী ঐতিহ্যবাহী আবেদিয়া মুজাদ্দেদিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার জায়গায় অবৈধভাবে ক্লাব নির্মান করার চেষ্টা করলে মাদ্রাসার ছাত্ররা তা বাঁধা দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসীরা মাদ্রাসা ও এতিম খানায় বর্বরোচিত হামলা চালায়। হামলায় প্রায় ২০ জন ছাত্র আহত হয়। *(১৯ অক্টোবর ১৯৯৯, দিনকাল)*

১৭। ২৩ মার্চ ২০০০ নারী প্রগতি সংঘ নামের আওয়ামী ঘরানার একটি এনজিও মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে ব্যয় কর্তন করে সাধারণ শিক্ষাখাতে বরাদ্দের দাবী জানান। সংস্থাটি ঐ দাবী অর্থমন্ত্রীর শাহ এ এম এস কিবরিয়ার কাছে উথাপন করে। *(২৪ মার্চ ২০০০, ইত্তেফাক)*

১৮। চট্রগ্রামে ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ আয়োজিত ঐতিহাসিক তাফসীর মাহফিল বন্ধের ষড়যন্ত্র করে সরকার। এর জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। ১০ নভেম্বর শুক্রবার মুসল্লিরা এর প্রতিবাদে বিভিন্ন মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠি চার্জ করে। এক পর্যায়ে পুলিশ বুট-জুতা পরে চট্রগ্রামের প্রধান মসজিদ আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদে প্রবেশ করে বহু নিরীহ মুসল্লিকে গ্রেফতার করে। *(১১ নভেম্বর ২০০০, যুগান্তর/ ইত্তেফাক)*

১৯। ২৭ মার্চ ২০০১ প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাক্তার এস এ মালেক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রমনা কালিমন্দির ও আনন্দময়ী আশ্রম নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের আওয়ামী নেতা শ্রী শুধাংশু শেখর হালদার হুংকার দিয়ে বলেন, ফতোয়াবাজদের (ইসলামপন্থীদের) আমরা সাগরে চুবিয়ে মারবই। তাদের নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে কালীমাতা জাগবে না। *(২৮ মার্চ ২০০১, যুগান্তর/ ইনকিলাব)*

২০। ৫ এপ্রিল ২০০১ রাত প্রায় সোয়া ১২ টার দিকে গোয়েন্দা পুলিশ বিনা কারনে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। পরের দিন বিশেষ ক্ষমতা আইনে একমাসের আটকাদেশ দিয়ে জেলহাজতে প্রেরণ করে এবং জেলখানায় ডিভিশন না দিয়ে সাধারণ কয়েদীদের সাথে থাকতে দেওয়া হয়। *(৬, ৭ এপ্রিল ২০০১, প্রথম আলো/ ইনকিলাব/ সংগ্রাম)*

২১। আওয়ামী সরকার অন্যায়ভাবে দেশবরেণ্য ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম-এ দ্বীন মাওলানা ওবায়দুল হককে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব পদ থেকে অব্যহতি দেয় ২২ এপ্রিল ২০০১। তার অব্যহতি পত্রে বলা হয় বয়স ৭৩

বছর তাই তাকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। অথচ পূর্বের সকল খতিবই আমৃত্যু স্বপদে বহাল ছিলেন। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগকৃত খতিবকে কাদিয়ানী সমর্থক মাওলানা (?) আব্দুল আউয়াল এর স্বাক্ষরে অব্যহতি দেওয়া হয়। পরে জনতার দাবিতে এবং আদালতের রায়ে সরকার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং তিনি স্বপদে ফিরে আসেন। *(২৩ এপ্রিল ২০০১, সংগ্রাম/ যুগান্তর)*

২২। ১৮ জানুয়ারী ২০০১ আওয়ামী লীগ জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন আইন ২০০১ সংসদে সতেরো মিনিটে পাশ করেন। এই আইনের মাধ্যমে শেখ মুজিবের ছবিকে শ্রদ্ধা করা বাধ্যতামূলক করা যায়। অথচ কাউকে শ্রদ্ধার উদ্দেশ্যে ছবি টাঙ্গানো ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। *(১৯ জানুয়ারী ২০০১, যুগান্তর/ইনকিলাব)*

২৩। ২২ জুলাই ২০০০ ঢাকার ইস্টার্ণ প্লাজা মসজিদের খতিব ও ঢাকা জেলা ইমাম সমিতির সেক্রেটারী হাফেজ মাসুদুর রহমানকে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা শিবির কর্মী সন্দেহে মারপিট করে হাত-পা ভেঙ্গে দেয়। *(২৩ জুলাই ২০০০, সংগ্রাম)*

২৪। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শ্রীপুরের মান্দারিয়া ছালেহীয়া দারুছ্ছুন্নাহ এতিম খানাটি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। স্থানীয় লোকদের মতে, এলাকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী কামালের নেতৃত্বে একদল যুবক এতিম খানাটিতে অগ্নিসংযোগ করলে ৩টি ঘর, মাদ্রাসার গুদামে ৫০ মন চালসহ প্রায় দশ লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। *(১৪ মে ২০০১, আজকের কাগজ)*

২৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে জাতীয় কবি কাজী নজরুলের মাজার। কবির বিখ্যাত উক্তি 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই'। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। কবরের ফলকে উৎকীর্ণ ছিল সেই বিখ্যাত উক্তি "মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই। যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে ভাই"। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৯ সালের ২৫ মে উক্ত ফলক ভেঙ্গে নতুন একটি ফলক নির্মাণ করে যাতে কবির ঐ কবিতাটির স্থান পায়নি। *(২৩ মে ২০০১, সংগ্রাম)*

২৬। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতির দেশ। শত শত বছর যাবত এদেশে হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা প্রতিবেশী হিসাবে সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছে। আওয়ামী লীগ কল্পিত মৌলবাদের দানব আবিস্কার করে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে। মৌলবাদ কথাটা খৃষ্ট ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট, ইসলামে এর কোন স্থান নেই। মৌলবাদের কল্পিত দানব বধ করার জন্য বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ঘাটি গড়ে উঠেছে মর্মে অব্যাহত মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা প্রভূদের খুশী করার জন্য মৌলবাদ আতংক ছড়িয়ে দিয়ে শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের উদার ভাবমুর্তিকেই বিনষ্ট করেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরের সময় নানা মিথ্যা তথ্য সম্বলিত মৌলবাদের

উদ্বেগজনক বিস্তার লাভের অলিক কাহিনী সম্বলিত পুস্তিকা বিতরণ করা হয়।
(১৭ জুলাই ২০০১, মানবজমিন)

সেকাল (১৯৭২ - '৭৫)

১। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেই ইসলামের নামে দল বা সংগঠন করা সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ করে। হাজার হাজার আলেম ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদদের কারাগারে নিক্ষেপ করে।

২। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা দাবী করায় ১৯৬৯ সালে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবীতুখোড় ছাত্রনেতা আব্দুল মালেককে আওয়ামী ছাত্রলীগের গুন্ডারা ১২ আগষ্ট ছুরিকাহত করলে তিনি ১৫ আগষ্ট শাহাদাত বরণ করেন।

নাস্তিক মুরতাদদের সমর্থনদান ও পুরস্কৃতকরণ

একাল (১৯৯৬ - ২০০১)

১। ওআইসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রায় সকল মুসলিম দেশে ভন্ড নবীর অনুসারী কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হলেও ওআইসি'র সদস্য হয়ে বাংলাদেশ এই ধরনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। উপরন্তু কাদিয়ানীদের বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে। এর মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি মাওলানা (?) আব্দুল আউয়াল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের মীর মোবাশ্বের আলী (কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ঢাকা মহানগরী নেতা) প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

২। আল্লাহ, রাসুল (দঃ), নামাজ, বেহেস্তসহ বিভিন্ন ইসলামী বিধিবিধানকে কটাক্ষকারিনী, জরায়ুর স্বাধীনতার দাবিদার, বাংলাদেশের সীমানা মুছে ফেলার প্রত্যাশী মুরতাদ তসলিমা নাসরীনকে সমর্থন সহযোগিতা যুগিয়েছে আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবীগণ। এমনকি ধর্মদ্রোহী তসলিমার বিরুদ্ধে তৌহিদী জনতা কর্তৃক আহুত ৩০জুন ১৯৯৪ সালের হরতালকে প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছিল আওয়ামী মন্ত্রী ও প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক। চরম ইসলাম বিদ্বেষী লেখিকা তসলিমা নাসরীন আওয়ামী সরকার ও তাদের বুদ্ধিজীবী সাঙ্গপাঙ্গদের সহযোগিতায় ৮ আগস্ট বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পরে অবশ্য জনতার প্রবল আপত্তির মুখে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। *(৯ আগষ্ট ১৯৯৬, ইনকিলাব)*

৩। *'মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি বেশ্যার খদ্দের আহ্বানের সমতুল্য'* কবিতাংশের কবি শামসুর রাহমান আওয়ামীলীগের কাছে অঘোষিত জাতীয় কবি। *'দীর্ঘক্ষণ আযান অসহ্য'* আখ্যায়িতকারী কবির চৌধুরীকে আওয়ামী সরকার জাতীয় অধ্যাপক করে পুরস্কৃত করেছে। অথচ জাতীয় অধ্যাপক ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ-এর মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে কোন প্রকার শোকবাণীও প্রদান করা হয়নি।

সেকাল (১৯৭২ - '৭৫)

১। ১৯৭৪ সালে জনৈক দাউদ হায়দার তার কবিতায় রাসুল (দ:) -এর প্রতি জঘন্য কটাক্ষ করে। তৎকালীন আওয়ামী প্রধান শেখ মুজিব তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে তাকে জামাই আদরে ভারতে পাঠিয়ে দেয়।

২। ইসলামী রেঁনেসার কবি ফররুখ আহমদকে চাকরীচ্যুত করা হয় রেডিও বাংলাদেশ থেকে। অনাহারে বিনা চিকিৎসায় কবির মেয়ে মৃত্যু বরণ করে। কবি নিজেও ধুকে ধুকে রোগে শোকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বরণ করেন ১৯৭৪ সালে।

মূর্তি স্থাপন ও অগ্নিপুজাকে উৎসাহিতকরণ

একাল (১৯৯৬ - ২০০১)

১। এককালে ঢাকাকে বলা হত 'মসজিদের নগরী'। আওয়ামী সরকার এখানে অসংখ্য মূর্তি স্থাপন করে 'মসজিদের নগরী' কে আজ 'মূর্তির নগরী" তে রূপান্তরিত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপন করেছে জোড় মূর্তি, গুচ্ছ মূর্তি, রাজুর ভাস্কর্য, বিবেকানন্দ মূর্তি, মধুর মূর্তি, রবীন্দ্রনাথের মূর্তি প্রভৃতি। তারা ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করতে চায়। অথচ আমাদের মহানবী (দ:) ৩৬০টি মূর্তী ভেঙ্গে ফেলছিলেন। *(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাগাজিন ২০০১)*

২। অগ্নিপূজাকে উৎসাহিত করার জন্য আওয়ামী সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'শিখা চিরন্তন' স্থাপন করে ১৯৯৭ সালে। শিখাটিকে সারাদেশ ঘুরিয়ে ঐ জায়গায় স্থাপন করা হয়।

বিজাতীয়, অশ্লীল ও বেহায়া অনুষ্ঠানের প্রচার, প্রসার ও পৃষ্ঠপোষকতা দান

একাল (১৯৯৬ - ২০০১)

১। এই সরকার 'ভেলেন্টাইনস ডের' মতো ইসলাম বিরোধী বেহায়া অনুষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং আ'লীগ সরকারের সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবাইদুল কাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এক অনুষ্ঠানে বলেন, "মনিকা-ক্লিনটন প্রেম অমর হোক"। *(১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, ভোরের কাগজ/ইনকিলাব)*

২। শেখ হাসিনা একটি মুসলিম প্রধান দেশের মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও পর-পুরুষের সাথে করমর্দন করে বেড়িয়েছেন অহরহ। যাদের সাথে করমর্দন করেছেন তাদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো, জাপানের প্রধানমন্ত্রী হাশিমোতো, ইটালির প্রধানমন্ত্রী জুলিয়ানো আমাতো প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। *(৮ ফেব্রুয়ারী ২০০০, ৩ জুলাই '৯৭, ৫ ডিসেম্বর ২০০০, যুগান্তর/ ইনকিলাব/ ইত্তেফাক)*

৩। ১২ ফেব্রুয়ারী '৯৭ খাগড়াছড়ি আওয়ামী লীগের জেলা অফিসের ভিতরে মহাসমারহে স্বরস্বতী পুজার আয়োজন করা হয়। অফিসকক্ষে প্রতিমা স্থাপন করে ঢোল বাজিয়ে দিনব্যাপী গানবাজনা চলে। *(১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, দিনকাল)*

৪। ২৮ জানুয়ারী ১৯৯৯ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার দিলীপ কুমার সিনহা এক অনুষ্ঠানে হিন্দুদের মতো শেখ হাসিনাকে সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠানটির পাঠ শুরু হয় 'ওঁম শান্তি' 'ওঁম শান্তি' উচ্চারণের মাধ্যমে। *(২৮ জানুয়ারী ১৯৯৯ বাংলাদেশ টেলিভিশন অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে)*

৫। ২০ নভেম্বর ১৯৯৯-৮৮ বছর বয়সে সুফিয়া কামাল ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর ৩ দিন পর ২৪ নভেম্বর দাফন করা হয়। ২৩ নভেম্বর দিবাগত রাত ছিল পবিত্র শবেবরাত এবং ২৪ নভেম্বর সরকারী ছুটি। কিন্তু ২৪ নভেম্বরকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করে সরকার শবে বরাতের পবিত্রতাকে ক্ষুন্ন করে। *(২২ নভেম্বর ১৯৯৯, প্রথম আলো/ ইনকিলাব)*

৬। জাতীয় প্রচার মাধ্যম তথা রেডিও, টেলিভিশনে ইসলামী তাহজীব-তমুদ্দনের বিরুদ্ধে বিষোদাগার করা হয় প্রতিনিয়ত। ইসলামী লেবাসধারীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে সবচেয়ে শয়তান, ধূর্ত, বাটপার হিসেবে। এছাড়া বিভিন্ন নাটক, সিনেমা, প্রতিবেদনে অশ্লীলতা তথা পরকীয়া প্রেম, বিবাহপূর্বক যৌনতা, ভেলেন্টাইনস ডে-তে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। অপর দিকে ইসলামী অনুষ্ঠানের সময় কমিয়ে আনা হয়। সিনেমা শিল্পকে 'নীল ছবির'পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সিনেমায় অশ্লীল নাচ, গান, ডায়ালগ, সেক্স ভায়ালেন্সে ভরপুর হয়ে গেছে। জাতীয় সেন্সর বোর্ড এসব সিনেমার অনুমোদন দিচ্ছে অবলীলায়। আর এই জন্য সেন্সর বোর্ডে বসানো হয়েছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে। অপরদিকে ডিশ এন্টেনার 'বিষাক্ত' প্রভাবে দিকভ্রান্ত বর্তমান তরুণ সমাজ।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চালুকরণঃ

একাল (১৯৯৬ - ২০০১)

১। এই সরকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে রাখার জন্য পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলামী শব্দ যেমন আল্লাহ, রাসুল (সাঃ) তুলে ফেলে। এমনকি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী যা অতীতে নবম ও দশম শ্রেনীর সিলেবাসে ছিল তা বাদ দেয়া হয়েছে। আর তার জন্যই জাতীয় টেক্সট্‌বুক বোর্ডে বসানো হয়েছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে।

২। ইসলামীয়াতে ১০০ নম্বরের পরিবর্তে ৫০ নম্বর করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। পরে জনতার প্রবল আন্দোলনে তা সরকার বাতিল করতে বাধ্য হয়। *(২৪ আগষ্ট ১৯৯৬, ইনকিলাব)*

৩। বর্তমান সরকার চালুকৃত ইসলাম বিরোধী শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য দিক হল ঃ

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হবে সম্পূর্ণ ধর্মের প্রভাব মুক্ত। (অধ্যায় ৪,৬)
- মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে কোন ধর্ম শিক্ষা থাকবে না।
- নবম ও দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবেও ধর্ম শিক্ষা নেওয়া যাবে না। (অধ্যায় ৮,১১)

সৌজন্যে : যায়যায়দি

খবর : নিজেরাই বোমা হামলা চালিয়ে ইসলামপন্থীদের ঘাড়ে চাপিয়ে তাদের উপর টীমরোলার চালায় আওয়ামী লীগ। সৌজন্যে : দৈনিক সংগ্রাম

আওয়ামী দুঃশাসন (১৯৯৬-২০০১)

বাংলাদেশের মত স্বল্প আয়তনের একটি দেশ মাত্র আট মাস বাইশ দিনের স্বল্প সময়ের মধ্যে ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর সঙ্গত কারণেই কেউ আর প্রত্যাশা করেনি এদেশে নতুন করে রক্তপাত ঘটুক। অন্যায় রক্তপাতের অবসান - যে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলনীতির অন্যতম স্তম্ভ ছিল - সেই স্বাধীনতা লাভের পর পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তারই পুনরাবৃত্তি করেছিল। জাতি যার উপর আরোপ করেছিল সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব। কিন্তু মানুষের সকল আশা-আকাঙ্খাকে ভুলে গিয়ে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তখনকার আওয়ামী সরকার চরম নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার মধ্য দিয়ে দেশে এক বিভিষীকাময় অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

১২ জুন (১৯৯৬) নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে। রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে ভোটারদের কাছে এবার আ'লীগ করজোরে ক্ষমা ভিক্ষা করে অতীতের ভুলের জন্যে। তাদের অতীত ভুলগুলো কি তা উল্লেখ না করলেও চল্লিশোর্ধ্ব ভোটারেরা সে সব জানেন। রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের চিত্র এখনো অনেকের শরীরে আছে। অনেকের স্মৃতি থেকে এখনো মুছে যায়নি সেই দুর্বিসহ দিনগুলো। আ'লীগের সেই দুঃশাসনের বিভীষিকা ম্লান হতে ২১ বছর লেগেছে।

আবেগপ্রবণ এ ভূ-খন্ডের মানুষ আবার সুযোগ দেয় আওয়ামী লীগকে তাদের কৃতকর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ শাসনের। কিন্তু আবেগ আপ্লুত ভোটার আবার প্রত্যক্ষ করল '৭৫ এর পূর্ব শাসনামলের অনুরূপ চিত্র। তবে তা যেন একটু ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন আকারের ও ভিন্ন মতের মধ্য দিয়ে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করার উদ্যোগের পরিবর্তে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নেতৃত্বে বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি-মিছিল করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অহরহ দেশের সর্বোচ্চ আদালত সম্পর্কে নানা রকম কটুক্তি করা হয়েছে - যার কারণে হাইকোর্টে প্রধানমন্ত্রীকে আরো সতর্ক আচরনের পরামর্শও দিয়েছেন। বেতার টিভির স্বায়ত্বশাসনের ওয়াদা তারা বেমালুম ভুলে গেছেন, বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল তো দূরের কথা বরং নতুন এক কালো আইন করে রাখা হয়েছে।

দূর্নীতির ক্ষেত্রে আ'লীগ অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। বিমান বাহিনীর জন্যে মিগ-২৯ কেনার নামে দু'শত কোটি টাকা লুটপাঠ, রেলওয়ের জন্যে ইঞ্জিন ক্রয়ের নামে ভারতের পরিত্যক্ত ইঞ্জিন ক্রয়, নৌবাহিনীর জন্যে বিএনএস বঙ্গবন্ধু নামে আধুনিক যুদ্ধ জাহাজ ক্রয়ের নামে শত শত কোটি টাকার লুটপাট করা হয়েছে। রাজধানীসহ বিভাগীয় সদরে সরকারী প্লট বরাদ্দ শুধু সরকার দলীয় মন্ত্রী, এমপি ও ক্যাডারদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারার নজীর আ'লীগ সরকারের ইতিহাসে দেখা যায়।

ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার শেষ সময়ে শত শত কোটি টাকার দলীয় প্রকল্পের টাকা তুলে রাখা হয়েছে। ক্ষমতায় এসে গলা ফাটিয়ে আ'লীগ সরকার যখন বলতে শুরু করেছিল তলাবিহীন ঝুড়ি নিয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছে এবং ৫ বছরের শাসনামলে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে -ঠিক তখনি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশকে বিশ্বের দূনীতিগ্রস্থ দেশ সমূহের শীর্ষে বলে রিপোর্ট দিয়েছে।

ক্ষমতায় আসার পর এই আ'লীগ সরকার নিজেদের এ সকল অপকীর্তি থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা ও জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে শেখ হাসিনার উপর বোমা হামলার নানা রকম নাটক মঞ্চস্থ করেছে। এসব সাজানো নাটক গুলোর প্রত্যেকটিতে কোন রকম তদন্ত ছাড়াই সরকার প্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা বিরোধীদলকে দায়ী করলেও প্রায় প্রত্যেকটি হত্যা প্রচেষ্টা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আর এই অজুহাতে আ'লীগ শেখ হাসিনার নিরাপত্তার নামে শেখ মুজিব পরিবার সদস্যদের নিরাপত্তা আইন প্রনয়ণ করেছে।

এই সরকারের আমলেই দেশের বিভিন্ন স্থানে উত্থান ঘটেছে গড ফাদার নামক ভয়াল দানবের। ফেনী, লক্ষ্মীপুর, ঢাকা, নরসিংদী, খুলনা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ সহ বিভিন্ন স্থানে আ'লীগের সশস্ত্র মাস্তানদের অরাজকতা রক্ষীবাহিনী ও লালবাহিনীকে ছাড়িয়ে গেছে। চুক্তির নামে আ'লীগ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার আয়োজন সম্পন্ন করেছে, ৩০ বছর পানি-চুক্তির পর কোন পানি বাংলাদেশে পাচ্ছেনা, সাপটা চুক্তির নামে বাংলাদেশকে ভারতের বাজারে পরিণত করা হয়েছে।

যাই হউক, শেখ হাসিনার সরকার গত ৫ বছরে যে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও দলীয়করণ করেছে তা তুলে ধরতে চাইলে সিরিজ আকারে গ্রন্থ প্রকাশ করতে হবে। যা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। আমরা এখানে আওয়ামী দুঃশাসনের কিছু খন্ড চিত্র তুলে ধরেছি - যা বিশাল সমুদ্রে ঢিল মারার সমতুল্য।

নির্বাচনী ওয়াদা ভঙ্গে আওয়ামী লীগ

- **স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার:** আওয়ামী লীগ '৯৬ এর নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছিল তারা ক্ষমতায় এলে 'রাষ্ট্রীয় জীবনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে' (নির্বাচনী ইশতেহারের ধারা ১/ক) এবং 'রাষ্ট্র পরিচালনায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে' (ধারা ১/খ)। আওয়ামীলীগের ৫ বছরের শাসনামলে আইনের শাসন পরিণত হলো '**হাসিনার শাসনে**'। বিরোধী দলকে দমন করার জন্য প্রনয়ন করা হলো তথাকথিত 'জননিরাপত্তা আইন'। ঐ আইনে ঠুনকো অজুহাতে হাজার হাজার বিরোধীদলীয় কর্মীকে গ্রেফতার, নির্যাতন করা হলেও

শাসকদলের ক্ষেত্রে ঐ আইনের প্রয়োগ দেখা যায়নি। দেশের আইনের রক্ষক পবিত্র আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ কয়েকজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে লাঠি মিছিল, চাপাতি-রামদা মিছিল ও সশস্ত্র মহড়া এবং খোদ প্রধানমন্ত্রীর **'এক লাশের বদলায় দশ লাশ ফেলে দেওয়ার হুমকি'** রাষ্ট্রীয় জীবনে আওয়ামী লীগের 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের' কবর রচনা করল। 'জাতীয় সংসদ হবে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণী ও আইন প্রনয়নকেন্দ্র' (ধারা ১/খ)। কিন্তু বাস্তবে জাতীয় সংসদে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আলোচনার চেয়ে অশ্লীল বাক্য চর্চার 'খোয়াড়ে' পরিণত করা হল। বিরোধী দলের সদস্যদের আলোচনার কোন সুযোগ না দিয়ে সরকার দলীয় সদস্যারা ঘন্টার পর ঘন্টা **বাপ-বেটি বন্দনা** আর বিরোধী দলকে ঘায়েল করতে ব্যস্ত থাকলেন। ৩০ বছরের পানি চুক্তি, পার্বত্য-চুক্তি, সীমান্ত সমস্যাসহ কোন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুই আওয়ামী সরকার জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেনি।

আইন শৃংখলা রক্ষার অঙ্গীকার : আওয়ামীলীগ **'সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ও নিরাপদ জীবন'** এর অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় এসেছিল। সন্ত্রাস মুক্ত নিরাপদ জীবনতো দূরে থাক, দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলই পরিণত হল এক-একটি **'আওয়ামী কসাইখানা'**। জন্ম নিল শত শত গড ফাদার, মাফিয়া ডন। ফেনীর জয়নাল হাজারী, লক্ষীপুরের লক্ষী ছেলে (?) আবু তাহের, ছাতকের আওয়ামী এমপি বোমা মানিক, নারায়নগঞ্জের শামীম ওসমান, ঢাকার হাজী সেলিম, হাজী মকবুল, কামাল মজুমদার, হেমায়েত হোসেন আওরঙ্গ, লিয়াকত হোসেন, হান্নান, খুলনার এরশাদ শিকদার, চট্রগ্রামের মামুন প্রমুখ উলেখযোগ্য। এসব সন্ত্রাসীদের ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতা, দখল, খুন, হত্যা, ধর্ষণ, নারী-নির্যাতন আর লুন্ঠনে লীগের 'সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ও নিরাপদ জীবন' এর অঙ্গীকারকে উলঙ্গভাবে উপস্থাপন করেছে জাতির কাছে। আওয়ামী শাসনামলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলঃ

- রাজধানীতে ২৪ ঘন্টায় ৬ জন খুন। ১০ ঘন্টায় ৩ জন খুন। *(১৪ অক্টোবর ২০০০, জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০০, আজকের কাগজ)*
- আওয়ামী লীগ সরকারের চার বছরে সারাদেশে ১৫ হাজার মানুষ খুন। এদের মধ্যে ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, নারী প্রমুখ। *(১৯ জুলাই ২০০০, আজকের কাগজ)*
- বাংলাদেশ মানবাধিকার লংঘনকারীদের অভয়ারণ্যঃ এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল। *(১৫ জুন ২০০০, ইত্তেফাক)*
- চার বছরে সাড়ে ১৩ হাজার খুন। বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার ১৩ হাজার। *(২৩ জুন ২০০০, মুক্তকণ্ঠ)*

- মানবধিকার ব্যুরোর মতে শুধু অক্টোবর (২০০০) মাসে সারাদেশে ২৮০ জন খুন, ৮৫ ধর্ষণ, ১১ এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। *(২ নভেম্বর ২০০০, ইনকিলাব)*
- প্রতিদিন গড়ে ৯ জন খুন ও ১২ জন ধর্ষণের শিকার শুধু নগরীতেই। নয় মাসে ৩ শতাধিক হত্যাকান্ডঃ পুলিশের ভাষ্য। *(১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০, প্রথম আলো)*
- চার বছরে চার মহানগরীতে ১২৬৭ টি খুন। সাজা হয়নি কারও। *(৭ নভেম্বর ২০০০, যুগান্তর)*
- শুধু মে (২০০০) মাসেই সারাদেশে ৩৮৬ জন খুন । ডেমোক্রোটিক রাইটস ইনষ্টিটিউটের তথ্য। *(৪ জুন ২০০০,বাংলার বাণী/ ইনকিলাব)*
- আগষ্ট (২০০০) মাসে দেশে খুন ও ধর্ষণ ৩২০ জন। *(৩ সেপ্টেম্বর ২০০০, বাংলার বাণী)*
- প্রতিদিন ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হচ্ছে গড়ে চার জন। *(৫ সেপ্টেম্বর ২০০০, জনকণ্ঠ)*
- ২৪ ঘন্টায় ঢাকায় ৭ জন খুন। *(২৫ মে ২০০১, ভোরের কাগজ/ ইনকিলাব)*

সরকারী প্রচার মাধ্যম ও সংবাদপত্র ঃ ১৯৯৬-র জাতীয় নির্বাচনের ইশতেহারে আওয়ামী লীগ সুস্পষ্টভাবে ঘোষনা করেছিল দেশে 'অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে রেডিও, টিভি ও সরকারী সংবাদ সংস্থাকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করবেন' **এবং ওসবের স্বায়ত্বশাসন বাস্তবায়িত করবেন'** (ধারা ৭)। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো পাঁচ বছরের শাসনামলে দেশের রেডিও, টিভি পরিণত হলে **'বাপ-বেটির বাক্সে'**। সত্য প্রকাশের 'অপরাধে'(?) প্রাণ দিতে হ'ল দেশের প্রায় দশজন প্রখ্যাত সাংবাদিককে (যশোরের শামছুর রহমান, দৈনিক রানার সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুল, খুলনার নহর আলী প্রমুখ উলেখযোগ্য)। আওয়ামী মাফিয়াদের হাতে বিকলঙ্গ হয়ে গেল ফেনীর ইউএনবি প্রতিনিধি টিপু সুলতান, মানবজমিনের ইমরান, জনকণ্ঠের প্রবীর শিকদার সহ প্রায় অর্ধশত সাংবাদিক। রাজনৈতিক মতানৈক্যের কারণে বোমা হামলা ও মামলা চালানো হল *ইনকিলাব, সংগ্রাম, দিনকাল, সাপ্তাহিক এভিডেন্স, জনতার ডাক, পূর্বকোণ, লোক সমাজ* প্রভৃতি সংবাদ পত্রের উপর।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ আওয়ামীলীগ ১৯৯৬-র নির্বাচনী ইশতেহারের ৮ নং ধারায় অঙ্গীকার করেছিল 'দেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদান ও সংবিধানের মৌলনীতি অনুসারে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করন'। কিন্তু, বাস্তবে বিগত পাঁচ বছরের আওয়ামী স্বৈরশাসনে দেখা গেলো ঠিক উল্টো অবস্থা। দেশের বিচার বিভাগের উপর নেমে এলো নগ্ন

দলীয়করনের ও প্রভাবিকরণের নির্লজ্জ খড়গ। খোদ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী নেত্রী শেখ হাসিনা বিচারপতিদের তার দলের মনের মতো রায় না হওয়ায় হুমকি দিলেন "ঠিকঠাকমত বিচার চালাতে না পারলে বিচারকের পদ ছেড়ে দেন" বলে। বিচারকদের রায়ের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ প্রায় অর্ধ ডজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে লাঠি ও কিরিচ মিছিল বের হল ঢাকার রাজপথে। শেষ কথা হলো বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার কোনই উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

পররাষ্ট্রনীতি ঃ ৯৬' র নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ পররাষ্ট্র নীতির ধারায় (২০নং ধারা) যা অঙ্গীকার করেছিল বাস্তবে তা'র কিছুই বাস্তবায়িত করেনি। যা করেছে তা' হচ্ছে নির্লজ্জ ভারত তোষণ ও ভারত-নির্ভর এক গোলামীর মানসিকতা সম্পন্ন খোঁড়া-পররাষ্টনীতির অনুসরণ ও বাস্তবায়ন। তাদের ভারতপন্থী পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়িত করতে দেশের প্রকৃত বন্ধু রাষ্ট্র সমূহের সাথে গড়ে তুলেছে বৈরী ও শীতল সম্পর্ক। ভারত তোষণের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখাতে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে তার সাথে গড়ে তুলেছে নানা অসম্মানজনক ও আত্মঘাতি সম্পর্ক ও জোট। '৩০ সালা পানি চুক্তি', 'উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন', তথাকথিত 'পার্বত্য-শান্তিচুক্তি'-সহ সব ক'টি চুক্তির অন্তরালেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নির্লজ্জ নগ্ন 'ভারত তোষণনীতি'-র প্রতি ফলন দেখা যায়।

পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাসঃ '৯৬ এর নির্বাচনী ইশতেহারের ২৫ নং ধারায় আওয়ামী লীগ পানি সম্পদ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের জন্য স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা বলে। এছাড়া আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশকে বিদ্যুতায়িতকরণ এবং তেল, গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানে নিজস্ব উদ্যোগে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করলেও কার্যত প্রহসনমূলক গঙ্গা পানি চুক্তি করে পানি সমস্যা সমাধানের সকল দ্বার বন্ধ করে সমগ্র বাংলাদেশকে এক চরম শুষ্ক অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। লোনা-পানির প্রবেশের ফলে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট 'সুন্দরবন' ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জে রুরাল পাওয়ার কোম্পানী ফ্রান্সের আলসটন থেকে ১ শত ১০ কোটি টাকার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২ শত কোটি টাকা দিয়ে ক্রয় করে আলোকিত করার নামে দেশকে মূলতঃ অন্ধকারে দিকেই নিয়ে গেছে এ সরকার। দেশের অমূল্য প্রাকৃতিক গ্যাস রাক্ষুসী ভারতের নিকট রপ্তানীর নামে পাচার করার এক জঘন্য অপতৎপরতায় লিপ্ত আওয়ামী লীগ।

কৃষক ও কৃষিঃ বিগত প্রায় পাঁচ বছরে আওয়ামী সরকার দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। '৯৬ এর নির্বাচনী ইশতেহারে স্বল্প ও ন্যায্য মূল্যে সার, বীজ, কীটনাশক, সেচের যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করার ওয়াদা এবং ব্যাপকহারে বৃক্ষ রোপণ এবং বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের উল্লেখ করলেও কৃষি প্রধান বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকরা আকাশ ছোঁয়া মূল্যের কারণে সার ক্রয় করতে পারেনি। চড়া দামে কীটনাশক ক্রয় করলেও নকল কীটনাশকে বাজার সয়লাব হয়ে যায়। কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহের ওয়াদা সম্পূর্ণ মিথ্যায় পরিণত হয়েছে। সহজ শর্তে ঋণ পৌছে দেয়ার ব্যবস্থার উল্লেখ করলেও কৃষকরা দিনের পর দিন মাসের পর মাস হয়রানি হয়েছে ঋণ পাবার মিথ্যা আশ্বাসে। স্থানীয় আওয়ামী নেতারা ঋণ করিয়ে দেয়ার অজুহাতে সরল মনের অভাবগ্রস্থ কৃষকদের নিকট থেকে হাতিয়ে নিয়েছে তাদের কষ্টার্জিত টাকা-পয়সা। অপর দিকে ঋণের সমস্ত সুযোগ সুবিধা উক্ত আওয়ামী নেতারাই ভোগ করেছে। কৃষকদের বীজ সরবরাহ করতেও এ সরকার অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। দেশীয় উৎকৃষ্টমানের বীজের পরিবর্তে ভারতীয় নিকৃষ্টমানের বীজ (যেমন পাট, গম, সরিষা, পেয়াজ প্রভৃতি) সর্বত্র বিক্রয় করা হচ্ছে। বৃক্ষরোপণ ও বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষনের কথা বললেও মূলতঃ বাংলাদেশের যেটুকু বনভূমি আছে তাও সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুন্দরবনের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। পাবর্ত্য-চট্টগ্রামের বনভূমি একেবারেই উজাড় হবার উপক্রম হয়েছে বিগত পাঁচ বছরে। গাজীপুরে ও উত্তরবঙ্গের শাল বনভূমিতে শালগাছ কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। ঢাকা শহরে যেটুকু গাছপালা ছিল তাও কেটে মূর্তি বানানো হয়। কৃষকরা ধানের উৎপাদন মূল্যও পাচ্ছে না। *(১৯ মে ২০০১, ইত্তেফাক)*

নারী ও শিশুর সার্বিক উন্নয়ন ঃ আওয়ামী সরকারের শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) মহিলাদের উপর সবচেয়ে বেশী এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। নারী ও শিশুদের উপর নির্যাতন বেড়েছে। ধর্ষণ হয়েছে কয়েক হাজার। আওয়ামী ক্যাডারদের ধর্ষণের হাত থেকে বাদ যায়নি ৫ বছরের শিশুও। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সেক্রেটারী জসিম উদ্দীন মানিক 'ধর্ষণের সেঞ্চুরী' উদযাপন করে। বিচারের দায় এড়াতে তাকে পরবর্তীতে কৌশলে দেশের বাইরে পাটিয়ে দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা রাসেল, মামুন প্রমুখ বাঁধন নামের এক তরুণীর উপর ন্যাক্কারজনক হামলা চালায়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রীরা ছাত্রলীগ ক্যাডারদের অত্যাচারে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে *(মে ২০০১, প্রথম আলো)*। প্রেমে প্রত্যাখান হয়ে তারা পাশবিক কায়দায় অপহরণ করে ধর্ষণ করছে অথবা ছুড়ে দিয়েছে এসিড। বিভৎস চেহারা আর

ঝলসানো শরীরের অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বেঁচে আছে এ সকল মেয়েরা। এ সমস্ত ঘটনায় মামলা পর্যন্ত করতে দিচ্ছে না লীগের সোনার ছেলেরা। অথচ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সমাজের সম্মান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচী গ্রহনের ওয়াদা করা হয়েছিল বিগত নির্বাচনী ইশতেহারে।

সংসদে দেওয়া মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গঃ সপ্তম জাতীয় সংসদে ৩১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের দেওয়া ১,২৪৭টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে মাত্র ৪১৭টির বাস্তবায়ন হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ২৩টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে মাত্র ৬টি বাস্তবায়ন হয়েছে। ২ জুলাই ২০০১ সংসদে উপস্থাপিত সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটির রিপোর্টে এই তথ্য উল্লেখ করা হয়। (৩ *জুলাই ২০০১, প্রথম আলো/ ইত্তেফাক)*

বিটিভি

...শাসন নিজ নিয়ন্ত্রণে থাকলে -
তাকে কী বলে?

দুঃশাসন

খবর : আওয়ামী দু:শাসনে রেডিও-টিভি পরিণত হয় বাপ-বেটির বাক্সে। স্বায়ত্তশাসনের নামে করা হয় আয়ত্তশাসন।

সৌজন্যে : দৈনিক প্রথম আলো

খবর : শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত ও বিচারকদের সম্পর্কে বেফাঁস মন্তব্য করে তিরস্কৃত হন বহুবার।

সৌজন্যে : দৈনিক দিনকাল

খবর : শেখ হাসিনা বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও ভঙ্গ করেন বারবার।

সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন

সৌজন্যে : দৈনিক দিনকা

আওয়ামী দুর্নীতি

১। ২০০১ সালের প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (টিআই) রিপোর্টে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে উল্লেখ করা হয়। ২০০০ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এক গবেষণা চালিয়ে টিআই এই রিপোর্ট চুড়ান্ত করে। এই সময়ের মধ্যে টিআই দেশের দুর্নীতির বিভিন্ন খাতের উপর ১,৯৪৮টি রিপোর্ট সংগ্রহ করে। উল্লেখ্য, এর আগে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল চতুর্থ। *(১ জুলাই ২০০১, মানবজমিন/ যুগান্তর/ প্রথম আলো)*

২। ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের আপত্তির মুখে কমিটি ২৯ নভেম্বর '৯৯ বৈঠকে ডিজিটাল টেলিফোন প্রকল্পের কাজ স্থগিত রাখার জন্য প্রস্তাব করা হয়। বৈঠকে প্রকল্প সংক্রান্ত কাগজ-পত্রে দেখা যায় চীনা কোম্পানী সিএমইসি'র কাছ থেকে টি.এন.টি বোর্ড ১ হাজার ৬২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪ শত ৯ টাকার যে সকল যন্ত্রপাতি কেনার চুক্তি করা হয়েছে বিশ্ববাজারে তার প্রকৃত মূল্য ৩ শত ৬০ কোটি টাকার বেশী নয়। সরকারের ঠিকাদার নিয়োগে গুরুতর অনিয়মের ফলে প্রায় ৭ কোটি টাকা গচ্চা যাবে। *(২১ ডিসেম্বর '৯৯, ইনকিলাব)*

৩। ২১ ডিসেম্বর '৯৯ শিক্ষামন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বলা হয় যে গণশিক্ষা কার্যক্রমের নামে ১ শত কোটি টাকা লুটপাট করা হয়েছে। *(২২ ডিসেম্বর '৯৯, দিনকাল)*

৪। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) 'চন্দ্রিমা' আবাসিক এলাকায় প্লট বরাদ্দে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি করা হয় ব্যাপকভাবে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, প্লট বরাদ্দ কমিটির আহ্বায়ক ফটিকছড়ির (চট্টগ্রাম-৪) সরকার দলীয় সংসদ সদস্য আনোয়ারের ১৪ জন নিকটাত্মীয় এবং কর্মচারী প্লটের বরাদ্দ পেয়েছেন। *(১৯ ডিসেম্বর '৯৯, ভোরের কাগজ)*

৫। পাঠাগার এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের নামে সৃজনশীল বই ক্রয়কে কেন্দ্র করিয়া তীব্র-অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। '৯৯ সালে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের অধীনে দেশের ১ হাজার ৯৬টি পাঠাগারের জন্য ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার বই বরাদ্দ করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ ঘরানার ১১টি প্রকাশনা সংস্থাকে ৮১ লক্ষ ২১ হাজার টাকার অর্ডার দেয়া হয়।। অপর দিকে ১৬৯টি প্রতিষ্ঠান প্রকাশনা সংস্থা, প্রতিষ্ঠান পায় মাত্র ৩৭ লক্ষ টাকা। *(১১ ডিসেম্বর '৯৯, ইত্তেফাক)*

৬। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর টোলের ২ কোটি টাকা এক শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পকেটে গেছে। প্রধান প্রকৌশলী টোলের হিসাব দেননি। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে জানা যায় সেতু টোল আদায়ে ব্যাপক দূর্নীতি হচ্ছে। টোল আদায়ে কোন নিয়ম মানা হচ্ছে না। অধিকাংশ বাস, ট্রাক থেকে টোল আদায় করে কোন রসিদ দেয়া হয় না। ফলে সরকার কোটি কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সময় বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্যরা সরকারের দূর্নীতির ব্যাপারে প্রতিবাদ করেন। *(২ ডিসেম্বর '৯৯, সংবাদ)*

৭। সম্পূর্ণ অলাভজনক হবে বলে নেগোসিয়েশন কমিটি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মতমত জানানোর পরও প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ শাহজালাল সার কারখানা স্থাপনের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব শেখ হাসিনা অনুমোদন করেছেন। যে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হবে তার স্থানীয় এজেন্ট **স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর মেয়ে নাসরীন করিম।** *(৯ ডিসেম্বর '৯৯, দিনকাল)*

৮। "বর্তমানে বাতিল হিসেবে বিবেচিত আটটি মিগ- ২৯ যুদ্ধ বিমান কেনার চুক্তি করে সরকার সংবিধান এবং সশস্ত্র -বাহিনীর ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা লঙ্ঘণ করেছে"। ২ ডিসেম্বর '৯৯ হাইকোর্টে মিগ ক্রয় সম্পর্কিত চুক্তির বৈধতা নিয়ে দায়ের করা রিটের শুনানীতে বাদী পক্ষের আইনজীবী ড. কামাল হোসেন এ মন্ত ব্য করেন। *(৩ ডিসেম্বর '৯৯, প্রথম আলো)*

৯। ১৯ নভেম্বর ২০০০ ভোরে ফতুল্লা থানার মামদাইর কবরস্থান সংলগ্ন একটি অবৈধ তেল ডিপোতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে দেড়শ্ ড্রাম তেল, সংলগ্ন তেইশটি বাড়ী, একটি তেলের ট্যাংকার ও তিনটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীনে বেশ কিছু জমি দখল করে তৈরী অবৈধ তেল ডিপোটি স্থানীয় কয়েকজন যুবলীগ নেতার মালিকানাধীন বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়। এলাকাবাসীরা আরও জানান অগ্নিকান্ডে বেশ কিছু দিন বন্ধ থাকার পর ফতুল্লা থানা পুলিশ ও নারায়ণগঞ্জ ফায়ার ব্রিগেডের শীর্ষ কর্মকর্তাদের মাসিক ৩০ হাজার টাকা দেয়ার বিনিময়ে আবার যুবলীগ নেতারা এ অবৈধ তেল ডিপোটির ব্যবসা চালু করে। *(২০ নভেম্বর '৯৯, সংবাদ)*

১০। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী বা ইউএনডিপি'র এক এক রিপোর্টে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকাকে বিশ্বের সবচেয়ে দূর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে অভিহিত করেছে। *(৩ নভেম্বর '৯৯ প্রথম আলো)*

১১। মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬ একর জমি হরিলুট হয়ে যায়। এই জমির প্লট পাওয়া নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা পরিষদ, কার্যকারী কমিটির শীর্ষ নেতা ও আওয়ামী নেতারা কাড়াকাড়ি শুরু করে। সমিতির সদস্য ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির (ঘাদানি) সদস্য সচিব অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী ও হাসান ইমাম এই অপকর্মের নেতৃত্ব দেন। *(৩০ অক্টোবর '৯৯, দিনকাল)*

১২। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মাদ হানিফ ১৯৯৪ সালে মেয়র নির্বাচিত হবার পর গত ৫ বছরে ঢাকার বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খরচ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকার বেশী। ঢাকা সিটি করপোরেশনের নিজস্ব তহবিলের অর্থ ছাড়াও এই বাজেটের এক বিপুল অংশ যোগান দিয়েছে 'ইউনিসেফ' ও 'এডিবি'। ১৯৯৪ সাল থেকে বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে প্রতি বছর গড়ে ১০ কোটি টাকা করে খরচ করা হলেও নগরীর ৩ হাজার বস্তির কোথাও উন্নয়নের লেস মাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না এবং বস্তি উন্নয়ন খাতের কোটি কোটি টাকা কোথায়

কিভাবে খরচ করেছে তার কোন হদিস মিলছে না। সর্বশেষ সরকারের বস্তি উচ্ছেদ প্রকল্পে ক্ষুব্ধ হয়ে ইউনিসেফ ও এডিবি নগরীর বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। *(৪ সেপ্টেম্বর '৯৯, দিনকাল)*

১৩। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে যাত্রী বহনের জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে দুটি এফ-২৮ বিমান ক্রয় করা হয়। সেকেন্ড হ্যান্ড হিসেবে এগুলো ক্রয় করা হয়েছে যে মূল্যে ঐ মূল্য নতুন এফ-২৮ বিমান ক্রয় করা সম্ভব। ক্রয়কৃত এফ-২৮ বিমান দুটি ১৯৭০ সালে হল্যান্ডে তৈরী। ইন্দোনেশিয়া বেসরকারী বিমান সংস্থা 'ত্রিগনো এয়ারলাইন্স' ঐ বিমান দু'টি বাতিল হিসেবে দীর্ঘ দিন ফেলে রাখে। ২৫ মে '৯৯ ঐ বিমান গুলো জিয়া আন্ত র্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পরীক্ষা মূলকভাবে উড্ডয়নের জন্য আকাশে উড়লে কিছুক্ষনের মধ্যেই জরুরী অবতরন করাতে বাধ্য করেছে। অল্পের জন্য বৈমানিকরা একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান। *(২৬ মে '৯৯, আজকের কাগজ)*

১৪। সরকারী কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর মিরপুরে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির প্রায় ২৩ একর জমি নাম মাত্র মূল্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এই জমি বে-আইনীভাবে বিক্রি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠে। এই জমির মূল্য প্রচলিত দরে ৫২ কোটি টাকার বেশী হলেও তা বিক্রি হয়েছে মাত্র ২ কোটি টাকায়। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জমি বিক্রির ঘটনাটির কথা স্বীকার করেছেন। *(২৬ মে '৯৯, জনকণ্ঠ)*

১৫। নির্বাচন কমিশনের ভোটার পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) প্রকল্পে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ কোটি টাকা নিয়ম বহির্ভূতভাবে খরচ করা হয়েছে। কন্ট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের বিশেষ একটি অডিট প্রতিবেদনে এই অবৈধ খরচ চিহ্নিত করা হয়। অডিট প্রতিবেদনে বলা হয়, টেন্ডার ছাড়া ভোটারদের ছবি সংগ্রহ ও পরিচয়পত্র তৈরীর কাজ প্রদান, বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়, মনোহারি মালামালের যথেচ্ছ ব্যবহার, ক্যাশ বই ও ব্যাংকের হিসাব গরমিলের মাধ্যমে এই আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। *(২৫ আগষ্ট '৯৯, প্রথম আলো)*

১৬। সংসদে বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএনপি'র টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত এমপি লুৎফর রহমান খান আজাদ সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ করে শেখ হাসিনা, তোফায়েল আহমদ ও মোহাম্মদ নাসিমের শ' শ' কোটি টাকার দূর্নীতির অভিযোগ করে তার বক্তব্যে প্রকাশ করেন। বিদ্যুৎ সেক্টরের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি সংসদকে জানান, ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জে রুরাল পাওয়ার কোম্পানী ফ্রান্সের আলসটম থেকে যে ৬০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিনেছে তার মূল্য হচ্ছে প্রায় ২ শত কোটি টাকা। এ একই কোম্পানী থেকে পিডিবি শাহজী বাজারের জন্য একই ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিনেছে তার দাম হচ্ছে মাত্র ১ শত ১০ কোটি টাকা। *(২৫ জুন '৯৯, দিনকাল)*

১৭। রাজধানী ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশান, বনানী ও উত্তরা মডেল শহরে মোট ৩০১টি আবাসিক প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে 'বরাদ্দ নীতি' (অ্যালটমেন্ট রুলস) লংঘন করা হয়েছে। এতে ক্যাটেগরি তালিকা তৈরীতে প্রকৃত নিয়ম মানা হয়নি। ৯ জুলাই (১৯৯৯) শুধুমাত্র আওয়ামী মুখপাত্র সংবাদপত্র দৈনিক বাংলার বাণীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে এই তিনটি এলাকায় ৩০১টি প্লট প্রাপ্তদের তালিকায় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, দলীয় নেতা ও তাদের আত্মীয়-স্বজন সব মিলে আওয়ামী লীগারদের ব্যাপক প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের ৩৮ জন সদস্য এ প্লট বরাদ্দ পায়। রাজউকের প্লট বরাদ্দকারী কর্মকর্তারাই স্বীকার করে উক্ত প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি মানা হয়নি। তারা বলেছে, আমাদের করার কিছুই ছিল না। *(১১ জুলাই '৯৯, প্রথম আলো/বাংলাবাজার)*

১৮। দেশের অন্যতম রাষ্ট্রয়াত্ব ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সরকার মনোনীত সদস্য গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ নজিরবিহীনভাবে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা মাত্র ৩ দিনের মধ্যে হাতিয়ে নিয়েছেন। অথচ এ ব্যাংকে শ' শ' ব্যবসায়ী বছরের পর বছর আবেদন নিবেদন করেও ১ কোটি টাকা উত্তোলন করতে পারেন না। *(১৫ জুলাই '৯৯, দিনকাল)*

১৯। এ সরকারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করার জন্য পাঁচ বছরের শাসনামলের কোন বছরই পাঠ্যপুস্তক ঠিক সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌছে দেননি। চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয় ২০০১ সালের পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক 'কমিশন' নিয়ে আওয়ামী ঘরানার অনভিজ্ঞ ও দূর্নীতি পরায়ন প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো গ্রুপকে বই ছাপানো ও বন্টনের দায়িত্ব দেয়। পাঠ্য বইয়ের অভাবে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে হাজিরা নেই। ছেলেমেয়েরা ক্লাশে আড্ডা মেরে যখন খুশি চলে যায়। ২৩ জানুয়ারী বই প্রকাশের প্রতারণার অভিযোগে পুস্তক প্রকাশক সমিতি জাতীয় টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। *(১৯-২০ জানুয়ারী ২০০১, প্রথম আলো/ইত্তেফাক)*

২০। রাশিয়ার কাছ থেকে ৮টি মিগ-২৯ কেনা হয় দু' হাজার সালের প্রথম দিকে। মার্চে এক অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা এগুলোকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন। মিগগুলো ছিল পুরনো যা বহুদিন উজবেকিস্তানে পড়ে ছিল। নতুন করে রঙ-চঙ করে সেগুলো বাংলাদেশের কাছে বিক্রি করা হয়। ৮টি মিগ-২৯ ক্রয় -এ ব্যয় হয়েছে সাড়ে সাতশ কোটি টাকা। আওয়ামী সরকার এই মিগ ক্রয়ে প্রায় দু'শ কোটি টাকা লুট করে দেয়। *(২৯ নভেম্বর ২০০০, দিনকাল)*

২১। উপমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর দুটি শিপিং কোম্পানীই নজিরবিহীন জালিয়াতির মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ৩ লাখ গজ শুল্কমুক্ত কাপড় অবৈধভাবে আমদানি করে এবং ভূয়া গার্মেন্টস-এর নামে খালাসের অপচেষ্টা চালায়। এলসিবিহীন এ কাপড় কালোবাজারে বিক্রয় করে সরকারকে প্রায় ১১ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকি দেয়া হতো। এ সময়ে উপমন্ত্রী সাবের হোসেন ছিলেন

অভিযুক্ত কোম্পানি দু'টির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং পিআইএল ও গোল্ডভিউ-এর ৩৫ শতায়শ শেয়ারের মালিক। চোরাচালানের দায়ে মন্ত্রী সাবের চৌধুরীর কোম্পানিকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। *(৯ মার্চ ২০০০, বাংলাবাজার)*

২২। ১০টি ভারতীয় রেল ইঞ্জিন ক্রয়ে ব্যাপক দূর্নীতি ও অনিয়ম ধরা পড়ে। ১৯৯৬ সালে ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতীয় 'রাইটস ইন্ডিয়া' নামক কোম্পানীর কাছ থেকে ১০টি এমজি ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ আমদানি করা হয়। তিন বছর যেতে না যেতেই এই রেল ইঞ্জিলগুলো বন্ধ হয়ে যায়। পরিকল্পনা কমিশনের কোন প্রকার পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে এবং বিপক্ষের সমস্ত মতামত অগ্রাহ্য করে রাইটস ইন্ডিয়াকে ৪০-৪২ কোটি টাকা মূল্যের ১০টি লোকোমোটিব সরবরাহের আদেশ দেয়া হয়। এরপর এই ইঞ্জিনগুলো ডেলিভারী হবার পর টেন্ডারের শর্তের বাইরে পরবর্তীতে ইঞ্জিনগুলো সার্ভিসিং -এর জন্য আরও ২২ কোটি টাকার চুক্তি করা হয়। এ ক্ষেত্রে রেলের স্বার্থ দেখা হয়নি। *(১৩ মার্চ '৯৯, সংগ্রাম)*

২৩। পাবনা সেচ প্রকল্প স্বার্থ সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদের দূর্নীতি, অর্থ আত্নসাৎ ও স্বজনপ্রীতি এবং সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এক ডজন মামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও মন্ত্রীসভা থেকে বহিষ্কারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট আবেদন জানিয়েছেন। *(২৬ এপ্রিল '৯৯, দিনকাল)*

২৪। ওসমানী উদ্যান বৃক্ষ শূণ্য করার প্রস্তুতি চুড়ান্ত করে বাংলাদেশের ১১৪ জাতি জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের নামে সরকারের কোটি কোটি টাকা লুটপাটের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। *(২৬ মে '৯৯, ইনকিলাব)*

২৫। আওয়ামী লীগের পুরনো নেতা ও শেখ মুজিবুরের সহকর্মী সালাহউদ্দীন ইউসুফকে দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী থেকে অব্যহতি প্রদান করা হয়। *(৮ জানুয়ারী ২০০০, আজকের কাগজ)*

২৬। মোটা বেতন, বিনামূল্যে থাকা ও খাওয়া, কাজের উন্নত পরিবেশ ও নিশ্চিত কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারী দলের সংসদ সদস্য, জনশক্তি রপ্তানী ব্যবসায়ী ডা. এইচ বি এম ইকবালের ঢাকা বিক্রুটিং এজেন্সি প্রায় ২০০ বাংলাদেশীকে সৌদি আরব .পাঠায়। ডা. ইকবাল ভিসা বাবদ প্রত্যেককে মাথাপিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পরিশোধ করতে বলেন। কিন্তু এদের প্রত্যেকেই উক্ত টাকা পরিশোধের পর সৌদি আরব গিয়ে প্রতারিত হয়েছেন। সেখানে তারা দেখেন ডা. ইকবাল যা বলেছেন বাস্তব পরিস্থিতি তার পুরো উল্টো এবং দেয়া প্রতিশ্রুতির সবই বানোয়াট। এখন এই বাংলাদেশীরা কর্মহীন অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন। জেদ্দার একটি বাড়ীতে কয়েকটি অন্ধকার কক্ষে ঠাসাঠাসি করে বাস করছেন এবং নিজেদের অর্থে একটি লঙ্গরখানা বানিয়ে

খাওয়া দাওয়া করেন। আওয়ামীপন্থী দৈনিক প্রথম আলো ছবিসহ এদের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে ২ ফেব্রুয়ারী। *(২ ফেব্রুয়ারী ২০০০, প্রথম আলো)*

২৭। পূর্ত প্রতিমন্ত্রী ডা. আলাউদ্দীন তার ছেলেকে সরকারী বাসা বরাদ্দ দিতে গিয়ে ১৯৯৮ সালে বরাদ্দ পাওয়া জনৈকা কর্মকর্তার বাসা বরাদ্দ বাতিল করে দিলেন। জানা যায়, পাওয়ার সেলের উপ-পরিচালক জিশান আরা আরাফুন্নেছা ১৯৯৮ সালে ইস্কাটনের বি-২১/১-২, সরকারী বাসাটি বরাদ্দ পান। বাসাটিতে অবসরকালীন প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত শাহাদাৎ হোসেন বসবাস করছিলেন। তিনি ছেড়ে দিলে জিশান আবার উঠার কথা ছিল। কিন্তু ১৭ ফেব্রুয়ারী (২০০০) সন্ধ্যায় জিশান আরা'র বরাদ্দ বাতিলের চিঠি নিয়ে যান। একই সঙ্গে তাকে জানানো হয় বাসাটি পূর্ত প্রতিমন্ত্রীর ছেলে ওবায়দুল আজমের নামে বরাদ্দ করা হয়েছে। আবাসন পরিদপ্তর জানায়, যুগ্ন সচিব শফিউল আলম নিয়মনীতির প্রসঙ্গে উপস্থাপন করলে প্রতিমন্ত্রী তার আইডি নম্বর জিজ্ঞাসা করেন ও ধমক দেন। *(২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০০, যুগান্তর)*

২৮। বর্তমান সরকারের শাসনামলের তিন বছরে দেশে সীমান্ত পথে আসা চোরাই পণ্য বিক্রি হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকার। এতে সরকার প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যা দেশের দু'বছরের উন্নয়ন (এডিবি) বাজেটের চেয়েও বেশী। *(২ এপ্রিল ২০০০, জনতা)*

২৯। এলজিইডির গম কেলেংকারীতে আওয়ামী সরকার জড়িয়ে পড়েন বার বার। ব্যাপক অনিয়মের মাধ্যমে ১ লক্ষ টন গম সরকারী দলের এমপি এবং তদবির পাটিকে বরাদ্দ করা হয়। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের গম বেঁচে কেনা হয় ক্লাব-সমিতির টেলিভিশন ও অন্যান্য আসবাবপত্র। রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে ঐ গম বিতরণ করা হয়। গম বরাদ্দের ক্ষেত্রে যারা বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন তাদের মধ্যে জাতীয় সংসদের চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর জন্য ১ হাজার টন, প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ৭৫০ টন, ড. মিজানুল হক এমপি ৬১৪ টন, শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল উদ্দীন এমপি ৬০০ টন, আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান ৫৬০ টন, আব্দুল লতিফ মির্জা এমপি ৪০০ টন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। *(৫ এপ্রিল ২০০০, প্রথম আলো/ জনকণ্ঠ)*

৩০। ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ প্রভাব বিস্তার, জালিয়াতি ও প্রতরণার মাধ্যমে বনানীতে রাজউকের ৭ কাঠারও বেশী আয়তনের একটি প্লটের মালিক হয়েছেন। মেয়র হানিফ, তার স্ত্রী ও কন্যার নামে ঢাকায় বাড়ী থাকায় রাজউকের প্লটের মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা ছিল। দল ক্ষমতাসীন হবার পর রাজউক চেয়ারম্যান হুমায়ূন খানের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশলী ডিগ্রীবিহীন ভূয়া প্রকৌশালী শামসুল হক মিয়ার ডেন্টিস্ট স্ত্রীকে ব্যবসায়ী দেখিয়ে জালিয়াতি ও প্রতরণার মাধ্যমে এ প্লটটি বরাদ্দ করিয়েছেন। পরে প্লটটি পরিচয়

গোপন করে নিজের স্ত্রীর নামে মেয়র হস্তান্তর করিয়েছেন। এখন জালিয়াতির এ প্লটে তৈরী হচ্ছে মেয়র হানিফের গোপন বিশাল বাড়ী। *(৪ এপ্রিল ২০০০, দিনকাল)*

৩১। অধ্যক্ষের স্বাক্ষর জাল করে পাবনা সরকারী এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্র সংসদের তহবিলের ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আত্মসাতের একটি ঘটনা ধরা পড়েছে। অগ্রণী ব্যাংক কলেজ শাখার ৫৫৮৫ নং এ্যাকাউন্ট থেকে একটি চেকের (নং ৮৭৬০৫২৪) মাধ্যমে এই টাকা জনতা ব্যাংক আটুয়া শাখায় কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জি.এস ও ছাত্রলীগ নেতা মনিরুলজ্জামান ডেবিড জালিয়াতির মাধ্যমে তার এ্যাকাউন্টে জমা করে। (১১ এপ্রিল ২০০০, প্রথম আলো)

৩২। কোন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ছাড়াই ভারত থেকে আমদানীকৃত অশোক লি-ল্যান্ডের ৬৮টি দ্বিতল বাস আমদানি করা হয়। ইতিপূর্বেও একইভাবে ৪২টি দ্বিতল বাস আমাদানি করা হয়েছিল। কঠিন শর্ত সম্বলিত ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণে আওয়ামী সরকার এ সব দ্বিতল বাস আমদানি করে। *(১৩ মে ২০০০, ইনকিলাব)*

৩৩। নগর ভবনের নিয়ন্ত্রক ফাইভ স্টার গ্রুপের ৫ সদস্যই ছাত্রলীগের বর্তমান ও সাবেক নেতা। স্বয়ং মেয়র তাদের 'ফাইভ স্টার' বলে ডাকেন। তাদের বাড়ী মাদারীপুর ও বরিশাল এলাকায়। নগর ভবনে টোকাই মিজান গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর 'ফাইভ স্টার' গ্রুপ নগর ভবনের টেন্ডারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। অল্প সময়ে গ্রুপের সদস্যরা বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়ে উঠে। সাধারণ ঠিকাদারদের বিদায় নিতে হয় নগর ভবন থেকে। (১৫ মে ২০০০, সংবাদ)

৩৪। শীতলক্ষ্যার পূর্ব তীর সংলগ্ন করিম কমার্শিয়ালের ৪০ বিঘা সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য সাড়ে ৬ কোটি টাকা। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে প্রতিষ্ঠানটির টেন্ডার আহ্বান করা হয়। সর্বোচ্চ ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার টেন্ডার জমা পড়ে। সরকার এই টেন্ডারটি কম বলে বাতিল করে দেয়। ১৯৯৯ সালে পূনরায় টেন্ডার আহ্বান করার পর সর্বোচ্চ ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকার টেন্ডার জমা পড়ে। সর্বোচ্চ এই টেন্ডার দাতার নাম মজিবর হোসেন। এপ্রিল (২০০০) সালে সরকার রহস্যজনক কারণে আগের টেন্ডার দাতার চেয়ে কম মূল্যে টেন্ডার দাতা মজিবর হোসেনকে নির্বাচিত ঘোষণা করে করিম কমার্শিয়ালের সমুদয় সম্পত্তি ও স্থাপনা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। *(২৭ মে ২০০০, মানবজমিন)*

৩৫। চট্টগ্রামের সুজন আবাসিক কল্যাণ সমিতি এক সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় যে শ্রমমন্ত্রীর ছেলে আব্দুল লতিফ টিপু দু'দফায় সমিতির ৪.৩৭ একর ও আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা মোসলেম উদ্দীন ২৩ শতক ভূমি জবর দখল করে নিয়েছে। *(২২ সেপ্টেম্বর ২০০০, আজকের কাগজ)*

৩৬। পিতার নামে হাসপাতাল করার অজুহাতে উপমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী পুলিশের সহায়তায় মাস্তান দিয়ে খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকার (চৌধুরি পাড়া) ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত শিশুপার্কটি ৪ সেপ্টেম্বর (২০০০) দখল করে নেয়। (৫ সেপ্টেম্বর ২০০০, দিনকাল)

৩৭। চট্টগ্রাম মহানগরীর নাসিরাবাদ এবং হালিশহরে গৃহ সংস্থান বিভাগের ২৬ কাঠা জায়গা বিনা টেন্ডারে নাম মাত্র মূল্যে গোপনে বরাদ্দ দেয়া হয় গণপূর্ত ও গৃহায়ণ মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের আত্মীয় ও ঘনিষ্ট জনকে। বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী ৪ কোটি টাকা দামের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক প্লটসমূহ আবাসিক প্লট হিসেবে দেখিয়ে প্রতি কাঠা মাত্র ৩০ হাজার টাকা মূল্য ধরে মাত্র ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় বরাদ্দ দেয়া হয়। *(৮ অক্টোবর ২০০০, যুগান্তর)*

৩৮। এ যাবত তদবির করে, রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন দেশ থেকে শেখ হাসিনা ১০ টি ডক্টরেট ডিগ্রী সংগ্রহ করেছেন। অথচ তিনি নিজ দেশে এম এ ডিগ্রীটা পর্যন্ত অর্জন করতে পারেননি। পড়াশুনা করে এম এ পাশ না করেই যদি কেউ ১০টা ডক্টরেট ডিগ্রী পেতে পারে তাহলে পড়াশুনার দরকার কি? ব্যাপারটা হাস্যকরও বটে। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র নায়ক এভাবে টাকা-পয়সা খরচ ও তদবির করে এত ডিগ্রী সংগ্রহ করেছেন কি? *(যায় যায় দিন)*

: ক্ষমতা ত্যাগের শেষ মূহুর্তে আওয়মী লীগ শত শত কোট টাকা লুটপাট করে
' কোষাগার শূন্য করে।   সৌজন্যে : দৈনিক সংগ্রাম

প্রাকৃতিক দুর্যোগে আওয়ামী লগের ত্রাণ বিতরণ ছিল শুধু রেডিও-
সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন

নামলের পাঁচ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বের এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে
সৌজন্যে : দৈনিক দিনকাল

লীগনেতাদের চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অশ্লীল উক্তিসম্ভার

হুমকি-ধমকি, অশ্লীল গালি-গালাজ আর খিস্তি-খেউড় আওয়ামী লীগের মজ্জাগত চারিত্রিক দোষ। হাসিনার পিতা শেখ মুজিবও প্রকাশ্য জনসভায় 'লাল ঘোড়া' দাবড়ায়ে দেবার অশালীন হুমকি দিয়েছিলেন। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন "কোথায় আজ সিরাজ সিকদার"। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অসংখ্য অশালীন বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলঃ

১। "চট্টগ্রাম আওয়ামী নেতা কর্মীরা কি শাড়ি-চুড়ি পরেন? আর যদি একটা লাশ পড়ে তবে ভবিষ্যতে দশটা লাশ পড়বে", প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের সময় সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের চলে যেতে বলা হয়।

-চট্টগ্রামে আলোচিত এইট মার্ডারের পর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা। (২০ জুলাই ২০০০, প্রথম আলো)

২। "আসামী ধরতে গিয়ে প্রয়োজনে গুলি চালাতে হলে চালান। কলকাতায় যেভাবে নকশালিদের দমন করা হয়েছে সেভাবে করুন। অপরাধীদের ধরতে গিয়ে দুচারটা লাশ পড়ে গেলে কোনো অপরাধ হবে না"

-চট্টগ্রামে পুলিশের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা। (২০ জুলাই ২০০০, যুগান্তর)

৩। "অন্যদল যখন অস্ত্র নিয়ে আসে, সন্ত্রাস করে, তখন আমাদের ছেলেরাও উৎসাহিত হয়, তারাও তো তরুণ"

-ছাত্রলীগের সন্ত্রাস সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা। (সংবাদপত্রের রিপোর্ট)

৪। "লোয়ার কোর্ট বলেন, হাইকোর্ট বলেন- আজ খুনিদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল কোর্ট। যখনি তারা কোর্টে যাচ্ছে, জামিন হয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি, যে উকিল তার জন্য জামিন চাচ্ছে সে উকিলকেও ধরা উচিত, যে কোর্ট জামিন দিচ্ছে তারও জবাবদিহি করা উচিত"

- আদালত সম্পর্কে শেখ হাসিনা। (সংবাদ ভাষ্য)

৫। হাইকোর্টে রায় বলা হয় "ভবিষ্যতে দেশের বিচার বিভাগ ও বিচারকদের সম্পর্কে মন্তব্যের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আরও সতর্ক ও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।"

(২৫ অক্টোবর ২০০০, ইত্তেফাক/ সংগ্রাম)

৬। "নিজেদের বাংলাদেশের মানুষ মনে করেন না আপনারা। এক পা রাখেন ভারতে আর এক পা বাংলাদেশে। দু'নৌকায় পা রাখবেন না। বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করুন"

-হিন্দুসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা।

৭। "জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি বিরোধী দলীয় নেতাদের গাড়ী, বাড়ী, শিল্প প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগায়, ভাংচুর করে তাহলে কি করবেন?"

-জাতীয় সংসদে শেখ হাসিনা। (১৪ এপ্রিল ২০০১, ইনকিলাব/প্রথম আলো)

৮। "বিরোধীদল আগাম নির্বাচন চাইলে নাকে খত দিয়ে বলতে হবে আর কোন দিন হরতাল করবে না। শকুনের দোয়ায় গরু মরে না।"
-৩০ মার্চ প্যারেড গ্রাউন্ডে দলীয় মহাসমাবেশে বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা। (৩১ মার্চ ২০০১, মানবজমিন/যুগান্তর)

৯। "একহাতে তালি বাজে না, আপনারা শুধু একজন সম্পর্কে লেখেন কেন?"
-লক্ষ্মীপুরে আবু তাহেরের সন্ত্রাস সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা। (২৩ অক্টোবর ২০০০, প্রথম আলো)

১০। "বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা নিয়ে যদি আপনারা বিব্রতবোধ করেন তাহলে পবিত্র আদালত থেকে আপনাদের বেরিয়ে যাওয়া উচিত। বিচারকের আসনে বসার অধিকার নেই বিব্রতদের"
-হাইকোর্টের বিচারপতিদের উদ্দেশ্যে পরিবেশমন্ত্রী সাজেদা চৌধুরী। (১৯ এপ্রিল ২০০০, আজকের কাগজ/ মানবজমিন)

১১। "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করার সাধ মিটিয়ে দেব"
-বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করার কারনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ ৫জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিরোধীদল সমর্থক একজন আইনজীবীর মামলা দায়ের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মো: নাসিম। (২১ এপ্রিল ২০০০, যুগান্তর/সংগ্রাম)

১২। "জামায়াত শিবিরের উপর ঝাপিয়ে পড়ুন, এখনই প্রতিরোধ করুন। হুকুমের প্রয়োজন নেই"
-ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমাবেশে পানিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক। (২২ জুলাই ২০০০, ইনকিলাব/সংবাদ)

১৩। "গোলাম আযমকে নারায়ণগঞ্জে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এখানে এলে তাকে টুকরো টুকরো করে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হবে"।
- নারায়নগঞ্জের আওয়ামী এমপি শামীম ওসমান। (১৯ এপ্রিল ২০০০, আজকের কাগজ/ দিনকাল)

১৪। 'মুক্তিযোদ্ধারা চুক্তিযোদ্ধা এবং জারজ'
-মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোজাম্মেল হোসেন। (৪ ডিসেম্বর ২০০০, জনকণ্ঠ)

১৫। "আমার কথা শুনবা না, আবার বিরোধীতা করবা? হ্যাগো ঠ্যাং আমি ভাইঙ্গা ফ্যালামু, আমার টাহা আছে, লাঠিয়াল বাহিনী আছে। কোর্টে যাইব? তার আগেইতো কাম শেষ"
-প্রথম আলোর সাথে সাক্ষাৎকারে বিরোধীতাকারীদের পরিনাম সম্পর্কে মুন্সিগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা মতিন সরকার। (১৩ মার্চ ২০০১, প্রথম আলো)

১৬। "আওয়ামী লীগকে যারা চিনে না, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। লাঠি কোথায় মারতে হয় আ'লীগ তা দেখিয়ে দিবে"
-১৮ এপ্রিল আদালতের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিলে সমবেত লাঠিধারী দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মো: নাসিম। (১৯ এপ্রিল ২০০০, যুগান্তর/দিনকাল)

১৭। "আমি চীপ হুইপের ছেলে, যাকে টার্গেট করি শেষ করে ফেলি, টাকা রেডি রাখবি"

- ধানমন্ডীর একটি বাড়ীতে জোর পূর্বক ঢুকে চাঁদা দাবি করার সময় চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ পুত্র আশিক আব্দুল্লাহ। (৮ নভেম্বর ২০০০, সংবাদ/ যুগান্তর)

১৮। "চট্টগ্রাম শহরকে লাশের স্তুপে পরিণত করা হবে"

-চট্টগ্রামের লালদিঘির ময়দানে ছাত্রলীগের নেতারা ছাত্রশিবিরকে লক্ষ্য করে। (২১ জুলাই ২০০০, দিনকাল)

১৯। "আমার ছেলেদের অস্ত্র আছে। কম্বিং অপারেশনের পর জমা দিব"

-ফেনীর গডফাদার ও আওয়ামীলীগ এমপি জয়নাল হাজারী। (২৮ অক্টোবর, ২০০০, মানবজমিন)

২০। "প্রবাসীদের ভোটার অধিকার দেয়া হলে *রাজাকারের বাচ্চারা* ভোটার হয়ে বিদেশ থেকে ভোট দেবে। ভোট দিতে চাইলে প্রবাসীদের দেশে আসতে হবে"

-প্রবাসীদের ভোটার হওয়ার দাবি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা। (১ মার্চ ২০০১, মানবজমিন)

২১। "১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর সংবাদপত্রের শিরোনাম হওয়ার জন্য খালেদা জিয়া পূর্বানী হোটেলে রাত্রি যাপন করেছিলেন। এরশাদ পুলিশ দিয়ে হোটেল কক্ষের দরজা ভেঙ্গে তার ভাবীকে বের করে আনেন। কোনো ভদ্র ঘরের মহিলা নিজ বাসা ফেলে হোটেলে রাত কাটায় না। সবাই জানে, কেমন মেয়েরা হোটেলে থাকে"। উল্লেখ্য যে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন বেগবান করার জন্য গ্রেফতার এড়াতে খালেদা জিয়া তার বোন ও বড় ছেলেসহ হোটেলে রাত কাটিয়েছিলেন।

-বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া সম্পর্কে জাতীয় সংসদে শেখ হাসিনা এই অশ্লীল বক্তব্য প্রদান করেন। (ইনকিলাব/মানবজমিন)

২২। "দাবি আদায় না হলে ঢাকা শহরে আগুন জ্বলবে, সারা বাংলাদেশে আগুন জ্বলবে। ভোট চোরদের চিনে রাখুন, এদের যেখানে যে অবস্থায় পাবেন সেখানেই আদর-আপ্যায়ন করে দেবেন"

-১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) নির্বাচনের পর শেখ হাসিনা। (১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, সংবাদ/ জনকণ্ঠ)

২৩। "সাংবাদিক কুত্তার বাচ্চাকে আমি দেখে নিব"।

- স্ত্রীর দূর্নীতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলে সাংবাদিকদের হুমকি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। (৩০ মে ২০০০, আজকের কাগজ)

২৪। "তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলে কত ধানে কত চাল বিরোধীদল তা বুঝতে পারবে"

-আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে পল্টনে আয়োজিত দলীয় সমাবেশে শেখ হাসিনা বিরোধীদের হুমকি দিয়ে। (২৪ জুন ২০০১, প্রথম আলো/ইনকিলাব)

শেখ হাসিনার উপর কল্পিত হত্যা (?) প্রচেষ্টা

লোভী, ক্ষমতার অপব্যবহার আর আরাম আয়েশ প্রিয় শেখ হাসিনার কথিত হত্যা প্রচেষ্টার শেষ নেই। ক্ষমতা থেকে বিদায়ের পরও ক্ষমতার ব্যবহার ও সব রকম সুযোগ সুবিধা যেন লাভ করা যায় সে মানসে তিনি সদা তৎপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দকৃত গণভবন না ছাড়ার জন্য তিনি অজুহাত হিসেবে নিরাপত্তার প্রশ্ন রাখেন। তাকে হত্যা প্রচেষ্টার কয়েকটি সাজানো নাটক দেখানো হয়েছে বার বার। এ অজুহাতে নির্যাতন করা হয়েছে বহু নিরীহ নাগরিককে। তার কথিত হত্যা (?) প্রচেষ্টার কয়েকটি হলঃ

- শেখ হাসিনা ও আরও ৩০ জন শীর্ষ আওয়ামী নেতাদের হত্যার অভিযোগে পুলিশ ১০ই অক্টোবর (১৯৯৯) এটিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাংবাদিক সালাহউদ্দিন শোয়েব চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। গোয়েন্দাদের দ্বারা নির্মম মানসিক নির্যাতনের পর তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয় ২৮শে অক্টোবর। এদিকে গোয়েন্দা বাহিনী নিয়মিত সংবাদপত্রগুলোকে বিজ্ঞপ্তি সরবরাহ করে যে, তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আদালতের আইনে কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। নির্যাতিত ও অপমানিত শোয়েব চৌধুরী গ্রেফতারের ১৫ মাস পর ১৫ জানুয়ারী (২০০১) জেল থেকে মুক্তি পান। (*১২ অক্টোবর '৯৯, ইনকিলাব/জনকণ্ঠ*)
- ৫ অক্টোবর ২০০০ প্রধানমন্ত্রীর সাতক্ষীরা বন্যাবলিত এলাকায় পরিদর্শন কালে নিরাপত্তা ভঙ্গের অভিযোগে ৪৬ জন বিএনপি কর্মীকে জননিরাপত্তা আইনের মামলা করা হয়। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ঐ সময় এটা নিয়ে ব্যাপক তোড়জোড় শুরু করলেও বিশেষ বিচারায়ন (Special Tribunal) ২২ এপ্রিল ২০০১, রায় দেন যে কেসটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জননিরাপত্তা আইনে বিচার বিভাগ উক্ত ৪৬ জনকে শুধু বেকসুর খালাসই দেয়নি সাতক্ষীরা ডেপুটি কমিশনার ও জেলা পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেয়া হয় সাতক্ষীরা ওসির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার যিনি এই মিথ্যা মামলা দায়ের করেন এবং এর ফলে এতগুলো লোককে অনেক মাস যাবত হয়রানীর শিকার হন। (*৬ অক্টোবর ২০০০, ২৪ এপ্রিল ২০০১,মানবজমিন/সংগ্রাম*)
- ২৩ মে ২০০০ পুলিশ খাগড়াছড়ি থেকে হেলেনা নামের এক মহিলাকে গ্রেফতার করে এই সন্দেহে যে, সে তামিল টাইগার গ্রুপের একজন সদস্যা এবং তাকে ভাড়া করে আনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার জন্য। এই নিরীহ মহিলাকে পুলিশ, DFI ও NSI এর সদস্য কর্তৃক প্রচন্ড জেরার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে ঢাকাতে আনা হয় এবং এক সপ্তাহ রিমান্ডে নেয়া হয়। পরবর্তীতে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে, সে একজন বাংলাদেশী নাগরিক। বাড়ী ময়মনসিংহে এবং পিতার নাম আব্দুল কাদের। তার দুইবার বিবাহ হয়েছিল ইত্যাদি। ২৬শে মে সে মুক্তি লাভ করে। (*২৪ মে ২০০০, সংগ্রাম/জনকণ্ঠ*)

- টামিল টাইগারের সদস্য এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিধ্বংসী কাজে নিয়েজিত সন্দেহে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট সংযুক্ত মাজহারিবাজার এলাকা থেকে এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। ২৭শে মে, ২০০০ প্রথম আলো প্রকাশ করে যে, ৫০ বছরের ঐ বৃদ্ধাকে হাজতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেই সন্দেহ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় এবং কয়েক সপ্তাহ পর সে মুক্তি পায়। *(২৭ মে ২০০০, প্রথম আলো)*
- মে (২০০০) মাসের গোড়ার দিকে বিবিসি বাংলা বিভাগের একটি সংবাদ পুলিশ বিভাগকে উত্তপ্ত করে তোলে, যেটিতে বলা হয় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হত্যার একটি পরিকল্পনা আবিষ্কার করেছে। এই বিষয়ে ইন্ডিয়ায় বাংলাদেশী হাই কমিশনারকে সতর্ক করে দিয়েছিল 'র'।
- অন্য একটি সংবাদও ২৮ মে বিবিসি বাংলা বিভাগ প্রকাশ করে। এতে বলা হয় একটি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা মোহাম্মদ বসির নামে একজন অভিযুক্ত অস্ত্র ব্যবসায়ীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার জন্য আটক করে। বিবিসির সংবাদে আরও বলা হয়, বসির স্বীকার করেছে বাংলাদেশের একজন উচ্চপদস্থ সেনা অফিসার এপ্রিল মাসে কলকাতা হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করে এবং শেখ হাসিনাকে গোপনে মারার জন্য দায়িত্ব অর্পন করে এবং এর জন্য সেনা অফিসার তাকে ৮০০,০০০ ভারতীয় রূপী প্রদান করে। চুক্তি অনুযায়ী বসির মে (২০০০) মাসে দু'জন তামিল মহিলাকে (ভারতীয় পাসপোর্ট ধারী) কলকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন থেকে ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকতে সাহায্য করেছে। পরবর্তীতে তাছলিমা নামের একজন ভারতীয় পাসপোর্টধারী মহিলা তামিল গোরিলা সন্দেহে ২৬ জুন, ২০০০ চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিস থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরের দিন তাকে চট্টগ্রামে ৭ দিনের রিমান্ডে আনা হয়। ঢাকায় এনেও ইন্টারোগেশন সেলে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু পুলিশ তার নিকট থেকে কোন তথ্য বের করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। *(২৮ মে ২০০০, বিবিসি; ৩০ জুন ২০০০, জনকণ্ঠ)*
- ১১ এপ্রিল ২০০০ পুলিশ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে মেজর (অবঃ) জয়নাল আবেদীন চৌধুরীকে চট্টগ্রাম থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ডের উদ্যোক্তা এই অভিযোগে ধারায় গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তিনি আইনজীবির মাধ্যমে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট থেকে ১৬ এপ্রিল মুক্ত হয়ে আসেন। তার আইনজীবি বলেন, সরকার যে জয়নাল আবেদীকে খুঁজছে তিনি সেই জয়নাল আবেদীন নন। এছাড়াও পুলিশ কোন প্রকার নথিপত্র দেখাতে সক্ষম হয়নি। *(১৭ এপ্রিল ২০০০, ইত্তেফাক/আজকের কাগজ)*
- ১১ অক্টোবর '৯৯ পুলিশ একজন হোটেল রাধক (Cook) এবং পার্ট-টাইম রাজমিস্ত্রি আফসার আলীকে দু'টি স্থানে বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগে গ্রেফতার করে। একটি হচ্ছে মসজিদে এবং অন্যটি পত্রিকা অফিসে *(জনকণ্ঠ)* গ্রেনেড বিস্ফোরণের পরিকল্পনা। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার একেএম শামসুদ্দিন অভিযোগ করেন যে আবছার আলী একজন বিখ্যাত সন্ত্রাসী এবং

বিএনপির কর্মী যার সাথে উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিকদের যোগাযোগ রয়েছে। ১০ দিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের পর গোয়েন্দা অফিসাররা স্বীকার করে যে তারা যে আফসার আলী মোল্লাকে খুজছে ইনি সেই আফসার নন। আলী ২৬ অক্টোবর, ২০০০ মুক্তি পায়। *(২৭ অক্টোবর ২০০০, মানবজমিন/ইনকিলাব)*

- ৮ জানুয়ারী ২০০০ চট্টগ্রাম পুলিশ নূরুল আবছারকে গ্রেফতার করে। পুলিশের অভিযোগ আবছার একজন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী। সে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিধ্বংসী কার্যকলাপ চালানোর প্রস্তুতি নিয়েছে। সে কয়েকবার লিবিয়া গেছে এবং সেখানে অস্ত্র ও বোমাবাজির প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছে। ১৯৯৮ এর জুন মাসে সে পূর্ব ইউরোপের দেশ ভ্রমণ করে এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য ক্রয় করে বাংলাদেশের গন্তব্য স্থানে পাটিয়ে দিয়েছে। আবছার ১৯৯৯ এর সেপ্টেম্বর দেশে ফেরে এবং ভিন্ন পাসপোর্ট নিয়ে পুনরায় বাহিরে যাবার চেষ্টা চালায়। পরে উদঘাটিত হয় যে আবছার লন্ডনের একটি রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক এবং সে দেশে চট্টগ্রামে তার বৃদ্ধা আম্মাকে দেখতে এসেছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম পুলিশ ইন্টারপোলের একটি ফ্যাক্সের বরাত দিয়ে তাকে গ্রেফতার করে কোর্টে চালান দেয় এবং ৭ দিনের রিমান্ডে নেয়। এক পর্যায়ে তাকে ঢাকা আনা হয় এবং চার দিন জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্ত করার পর দেখা গেল ইন্টারপোলের ফ্যাক্সটি ভূয়া। কোর্ট তাকে ১২ জানুয়ারী (২০০০) তারিখে মুক্তির আদেশ দেয় এবং ১৩ জানুয়ারী মুক্তি পায়। *(১৪ জানুয়ারী ২০০০, ইনকিলাব/সংগ্রাম)*
- ২০ জুলাই ২০০০ গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানায় প্রধানমন্ত্রীর কথিত হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে চারজন গৃহবধুসহ ৪০ জনের অধিক লোককে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তের ৮ মাস পরে সিআইডি পুলিশ ৪ঠা এপ্রিল, (২০০০) গোপালগঞ্জ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে চার্জশীট দাখিল করে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ১৯ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু অভিযোগ পাওয়া যায় ৪ জন দরিদ্র মহিলাসহ ৪০ জনের প্রত্যেককে অসহনীয় পুলিশী নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ১ মে (২০০১) ইত্তেফাক জানায় যে কোটায়ালীপাড়ার চার্জশীটে ২০ জন আসামীর নাম না থাকায় তাদেরকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। *(১ মে ২০০১, ইত্তেফাক)*
- ৬ মে ২০০১ শেখ হাসিনার বাসভবন গণভবনের কাছে ঢাকার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার ও আওয়ামী নেতা মিজানের গাড়ীতে বোমা পাওয়া যায়। এ নিয়ে হৈ-চৈ তোলপাড় করে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার উদ্দেশ্যে এই টাইম বোমা রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনীর বোমা বিশেষজ্ঞ, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা ছুটে যায়। সেনা বিশেষজ্ঞদের মতে তিন কেজি ওজনের ঐ বস্তুটি মূলত একটি চুম্বক। এর গায়ে তার ও তিনটি পেন্সিল ব্যাটারি আটকে বোমা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। আওয়ামী নেতা কমিশনার মিজান বিহারীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে 'বোমা কাহিনী' আবিষ্কারের মাধ্যমে তাদের শায়েস্তা করতে চেয়েছিল। *(১০, ১১ মে ২০০১, প্রথম আলো/ মানবজমিন)*

আওয়ামী লীগের দলীয়করণ ও আত্মীয়করণ

দীর্ঘ ২১ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা আওয়ামী লীগ '৯৬-এর নির্বাচনে নানা ছলচাতুরী আর ভন্ডামীর আশ্রয় নিয়ে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হবার পর পরই তাদের লোভ-লালসা ও ক্ষমতার একচ্ছত্র ব্যবহারের খোলস উম্মুক্ত হয়ে যায় খুব নগ্নভাবেই। পিতার স্বপ্ন (?) বাস্তবায়নের নামে হাসিনা সরকার যে অপকর্ম আর অপশাসন জারি করে তা জনগণের নিকট দুঃস্বপ্নের মতই মনে হয়েছে। আওয়ামী লীগ গত পাঁচ বছর (১৯৯৬-২০০১) গোটা দেশ ও দেশবাসীকে শোষণ করেছে, চুষে নিয়েছে এদেশের গরীব দুঃখী কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের রক্ত। আওয়ামী রাক্ষসের দল ক্ষমতাসীন সময়ের পাঁচ বছরে সর্বক্ষেত্রে ধ্বংস করে দিয়েছে এদেশকে। এরা সর্বত্র কায়েম করেছিল সন্ত্রাস আর দলীয়করণের রাজত্ব। ক্ষুধার্থ ব্যঘ্র থাবার ন্যায় তাদের বিষাক্ত ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে আমদের প্রিয় মাতৃভূমি। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে তথা সচিবালয় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে দলীয়করণের নগ্নীয়করণ লক্ষ্য করা গেছে। শেখ হাসিনার আত্মীয়-স্বজন আস্থাভাজন ব্যক্তিদের বসানো হয়েছে বিভিন্ন পদে। সকল প্রকার নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে নির্লজ্জভাবে সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সহকারী সচিব, পুলিশ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদ, কর্পোরেশনের জিএম, রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালক, এমডি, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর প্রভৃতি পদে আওয়ামী নেতা-কর্মীদের বসানো হয়েছে। তেমনি ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্বাচিত বৈধ ভিসিদেরকে অপসারন করে এ তাবেদার সরকার দলীয় লোকদেরকে বসিয়েছে অনির্বাচিত ও অবৈধভাবে। ক্ষমতার দাপট, অর্থের লোভ আর ক্ষমতাকে চিরতরে কুক্ষিগত করার হীন মানসে তারা লিপ্ত হয়েছে এ দলীয়করণ ও আত্মীয়করণে। ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষ প্রান্তে এসেও তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে প্রশাসনসহ সর্বস্তরের বাদ-বাকী পদগুলিকে নিজ দলীয় কর্মীদের মাঝে ভাগাভাগি করতে। শেখ মুজিব পরিবারের নিরাপত্তা আইন -২০০১ নামক বিশেষ আইনের মাধ্যমে ক্ষমতা ছাড়ার পরও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও বসবাস সহ জাতীয় সুযোগ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে এক নজির বিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো হাসিনা সরকার। পবিত্র ইসলাম ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী নিজ পিতার মূর্তি স্থাপন এবং সরকারী আধা-সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে পিতৃছবি টাঙ্গানো বাধ্যতা মূলক করা, পিতাসহ নিজ পরিবারের সদস্যদের নামে সেতু, বিশ্ববিদ্যালয় হল সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ যেন আজ খুবই সাধারন রেয়াজে পরিণত হয়েছে। নিম্নে আওয়ামী সরকারের এসব নগ্নতার কিছুটা উদহরণ তুলে ধরা হল:

- রাষ্ট্র পরিচালিত 'সাপ্তাহিক বিচিত্রাকে' বন্ধ করে পরবর্তীতে শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানাকে সেটি দিয়ে দেওয়া হয় এবং পত্রিকাটি একই নামে ও শেখ রেহানার সম্পাদনায় বর্তমানে বাজারে চালু আছে। *(সংবাদভাষ্য)*

- শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর বড় ছেলে সাদিক আব্দুল্লাহ ঢাকার কলাবাগানের একটি বাড়ী দখল, মেঝ ছেলে মঈন

আব্দুল্লাহ শুক্রাবাদের একটি হোটেল দখল ও ছোট ছেলে আশিক আব্দুল্লাহ একজন ছাত্রকে অপহরণ করে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করে। (*৯ নভেম্বর ২০০০, ২৩ জুন ২০০০, ১৫ নভেম্বর ২০০০, জনকণ্ঠ/ সংবাদ/ প্রথম আলো*)

- সম্পূর্ণ অবৈধভাবে প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ *জয়* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় প্রদান করে। এমনকি বাংলাদেশ এ্যামবেসিতে তদীয় পুত্রের জন্য অফিসও করা হয়। (*১০ নভেম্বর ২০০০, সাপ্তাহিক হলিডে*)
- আওয়ামী নেতা ও কেন্দ্রীয় অর্থসম্পাদক আখতারুজ্জামান বাবু ওরফে *ব্যাংক বাবু* পুলিশ ও দলীয় মাস্তান দিয়ে ইউসিবিএল ব্যাংক দখল করে নেয়। তদীয় পুত্র সাইফুজ্জামান চৌধূরী জাভেদ অবৈধভাবে চট্টগ্রাম চেম্বারও দখল করে নেয়। (*১১ অক্টোবর ১৯৯৯, প্রথম আলো/ ইনকিলাব*)
- বিগত ২০তম বিসিএস সহ বিভিন্ন সরকারী চাকরীতে যোগ্যতার ভিত্তিতে মেধাবী ছাত্রদের নিয়োগদানের পরিবর্তে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের গণহারে নিয়োগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকরী 'বিসিএস' (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) কে আওয়ামী সরকার বঙ্গবন্ধু ক্যাডার সার্ভিসে পরিণত করে। (*১১ জুলাই ১৯৯৯, প্রথম আলো/ জনকণ্ঠ*)
- ক্ষমতায় আসার পরপরই পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বহু প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে শেখ মুজিব, বেগম মুজিব, শেখ হাসিনা, শেখ রেহেনা, শেখ রাসেল, সুলতানা কামালসহ শেখ পরিবারের সবার নামেই করা হয়। এর মধ্যে যমুনা সেতু, পিজি হাসপাতাল, জাতীয় ষ্টেডিয়াম, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। আওয়ামী লীগের নামকরণ থেকে এখন হয়ত বাদ আছে গোরস্থান। (*সংবাদভাষ্য*)
- ঢাকার নিকুঞ্জ, উত্তরা, রূপনগর ও চট্টগ্রামের সরকারী প্লট বরাদ্ধে প্রচলিত রীতিনীতি ভঙ্গ করে প্রাপ্য ব্যক্তিদের নামে বরাদ্ধকৃত প্লট না দিয়ে প্রায় সবগুলো প্লটই আওয়ামীলীগের মন্ত্রী, এমপি অথবা তাদের আত্মীয়স্বজনদের দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি সরকারী আবাসিক এলাাককে পরিনত করা হয় এক-একটি আওয়ামী পল্লীতে। (*১১ জুলাই '৯৯, বাংলাবাজার/ ইত্তেফাক*)
- শেখ হাসিনার বান্ধবী, ঢাকা মহানগর আওয়ামীলীগ নেত্রী ও ওয়ার্ড কমিশনার নসিবুন আহমদের পুত্র রাকিব হাসান সুমন ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে গেন্ডারিয়া রাইফেল্স ক্লাবে মহসীন ও সায়েম নামের দু'জন যুবককে হত্যা করে। এমনকি লাশ দু'টি ১২ টুকরা করা হয়। সুমনের নেতৃত্বে শুধু গেন্ডারিয়াই গত ৫ বছরে ১০ জন খুন হয়েছে। (*১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০, আজকের কাগজ/ দিনকাল/ বাংলার বাণী*)
- সাবেক সেনাপ্রধান লে. জে. মুস্তাফিজুর রহমান -যিনি শেখ হাসিনার ফুফা- তাকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে সেনাকোড (চাকরী) অমান্য করে বেশী বয়স সত্ত্বেও যোগ্যদের বাদ দিয়ে দু'বছরের জন্য পুন:নিয়োগ দিয়ে সেনাপ্রধান বানানো হয় ১৯৯৮ সনে। এমনকি চামচাগিরির পুরস্কার হিসেবে লে.জে. মুস্তাফিজকে অবসর গ্রহণের আগে চার তারকার জেনারেল করা হয়। (*সংবাদভাষ্য*)

- শেখ হাসিনার ফুফাতো বোন শেফালী বর্তমানে স্পেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই অর্ধশিক্ষিত মহিলাকে সেখানে রাষ্ট্রদূত করা হয়। *(১৮ মে, ২০০১ প্রথম আলো)*
- শেখ হাসিনার ফুফাতো বোনের স্বামী ও '৭৩ সালের তোফায়েল ক্যাডার রশিদুল আলমকে জৈষ্টতা ভঙ্গ করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব করা হয়েছে। শেখ হাসিনার আরেক ভগ্নিপতি সৈয়দ ইউসুফ হোসেন হঠাৎ করে অতিরিক্ত সচিব থেকে পূর্ণ সচিব হন। বর্তমানে এক বছরের এক্সটেনশনে আছেন। *(৮ মে ২০০১, যায়যায়দিন)*
- উচ্চ আদলতকে ধমক দিয়ে বাগে আনতে না পেরে হাসিনা সরকার দলীয়করণের পথেই শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। হাই কোর্টের আপীল বিভাগে দু'জন বিচারক নিয়োগ করতে গিয়ে ন্যাক্কারজনক ঘটনার জন্ম দিয়েছে তারা। সিনিয়র বিচারপতিদের ডিঙ্গিয়ে জুনিয়র দু'জনকে আপীল বিভাগে নিয়োগ দেয়।
- হাসিনা সরকার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় দলীয়করণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা পাঠ্য-পুস্তক পর্যন্ত দলীয়করণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের 'প্রকৃত ইতিহাস' সংযোজনের নামে এরা মনের মাধুরী মিশিয়ে বানানো গল্প ঢুকিয়ে দিয়েছে পাঠ্য-পুস্তকে। একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে আমাদের স্বাধীনতার মহা-নায়ক বানাতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আওয়ামী লীগ বিকৃত করেছে। ইতিহাস নামের সেই বিকৃত কাহিনী, বানানো গল্পই আজ স্কুলের কোমল মতি ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ করতে বাধ্য কর। হচ্ছে। পাঠ্য-পুস্তক দলীয়করণের এই ঘৃণ্য নজির শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের দ্বারাই সম্ভব।
- ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ দলীয় করণের মাধ্যমে উদরপূর্তিতে মেতে ঢাকার গুলশান, বনানী ও উত্তরায় ৩০১টি আবাসিক প্লট নিজেরা ভাগবন্টন করে নিয়েছিল। শেখ হাসিনার পরিবারের ৩৮ জন ছিল সেই প্লট দখলকারীদের মধ্যে। *(১০ জুলাই ২০০১, জনকণ্ঠ)*
- শেখ হাসিনার পিতা মাতা ভাই বোনের স্মৃতি সংরক্ষণের নামে ব্যয় করা হয়েছে শ' শ' কোটি টাকা। শুধু (৯৯-২০০০) অর্থ বছরে 'সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, স্থাপনের নামে ১৮ কোটি ১৫ লাখ টাকা, টুঙ্গীপাড়ায় শেখ মুজিবের স্মৃতিসৌধ করা হয়েছে প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করে। শেখ রাসেল কেন্দ্র করার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে সোয়া সাত কোটি টাকা, শেখ মুজিবের স্ত্রী ফজিলাতুন নেছার স্মৃতির জন্য প্রায় ৬ কোটি টাকা, আর হাসিনা কেন্দ্র স্পাপনের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে ২৫ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করে পরিবারের সদস্যদের স্মৃতি সংরক্ষণের এমন লজ্জাজনক নজির বিশ্বের আর কোথাও নেই।
- জাতীয়ভাবে স্বীকৃতির অবদান হিসাবে পরিচিত স্বাধীনতা পদক, একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পদক পাচ্ছে যারা শেখ হাসিনার আস্থা ভাজন। এসব পদক যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও লীগ দলীয় লোকদের মধ্যে বিলিবন্টনের ফলে এসবের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। বাংলা একাডেমী বাকশাল একাডেমীতে পরিণত হয়।

- সম্পূর্ণ অলাভজনক হবে বলে নেগোসিয়েশন কমিটি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মতমত জানানোর পরও প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ শাহজালাল সার কারখানা স্থাপনের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব শেখ হাসিনা অনুমোদন করেছেন। যে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে তার স্থানীয় এজেন্ট স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর মেয়ে নাসরীন করিম। *(৯ ডিসেম্বর '৯৯, দিনকাল)*
- দেশের উচ্চ শিক্ষার মেরুদন্ড বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন করা হয় দলীয়করণ, তেমনি অবৈধ আর অগণতান্ত্রিক পন্থায় ভিসিও নিয়োগ দেয়া হয়। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ভাল রেজাল্টধারী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়োগ না দিয়ে প্রাধান্য দেয়া হয় দলীয় নেতা কর্মীদের। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫০টি পদে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ২০৪ জন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয় যাদের সকলেই দলীয় লোক। শুধুমাত্র ভোটসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ফলে ভাল রেজাল্টধারীদের মধ্যে যেমন হতাশা দেখা যায় তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভাল রেজাল্ট করার প্রবনতাও হ্রাস পায়। এই অবৈধ ও অতিরিক্ত শিক্ষকের বেতন প্রদান করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ কোটি টাকা বাজেট-ঘাটতি দেখা যায়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগামী ২ বছর পর্যন্ত রাবি'তে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। *(১১ জুলাই '৯৯, ১১ জুলাই ২০০১, প্রথম আলো/জনকণ্ঠ/ যুগান্তর)*
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে ভিসি পদে নিয়োগ দিয়ে আওয়ামী সরকার দলীয়করণের চরম নগ্নতা প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের শিক্ষা জীবনে মেট্রিক থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত তিনটি তৃতীয় বিভাগ রয়েছে। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদে কোন তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণীধারী নিয়োগ দেয়ার নজির নেই! যদিও, শিক্ষা জীবনে একটি মাত্র তৃতীয় বিভাগ থাকার অপরাধে (?) আওয়ামী সরকার দশ সহস্রাধিক বেসরকারী স্কুল ও কলেজ শিক্ষককে চাকুরীচ্যুত করেন। দুর্গাদাসের এই নিয়োগে শিক্ষক সমাজসহ গোটা বুদ্ধিজীবি মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। *(৫ নভেম্বর ২০০০, জনকণ্ঠ)*
- আওয়ামী সরকারের নিকট প্রশাসনে প্রমোশন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাবার মানদন্ড হচ্ছে আত্মীয়তা। শেখ হাসিনা তার ফুফা জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগ করেছিলেন। তার চাচা শেখ কবিরকে রেডক্রিসেন্টের সভাপতি পদে, ফুফাতো ভাই আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ্‌কে চীফ হুইপ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়াও শেখ হাসিনা তার ভাই লিটন ও চাচাতো ভাই শেখ হেলালকে এমপি করে।

: শেখ হাসিনা পাঁচ বছরের শাসনামলে প্রায় নয় মাসই বিভিন্ন দেশে কাটান। এসব
। রাষ্ট্রীয় প্রোটোকল লংঘন করে, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, বোনসহ বহু আত্মীয়
কে সফরসঙ্গী করেন। খরচ করেন দরিদ্র দেশের কোটি কোটি টাকা।
সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দি

: আওয়ামী দু:শাসনে সর্বোচ্চ আদালত থেকে কেরানী পর্যন্ত পদে নিয়োগ পায়
কোটধারী অযোগ্য লোকেরা। সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন

খবর : ক্ষমতা থাকাকালে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশে বাধা দান, পণ্ডকরণ আওয়ামীলীগের রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হয়। *–সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন*

খবর : শেখ হাসিনা সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে রাখেন পিতা, মাতা, ভাই, বোন, ছেলে, সন্তানের নামে। *সৌজন্যে সাপ্তাহিক যায়যায়দিন*

খবর : বিশেষ নিরাপত্তা আইনের করে নিজেকে 'রাজকন্যা' ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা।

সৌজন্যে : দৈনিক প্রথম আলো

খবর : শেখ হাসিনা কর্তৃক ক্ষমতার শেষমুহূর্তে তথাকথিত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

সৌজন্যে : দৈনিক প্রথম আলো

আওয়ামী গডফাদারদের অপকর্ম

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র বাংলাদেশে রক্ষীবাহিনী দিয়ে দেশ পরিচালনা করার পরও একদলীয় শাসন কায়েম করার হীন উদ্দেশ্যে বাকশাল গঠন করেছিল। ঠিক তেমনি ২১ বছর পর ক্ষমতায় আসা হাসিনা সরকার বাকশালী প্রেতাত্মা সঙ্গে নিয়ে এলাকা ভিত্তিক দলীয় নেতা তৈরীর মাধ্যমে তাদের চরিত্রের সঠিক পরিস্ফুটন ঘটায়। স্থানীয় ভাবে এই নেতারা যেন "লোকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর" দায়িত্ব পালন করে এবং যারা "গডফাদার" বলেই পরিচিত লাভ করেছে। ধর্ষণ, হত্যা, লুটতরাজ, গুম, দূর্নীতি ইত্যাদি এমন হীনকর্ম নেই যা তারা করতে বাদ রেখেছে। নিম্নে দেশব্যাপী গড়ে ওঠা গডফাদারদের কয়েকজনের কৃতকর্মের সামান্যই তুলে ধরা হলঃ

আব্দুল মতিন সরকার

নরসিংদী জেলা সভাপতি, আওয়ামী লীগ

কৃষি ও তাঁত শিল্পের ঐতিহ্যমন্ডিত শান্ত শহর নরসিংদী এখন একটি আতঙ্কিত জনপদের নাম। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে নরসিংদী পৌরসভা ও সংলগ্ন এলাকায় মহিলা, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবি থেকে শুরু করে খোদ সরকারী কর্মকর্তাসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তির খুন হওয়ার পিছনে আছে নানা অপরাধমূলক কাজ। আর সংগঠিত অপরাধগুলোর পেছনে সরকারীদল আওয়ামী লীগের জেলা কমিটির সভাপতি ও পৌর-চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইন্ধনের কথা এই শহরের বাতাসে ভাসে কিন্তু কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়না। সম্পত্তি দখল, চাদাঁবাজি, টেন্ডারবাজি, মাদক ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে মতিন সরকার ও তার বাহিনী এমন কোন কাজ নেই যা করতে দ্বিধাবোধ করে।

খবরে প্রকাশ, শুধু ২০০০ সালে শহরে খুন হয়েছে হাজিপুরের মর্জিনা বেগম, ফল ব্যবসায়ী চন্দন সাহা, সঞ্জিত সাহা, রেলকলোনীর মিলন, রতন সাহা, ওসমান, ঝন্টু, লিটু, তরুণী কান্ত দাস, সেলিম ও জাহাঙ্গীরসহ ১৮ জন। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় তার লোকজন গভীর রাতে রাস্তার মধ্যে খুন করেছে শিক্ষা কর্মকর্তা কফিল উদ্দীনকে। শহর ঘুরে জানা যায়, মতিন বাহিনীর দ্বারা এলাকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত। ব্যবসার কেন্দ্রস্থল ব্যাপারীপাড়ায় কাপড়, সুতা, রঙ, পাওয়ারলুম ও জুয়েলারী ব্যবসার মূল নিয়ন্ত্রক সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে প্রতিদিন লাখ টাকারও বেশী চাঁদা দিতে হয়। শুধু তাই নয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রে

মতিন বাহিনী এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কোন জায়গা বা বাড়ী পছন্দ হলে তার বাহিনীর সদস্যরা রাতের আধারে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয় - যাতে লেখা থাকে "এই সম্পত্তির মালিক আলহাজ্ব আব্দুল মতিন সরকার"। এই পদ্ধতিতে '৯৯ সালের শুরুতে শহর সংলগ্ন হাজিপুর গ্রামের ৮৩টি বাড়ী মতিন বাহিনী দখল করে নিলেও কেউ প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করার সাহসও করেনি। একই পদ্ধতিতে ভেলানগরের বৃদ্ধ জবিদ আলীর ৯৬ শতাংশ, ব্রাহ্মণপাড়ার খসরুর তিনতলা সুদৃশ্য বাড়ী, মমতাজ উদ্দীনের ১৪ শতাংশ, পাইকার চর ইউনিয়নের মন্দিরে ৪৫ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি, মধ্য কান্দাপাড়ার গোপীনাথের ৪০ শতাংশ, পাথরঘাট সংলগ্ন রমণী সাহার ১০৭ শতাংশসহ বেশ কিছু জমি ও বাড়ী মতিন বাহিনী দখল করে নিয়েছে।

মতিন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার শহরের অন্য একটি বহুল আলোচিত অপরাধকর্ম হচ্ছে মাদক ব্যবসা। এ ব্যবসার গত দশককালে যে বিষে নরসিংদীকে জর্জরিত করেছে তার ভয়াবহ কুফল ফলেছিল '৯৯ এর মে মাসে স্পিরিট পানে শতাধিক লোকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। শহরে এ কথা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, চেয়ারম্যান মতিনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ব্যবসা নরসিংদীতে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এবং এই শহর পরিণত হয়েছে মাদকদ্রব্য পাচারের নিরাপদ রুটে ।

জীবনে মতিন সরকার কোনদিন স্কুলের পাঠ নিয়েছেন কিনা তা নরসিংদীবাসী জানেনা। তবুও তার ভয়ে তটস্থ থাকতে হয় প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। কোন রকমের হের-ফের হতে না হতে তাদেরকে স্ত্রী-মা-কন্যা-বোনের দুঃসংবাদ শুনতে হয়। একজন সরকারী কর্মকর্তা মতিন বাহিনীর আবদার পূরণ না করায় স্ত্রী ও অষ্টাদশী তরুণী মেয়েকে মতিন সরকারের লালসার শিকার হতে হয়েছিল। একই কায়দায় মতিন সরকার নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করেছে শহরের বাসষ্ট্যান্ড, মিল-কারখানা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, শিল্পকলা একাডেমী, বিভিন্ন মাদ্রাসা-স্কুল থেকে শূরু করে রিক্সা ওয়ালাদের উপর। প্রতিদিন প্রতি রিক্সা শহরে চলাচল করতে ২ টাকা করে মতিনের অন্যতম সেনাপতি (!) কালুর নেতৃত্বের সন্ত্রাসী গ্রুপের হাতে তুলে দিতে হয়। বিরোধীদল বিহীন নির্বাচনে গত '৯৯ সালে পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত আব্দুল মতিন তার বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলে, **"আমার কথা শুনবানা, আবার বিরোধীতা করবা ? হ্যাগো ঠ্যাং আমি ভাইঙ্গা ফালামু। আমার টাহা আছে, কোর্টে যাইবা ? তার আগেই তো কাম শেষ"**।

সবমিলে, নরসিংদী এখন এক ভয়ঙ্কর জনপদের নাম - যার শাসন সরকারের হাতে নয়, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনীর নেতা ও পৌর-চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন সরকারের হাতে। *(১৩, ১৪, ১৫ মার্চ ২০০১, প্রথম আলো)*

শামীম ওসমান

আওয়ামী এমপি, নারায়ণগঞ্জ শহর

প্রাচ্যের ডান্ডি বলে খ্যাত বন্দরনগরী নারায়ণগঞ্জ এক সময় পাটশিল্পের জন্যে বিখ্যাত থাকলেও এখন আর সে সুদিন নেই। পাট শিল্পের জায়গা দখল করেছে ***সন্ত্রাস শিল্প।*** শীতলক্ষ্যার তীর ঘেষে গড়ে উঠা এ শহরটির প্রশাসন-ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুই এখন সন্ত্রাসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় গড়ে উঠা এ বাহিনীর নিয়ন্ত্রক **আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান**। শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত রাইফেল্স ক্লাব থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় শামীম বাহিনীর সদস্যদের যাবতীয় কার্যক্রম। জেলা প্রশাসন খেকে শুরু করে নারায়ণগঞ্জের প্রতিটি থানা প্রশাসনেও শামীম ওসমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি কার্যত: জেলার একচ্ছত্র অধিপতি। এমনকি জেলার বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডও তার হাতে জিম্মি।

পার্বত্য কালো চুক্তির বিরুদ্ধে বিরোধী দলের ঐতিহাসিক লং মার্চকে (৯ জুন '৯৮) নারায়ণগঞ্জে বাধা দেয়ার মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রের নজরে আসে সন্ত্রাসী শামীম ওসমান ও তার বাহিনী। এ সময় শামীম বাহিনী কাচঁপুর ব্রীজের কাছে আটকে পড়া একটি যাত্রীবাহী বাসের ৪ যুবতীকে অপহরণ করে গণহারে ধর্ষণ করে। "ফরম ফিল্ আপের টাকা না থাকায় যে শামীম ওসমান পরীক্ষা দিতে পারেনি, যার বড় ভাই সেলিম ওসমান নোয়াখালী রুটে বাস হেলপারের কাজ করে চাল-ডাল আনতেন" (শামীম ওসামানের সাক্ষাতকারের ভাষায়) - সে শামীম ওসমান আজ কোটিপতি। নিজের আধিপত্য পাকাপোক্ত করতে টানবাজার পতিতালয় উচ্ছেদ করে তিনি ব্যাপকভাবে আলোচিত হন। সর্বশেষ তিনি বিরোধী জোটের ৪ শীর্ষ নেতাকে কথিত জনতার আদালতে(!) দেশে বিশৃখংলার(!) অভিযোগে ফাঁসীর আদেশ দিয়ে রাজনীতিতে সন্ত্রাসীর নতুন গডফাদার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

সরেজমিনে ব্যাপক অনুসন্ধানে জানা যায়, নারায়ণগঞ্জে রাজনৈতিক রক্তক্ষয়, সংঘর্ষসহ সব কিছুরই মুলে রয়েছে শামীম ওসমান ও তার ক্যাডার বাহিনী। পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে গোটা প্রশাসনের একটা বড় অংশ এ ক্যাডার বাহিনীর দৌরাত্বে সব সময়

থাকে তটস্থ। শামীম ওসমানের ক্যাডার রাজনীতির অনুসন্ধানে জানা যায়, আওয়ামী লীগের ২৩টি ক্যাডার গ্রুপের ৫শ' সদস্য গোটা নারায়ণগঞ্জের ত্রাস। চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির জন্যে রয়েছে ক্যাডারদের আলাদা গ্রুপ। এ সব ক্যাডারদের অনেকেই এখন কোটিপতি। তাদের মূল কার্যক্রম রাইফেলস ক্লাব থেকে গডফাদার শামীম ওসমানের নির্দেশে চালানো হয়। জেলার বেশীর ভাগ সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কার্যত কোন টেন্ডার হয় না। নামসর্বস্ব ও লোক দেখানো টেন্ডার প্রক্রিয়া চলে। কোন পেশাদার ঠিকাদার কাজ করতে চাইলেও তাকে সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে কিনে নিতে হয়। বন্দরনগরীর বর্তমান টেরর সিন্ডিকেটগুলো হচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ড, ড্রেজিং পরিদপ্তর ও বিআইডব্লিউটিএ। সংশ্লিষ্ট এলাকায় ও সেক্টরে এক একটি গ্রুপ মানে এক মুর্তিমান আতঙ্ক। টেন্ডার, চাঁদাবাজি এমনকি নিয়োগ-বদলিও থাকে তাদের নিয়ন্ত্রনে।
নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৯টি লঞ্চ ঘাটের জন্যে আছে *ঘাট সিন্ডিকেট*। মূল টার্মিনাল নিয়ন্ত্রণ করছে শহীদুল্লাহ ক্যাডার। এই বাহিনী টার্মিনাল থেকে মাসে প্রায় দেড় লাখ টাকা চাঁদা আদায় করে। জেলা ট্রাক ষ্ট্যান্ড থেকে ১০ লাখ টাকা চাঁদা তোলা হয় বলে সূত্র দাবি করে। দলীয় প্রয়োজনে জেলার সকল বাস-ট্রাক-মিনিবাসকে বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করেন শামীম ওসমান। সর্বশেষ, ১৭ মে (২০০১) পল্টনে শেখ হাসিনার সমাবেশে জেলার ৪৬০টির মধ্যে ৪০০টি বাস তিনি বিনা ভাড়ায় পল্টনে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহার করেন *(১৮ মে ২০০০, প্রথম আলো/ইত্তেফাক)*
বিরোধী দলের রাজনীতির ব্যাপারে তার কড়া হুশিয়ারী - হুংকার অব্যাহত থাকে। বিএনপি'র একটি গ্রুপকে নিজের বি,টিম হিসাবে কাজ করতে সুযোগ দিলেও তার বিরোধী ধারার গ্রুপটিকে তিনি জেলা থেকে বিতাড়িত করেছেন। তার অপর বিরোধী দল জাপাকে রেখেছেন গৃহপালিত দল হিসাবে। রাজনৈতিক নেতারা জানান, দিনে শামীম ওসামানের কর্মীরাই জাপার কেন্দ্রীয় নেতা নাসিম ওসমানের কর্মী বনে যান। জামায়াতসহ কোন ইসলামপন্থী দল প্রকাশ্যে জেলায় রাজনৈতিক প্রচার প্রচারণা চালাতে পারে না। এমনকি, শামীম ওসমানের বিধ্বংসী কার্যকলাপে অতিষ্ট হয়ে জেলার সদর আসনের দলীয় এমপি এস এম আকরাম রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, বেসরকারী সকল সংস্থার নির্বাচনে তার মনোনীত প্রার্থী ছাড়া অন্য কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগও পায় না। জেলা আইনজীবি সমিতির নির্বাচন থেকে শুরু করে সম্প্রতি ব্যবসায়ীদের ইয়ার্ন মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের নির্বাচন পর্যন্ত সর্বত্রই তার নগ্ন থাবা। জেলা ক্রীড়া সংস্থারও একই অবস্থা। ক্রীড়া সংস্থার সাম্প্রতিক নির্বাচনে শামীম ওসমান

গং বিএনপি'র জেলা ক্রীড়া সম্পাদকের মনোনয়নপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যান। ফেনীর জয়নাল হাজারী, লক্ষীপুরের আবু তাহেরের মত প্রাইভেট বাহিনীর ক্লাস কমিটির সদস্য তার না থাকলেও শামীম গং বাহিনী আরো বেশী বেপরোয়া, উশৃংখল, মারমুখী ও বিধ্বংশী। প্রতিটি গ্রুপের হাতে রয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্র। যে কোন মুহূর্তে এলাকার সাধারণ মানুষ কোন না কোন দুঃসংবাদের প্রহর গুনতে থাকে। *(২৪, ২৬ অক্টোবর ২০০০, মানবজমিন)*

আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ

আওয়ামী এমপি, ময়মনসিংহ

আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ নামেই তার পরিচয়। ময়মনসিংহের রাজনীতিতে সবচেয়ে সমালোচিত ব্যক্তিত্ব। বদরাগী রাজনীতিবিদ। ময়মনসিংহের একটি থানা গফরগাঁও কেন্দ্রিক রাজনীতি করে বনে গেছেন গড়ফাদার। থানার সব ঘটনা আর অঘটনের পেছনেই তার হাত থাকে। আছে সংঘবদ্ধ বাহিনী। বিস্তর নৃশংস কর্মকান্ডের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। একের পর এক নৃশংস কর্মকান্ডের পিছনে কলকাঠি নাড়ছেন।

নিজ দলের নেতাকে থানা থেকে বের করে নিয়ে স্টেশন গেটে ঝুলিয়ে হাত বেঁধে পেটানোর মত জঘন্য ঘটনার নায়ক আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য গোলন্দাজের বেপরোয়া আচরনে গফরগাঁওবাসী শঙ্কিত-আতঙ্কিত থাকে সব সময়। আইনকে নিজের হাতে তুলে নিতে পছন্দ করেন গোলন্দাজ এবং প্রায়ই তা করেন। ফেনীর জয়নাল হাজারী কিংবা নরসিংদীর মতিন সরকারের সাথে তার পার্থক্য খুবই কম।

ঠিকাদার হত্যা, পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পিটানো, জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিক প্রহার, ক্যাডার বাহিনী লালন-পালন, বাজার দখল, ট্রেন দখল, জায়গা দখল করে কলেজ নির্মাণ, বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের নির্যাতন, কাউকে মেরে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা, সহোদরের চোখ অন্ধ করে দেয়া, গাড়ীর চাকার সাথে জীবন্ত ছাগলকে টেনে আনা এমনকি জোর করে বন্য শুকর জবাই করে খেয়ে ফেলার মতো অনেক অভিযোগ এই গোলন্দাজের বিরুদ্ধে। তার নির্যাতনে বিরোধী দল এলাকা ছেড়েছে অনেক আগে। '৮৬ সালে দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে প্রাইভেট বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে তার উত্থান। '৮৭ সালে জেল পুলিশকে পিটিয়ে গোলন্দাজ সারাদেশে পরিচিতি পেয়েছিলো। এরপর '৯১ সালে আওয়ামী মনোনয়নে এমপি হয়ে শুরু করেন পুরোমাত্রায় সন্ত্রাসী বর্বরলীলা। নিজ দলের প্রতিপক্ষ ও

বিরোধীদলের সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড গোলন্দাজের নির্বাচনী এলাকায় প্রায় নাজায়েযের (!) কাছাকাছি। থানা পুলিশকে তিনি একাজে পুরোমাত্রায় ব্যবহার করছেন। বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের নেতাদের প্রত্যেকের নামে ডজনের উপর মামলা ঝুলছে। এমনকি, প্রতিপক্ষ হওয়ায় গফঁরগাও আ.লীগ নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এখন এলাকা ছেড়ে ময়মনসিংহে অবস্থান করছেন। তার সমর্থকদের পর্যন্ত এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। এলাকায় অনুসন্ধানে জানা যায়, তার বাহিনীর নির্যাতন-নিপীড়ন, অত্যাচারে গফঁরগাওবাসী চরমভাবে ক্ষুব্ধ। এই বাহিনীর অত্যাচার ৭২-৭৫ সালের শেখ মুজিবের রক্ষী -বাহিনীর নির্যাতনকেও হার মানায়। তার খুশির বাইরে সাধারণ মানুষের কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য নেই। এই আধিপত্য তারা স্থানীয় স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাসহ সকল সরকারী-বেসরকারী-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিস্তার করেছে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, থানার কোন সুন্দরী নারী/তরুণীকে গোলন্দাজ বাহিনীর পছন্দ হলে তার আর রেহাই নেই। এ ব্যাপারে গোলন্দাজের কাছে গিয়েও কোন বিচার তো দূরের কথা - উল্টো বিচার প্রার্থীদের অন্য রকম ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়।

সাধারণ লোকজন বলেন, গোলন্দাজ যখন -তখন, যাকে-তাকে গুলি করে বসেন। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর চলে গফরগাঁওবাসীর জীবন। সূত্রমতে, কিছুদিন আগে ভালুকা রাস্তা দিয়ে একটি বালির ট্রাক তাকে বহনকারী গাড়ীর সামনে দিয়ে যাওয়ায় গাড়ীটিকে গুলি করে থামিয়ে ড্রাইভারকে নিজ হাতে বেদম প্রহার করে এই গোলন্দাজ। থানা সদরে তার বাহিনী পিটিয়েছে জাতীয় দৈনিকের একজন স্থানীয় সংবাদদাতাকে। যার অপরাধ হচ্ছে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের থেকে গোলন্দাজের ঘুষ গ্রহণ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা। থানার সবচেয়ে বড় কাঁচা বাজারটিকে ধ্বংস করে অন্যের পুকুর ভরাট করে গড়ে তোলা হয়েছে নতুন বাজার যার নাম "আলতাফ গোলন্দাজ কাঁচা বাজার"। বাজার থেকে দৈনিক ৪০ হাজার চাঁদা টাকা আদায় করে গোলন্দাজ বাহিনী। একজন বন্যপ্রাণী ব্যবসায়ীর অভিযোগ, ক্যাডাররা তার ৫টি শুকর অপহরণ করে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে। অন্যের জায়গা দখল করে গোলন্দাজ নিজে কলেজ বানিয়েছে- যার নাম 'আলহাজ্ব গোলন্দাজ হোসেন কলেজ'। হাইকোর্ট থেকে জায়গা ফেরতের নথিপত্র সংশ্লিষ্টরা গোলন্দাজের কাছে পৌছাতে পর্যন্ত সাহস করেনি। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, ২০০০ সালের ১১ নভেম্বর ময়মনসিংহে শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের নামে যে দলীয় সমাবেশ হয়, ময়মনসিংহের কমিউটর ট্রেনের সকল যাত্রীকে সমাবেশে যোগদানে বাধ্য করে গোলন্দাজ বাহিনী। একই সাথে, দলীয় নেতা-কর্মীদের ময়মনসিংহ পৌছে

দেয়ার পরও কমিউটর ট্রেনকে দ্বিতীয় দফায় গফরগাঁও আসতে বাধ্য করা হয়। কিছুদিন আগে সামান্য তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে গোলন্দাজ থানার ওসিকে থাপ্পর মারে। পুলিশের মতে, সে হলো এলাকার **জমদূত**। রাজনৈতিক মত বিরোধের কারণে সে তার ছোট ভাইটির চোখ পর্যন্ত অন্ধ করে দিয়েছে।

অবৈধভাবে অর্জিত কোটি কোটি টাকার মালিক গোলন্দাজ তার সদ্য নির্মিত প্রাচীর ঘেরা বিশাল বাড়ীতে বসে প্রস্তুত করেন সকল পরিকল্পনা। আর তা বাস্তবায়নে শকুনের মত মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা শতাধিক ক্যাডার। যার প্রত্যেকেই অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত। একজন গোলন্দাজের হাতে জিম্মি ৪ লাখ গফরগাঁওবাসী। তারা শুধু স্বাধীনভাবে বসবাস করতে চায়, জীবন-যাপনে স্বতন্ত্র্য গতি চায়। জীবনের নিরাপত্তা চাইছে প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তে গোলন্দাজ ও তার বাহিনীর বর্বরতা এবং পাশবিকতার হাত থেকে। *(২৪ অক্টোবর ২০০০, মানবজমিন)*

আবু তাহের

সাধারণ সম্পাদক, লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামীলীগ

তিনি লক্ষ্মীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও আওয়ামী নেতা। জনগণকে ভোট দিতে হয়নি। কারণ তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত (!)। '৯৯ সালে অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে আবু তাহের তার দুই শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিকে প্রাণে মারার ভয় দেখিয়ে শহর ছাড়া করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেননি। এর আগে তাহের দুবার নির্বাচনে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। এ সবই পুরনো তথ্য লক্ষ্মীপুরবাসী জানে কিন্তু লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক আইনজীবি নুরুল ইসলাকে অপহরণ করে হত্যা ও গুম করে ফেলার পর আবু তাহের সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে আসে। দেশবাসীর কাছে নতুন এক দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীর পরিচয় মেলে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ তার রাজনৈতিক বিরোধীরা আবু তাহেরকে জমের মত ভয় পান। এমনকি জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা পর্যন্ত নিরাপত্তার ভয়ে স্ব -স্ব পরিবারকে জেলার বাইরে রেখে এসেছেন। বিরোধী দলের নেতা-কর্মী ও নিজ দলের প্রতিপক্ষকে তিনি শহর ছাড়া করেছে। তার কোন কাজের প্রতিপক্ষ মানেই খুন - পঙ্গুত্ববরণ।

৭২-৭৫ সালে মুজিব বাহিনী থেকে ধীরে ধীরে রিক্সা-শ্রমিক লীগে চাঁদাবাজি করতে করতে মূল দল আওয়ামী লীগে যোগদান। ৭৪ সাল পর্যন্ত থানা, ৮৪ সালে জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক থেকে এখন জেলা আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক। '৯৬

সালে দলীয় সরকার ক্ষমতায় এলে শুরু হয় তার মূল উত্থানপর্ব। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি গড়ে তোলেন "বিশেষ বাহিনী"। তার বড় ও ছোট ছেলের তত্ত্বাবধানে এ বাহিনী চাঁদাবাজি ও দখলে নেমে পড়ে। ব্যাপক অস্ত্র সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে বিরোধী দলের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু হয়। এভাবে গোটা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় প্রচার আছে, আবু তাহের কমপক্ষে ৫০ কোটি টাকার মালিক। সবই এসেছে অবৈধ উপায়ে। পরিবহণ ঠিকাদারী ব্যবসা ও অন্যান্য ব্যবসা (!) থেকে তিনি এসব অর্থ উপার্জন করেন। '৯৬ সাল পর্যন্ত একটি টিনের ঘরে বাস করলেও তার এখন প্রাসাদোপম বাড়ী আছে। পৌরসভার সদরে তার বাড়ীকে সবাই বলে **হেডকোয়ার্টার**। এ বাড়ী ঘেষে রয়েছে বিশাল মার্কেট - যার নাম পিংকি মার্কেট। ৩৫ শতাংশে জায়গায় উপর তৈরী বাড়ী ও মার্কেট বানানো হয়েছে অর্পিত সম্পত্তির সকল নিয়মকে ভঙ্গ করে। দখল করে নেয় জনৈক দেলোয়ারের ৫ শতাংশ জমি, শহরের দামী আবাসিক হোটেল "ইউনিক", দালাল বাজারে পৌরসভার চার একর বিশিষ্ট দীঘি।

তাহের তিনধারার সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালান। প্রথমত: শহরের সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীদের উপর সীমাহীন চাঁদাবাজি ও সম্পত্তি দখল, দ্বিতীয়ত: বিরোধী দলকে দমন করতে শহর ও শহরতলীতে ওদের সমর্থক অধ্যুষিত এলাকার গণধর্ষণ, তৃতীয়ত: সব রকমের ব্যবসায়ী মহল থেকে নির্বিচারে চাঁদাবাজি। প্রশাসনের মতে, তাহের বাহিনী তাদের কাছে এক আতঙ্কের নাম। শহর কেন্দ্রিক তাহেরের বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৩০০। বাহিনী পরিচালনার ভার **তার বড় ছেলে বিপ্লবের উপর**। তাই তার নাম দেয়া হয়েছে **বিপ্লব বাহিনী**। শহরের ২০ সদস্যের একটি গোয়েন্দা বাহিনী আছে কলেজের ভিপি ও তাহেরের মেজ ছেলে টিপুর নেতৃত্বে। সরকারের গোয়েন্দা সূত্রমতে, তাহেরের ২০ সদস্যদের একটি কিলিং স্কোয়ার্ড আছে যার নেতৃত্ব দেয় তার ছেলে বিপ্লব। শুধু তাই নয়- ইউনিয়ন পর্যন্ত তার কিলিং স্কোয়ার্ড আছে যাদের কাজ হচ্ছে তাহের বিরোধী সবাইকে নিমিষেই খতম করে দেয়া। এই স্কোয়ার্ডগুলো স্থানীয়ভাবে চাদাঁ আদায় করে তাদের দল পরিচালনা করে। ২০০০ সালের শেষ দিকে জনৈক হান্নান (ধর্মপুর) চাদাঁ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তার ডান হাত কেটে নেয় মাওলা। একই অভিযোগে উপজেলার অর্ধশতাধিক লোককে পঙ্গুত্ববরণ করতে হয়েছে।

তাহের ও তার বাহিনীর সবচেয়ে জঘন্য অত্যাচার-নিপীড়ন চলে তরুণী ও যুবতী নারীদের উপর। লক্ষ্মীপুর সদরে এখন নির্যাতিত নারীদের আর্তনাদ বাতাস ভারী করে তুলেছে। উপজেলার শত শত নারী তাহের বাহিনীর হাতে জীবনের মূল্যবান সম্পদ

"সতিত্ব" হারিয়েছেন। এই বাহিনীর অপকর্মের শিকার জেলার এক রাজনৈতিক নেতার মেয়েকে তাহের জোর করে তার এক ভাগিনার সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। এক ব্যবসায়ীর কন্যাকে গত জানুয়ারীতে (২০০০) তাহের পুত্র বিপ্লব দু'দিন আটকে রেখে ছেড়ে দেন। এলাকার নারী নির্যাতনের সঠিক চিত্র এত ভয়াবহ যা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু তাহের ও তার বাহিনী দিন দিন আরো বেপরোয়াভাবে নারীদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ভয়ে সুন্দরী স্কুল ছাত্রীরা কলেজে পা দেয়না, সামর্থ থাকলে জেলার বাইরে পড়াশুনা করতে বাধ্য হচ্ছে। সুন্দরী গৃহবধুরা কোন রকমেই তাহের বাহিনীর নজরে পড়লে আর রেহাই নেই। এই নির্যাতন এমন যে, মেয়ের সামনে মাকে, মা-বাপের সামনে মেয়েকে অথবা মা-মেয়েকে এক সাথে ধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে। এই বর্বরতার শিকার ১২ বছরের কিশোরী থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত সব সুন্দরী মহিলারা। কিন্তু তাহের বাহিনীর ভয়ে কেউ তাদের পরিবারের দুর্দশার কথা অন্যকে বলার সাহস করেনা। কারণ গোয়েন্দা বাহিনীর কানে গেলেই জীবন শেষ।

লক্ষ্মীপুরবাসীর এই যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার পরও শেখ হাসিনাসহ তার মন্ত্রীরা আবু তাহেরের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে। এ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম অপহরণ ঘটনার পর সংবাদপত্রে তাহের বাহিনীর অবিশ্বাস্য কাহিনী প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেছেন, "শুধু কেন এক জনকে নিয়ে লেখা হচ্ছে"। পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিতিতেই আবু তাহের হুংকার ছেড়ে বলেছেন, ***'তার বিরুদ্ধে লিখতে গেলে হাত-পা গুড়িয়ে দেয়া হবে'***।

প্রশাসনের অসহায়ত্ব স্বয়ং বর্তমান জেলা প্রশাসক মাহবুবুল আলমের বক্তব্যে ফুটে উঠে। এ্যাডভোকেট নুরুল ইসলামকে উদ্ধারসহ আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে বিরোধী দলীয় উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও অন্যান্য সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক বলেন, "আমার চাকরি জীবনের ২৪ বছরে এ রকম ভয়াবহ অবস্থা দেখেনি"।

লক্ষ্মীপুরবাসী জানেনা - কবে তাদের সুদিন আসবে ? *(অক্টোবর ২০০০, প্রথম আলো/ মানবজমিন/ যুগান্তর)*

জয়নাল হাজারী
আওয়ামী এমপি, ফেনী

আওয়ামী গড়ফাদার জয়নাল হাজারীর রাজত্বে (!) ফেনী এখন **মৃত্যু উপত্যকা**। ভয়-আতঙ্কে জেলার মানুষ কথা বলাও ভুলে গেছে। তারা কথা বলেন ফিস্‌ফিসিয়ে। কথা বলার সময় চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় ভয়ার্ত চোখে। কারণ সব জায়গায়, সব সময় ঘোরাফেরা করছে গডফাদারের গুপ্তচরেরা। আতঙ্কিত মানুষগুলো সব সময় তটস্থ থাকেন - যেন মুখ ফসকে কোন কিছু বের হয়ে না যায়। এ জেলায় কোন আইন নেই, প্রশাসন নেই, আছে গড়ফাদার জয়নাল হাজারী। তিনিই প্রশাসনের আইন।

হাজারীর সন্ত্রাসীকর্ম শুরু হয় স্বাধীনতার পর পরই। ১৯৭২-৭৩ সালে জেলার সন্ত্রাসের অভিযোগে তাকে দু'বার গ্রেফতারও করা হয়। ঐ সময় তার হাতে খুন হয় তৎকালীন জেলা ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নাসির। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর হাজারী ফেনী ত্যাগ করলেও জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সে আবার ফেনীতে প্রবেশ করে বিপুল অস্ত্রসহ। এরপর, জাতীয় পার্টির শাসনামলে জাপা'র কেন্দ্রীয় নেতা স্থানীয় সংসদ সদস্য জাফর ইমামের সাথে আপোসের মাধ্যমে জেলায় হাজারী নতুন নতুন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। এই থাবা ভয়ঙ্কর আকার ধারন করে আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর। '৯৭ সালের মাঝামাঝিতে জাতীয় একটি দৈনিকে তার সব ধরনের কুকর্মের ঘটনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলে হাজারী স্থানীয় এক সভার আয়োজন করে যাতে প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে দলীয় কর্মীদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয় হাজারী সন্ত্রাসী কিনা ? অনুগত কর্মীরা তখন হাজারীর পক্ষে রায় দিলে শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন - জয়নাল হাজারী সন্ত্রাসী না, সন্ত্রাসের শিকার। এরপর হাজারীকে আর পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে ফেনীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন **হাজারী লীগ**, পূর্ণগঠন করেন ক্লাস কমিটি। শুরু হয় দখল, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, খুন, জখম, নারী ধর্ষণ, সংখ্যালঘুদের উপর অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়নসহ বিরোধী দল ও নেতাদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা।

খবরে প্রকাশ, শহরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে হাজারী বাহিনীর চাঁদার আয় **মাসিক অর্ধকোটি টাকা**। "ক্লাস কমিটির" দায়িত্ব প্রাপ্ত ক্যাডাররা এই টাকা সংগ্রহ করেন। মাসোহারা আদায়ে ব্যর্থ হলে হতে হয় খুন বা স্ত্রী-মেয়েকে অপহরণ করে ধর্ষণ। দখলদারিত্বে তার রয়েছে ২০ সদস্যের কমিটি। শহরের বিভিন্ন সরকারী জমিসহ তার জন্যে সুবিধাজনক যে কোন সম্পত্তি দখল করতে কোন বাধা নেই। অনেক সময় জেলা

সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে নকল ডকুমেন্ট হাজির করে আসল মালিকদের সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধ্য করা হয়। সবমিলে হাজারী এখন প্রায় কয়েক শ' একর জমির মালিক।
দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত হাজারী সর্বশেষ আলোচিত হন জেলা ইউএনবি সংবাদদাতা টিপু সুলতানকে তার বাহিনী কর্তৃক হাত-পা ভেঙ্গে দেয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে। যদিও, গত বছর (২০০০) গ্রামীণ ফোনের বকেয়া বিল পরিশোধিত না থাকায় অটোমেটিক পদ্ধতিতে তার মোবাইল বন্ধ হবার কারণে হাজারী নিজ হাতে তার বাহিনীসহ জেলা গ্রামীন ফোনের টাওয়ার ভেঙ্গে দিয়ে পুরো জেলায় নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে উঠে। কিন্তু অভিযোগ সে পর্যন্তই। টিপুকে জখম করার কোন প্রতিকার এ পর্যন্ত সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন গ্রহন করতে পারেনি। উল্টো শেখ হাসিনা টিপুকে নির্যাতনের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, *"আসলে সে সাংবাদিক না" (২০ মে ২০০১, যুগান্তর/মানবজমিন)*।
জেলায় তার নেতৃত্বকে প্রতিযোগীতামুক্ত রাখতে আর কোন আওয়ামী নেতার উত্থান সে হতে দেয়নি। বিরোধী দলকে কখনও ফেনী শহরে (তার নির্বাচনী আসন) প্রবেশ করতে দেয়া হয়না। গত সংসদ নির্বাচনে প্রথম বারের মত বিজয়ী হন জয়নাল হাজারী। পঞ্চাশোর্ধ অবিবাহিত জয়নাল হাজারীর চরিত্র ও নৈতিকতা নিয়ে রয়েছে জেলায় হরেক রকমের গুজব। অনেকের মতে, হাজারী জেলার কলেজ ছাত্রদের সাথে অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। যদিও কলেজ পড়ুয়া সুন্দরী তরুণীদের তার আস্তানায় আসতে বাধ্য করা হয় প্রায়শ:ই। বিশেষ বিশেষ দিনে সুন্দরী গৃহবধুদের দিয়েও তিনি তার যৌনতৃষ্ণা নিবারন করেন বলে ভোক্তভোগীরা অভিযোগ করেন। শহরের সরকারী এক কর্মকর্তা দু:খের সাথে বলেন, তার সুশিক্ষিতা গৃহবধু ও কলেজ পড়ুয়া তরুণী - দু'জনকে হাজারীর কুনজরে পড়তে হয়েছে। এ কথা কাউকে বলা যাচ্ছে না - মনের মধ্যে এক দুঃসহ যন্ত্রনা নিয়েই দিন কাটাতে হচ্ছে। তরুণী, অবিবাহিত ও সুন্দরী মেয়ে আছে এমন -অনেক পরিবার শহর ছাড়া হয়েছে তার কুনজর থেকে নিজেদের রক্ষার জন্যে। একই সাথে রয়েছে, তার ***ক্রাস কমিটির*** দু'শতাধিক সদস্যদের বেপরোয়া যৌন নির্যাতন-নিপীড়ন। স্থানীয় সাংবাদিকদের মতে, এদের হাতে মাসে শতাধিক তরুণী ধর্ষণের শিকার হলেও কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না।
সম্প্রতি হাজারী তার সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ফেনী পৌরসভাকে দান করার ঘোষনা দিয়ে নতুন এক চমক সৃষ্টি করেছেন। স্থানীয় সাংবাদিকরা বলছেন, কোন রকমের খতিয়ান নাম্বার ছাড়াই হাজারী এর মাধ্যমে সংবাদপত্রের শিরোনাম হতে

চেয়েছিল। প্রচারে তার প্রচন্ড আগ্রহ বলেও তিনি (হাজারী) স্বীকার করেন। ***কিন্তু ফেনীবাসীসহ সকলের প্রশ্ন - "হাজারী তার অস্ত্র ভান্ডারটি কাকে দেবেন"?*** সীমান্তবর্তী এ জেলাতে অস্ত্র আর ক্যাডার তাকে জেলার একচ্ছত্র অধিপতি বানিয়েছে। তার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এ গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ৩ শতাধিক। গ্রুপের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড যুবলীগ নেতা আরজু। চাদাঁবাজি, বিরোধী দল ও নিজ দলের ভিন্নমতকে দমন এবং চোরাচালান কর্মকান্ডে এসব অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর মার্চ (২০০১) পর্যন্ত ৬০ জন খুন হয়েছে হাজারী বাহিনীর হাতে। দেশে বেশ কয়েকবার অবৈধ অস্ত্র অভিযান চললে ফেনীর ক্ষেত্রে তা অকার্যকর। সীমান্ত জনপদ ফেনীতে কার্যতঃ কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে টেন্ডার হয় না। সব কিছুই নিয়ন্ত্রন করেন গডফাদার হাজারী। এক্ষেত্রে টেন্ডারের ১৫ শতাংশই চলে যায় গডফাদার ও তার ক্যাডারের পকেটে। ফেনীতে সবচেয়ে বড় আয় হচ্ছে চোরাচালান থেকে। চোরাচালানীরা কোন রকম কথা ছাড়াই হাজারীকে মোটা অংকের চাদাঁ দেয়। যদিও, এ ব্যবসার বড় অংশই নিয়ন্ত্রন করে হাজারীর ক্যাডাররা। চমকে অভ্যস্ত হাজারী নতুনত্বের শেষ নেই। সর্বশেষ, তিনি বলেছেন - ***আগামী নির্বাচনের আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করতে পারেন।*** '৯৮ সালে কথিত তরুণী ***"বিজুর বিচার চাই"*** বই লেখে তিনি আলোচিত হয়েছিলেন। ২০০০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে মডেল কন্যা বাঁধন বিবস্ত্র হলেও হাজারী সংসদে দাড়িয়ে "বাধন কেন টিএসসি গেল"- সেজন্যে বিচার ও শাস্তি দাবি করে আলোচনায় চলে আসেন। ফেনীর ত্রাস হাজারীর চমকের শেষ কোথায় তা কেউই জানে বলে মনে হয় না।

সবমিলে, ফেনী এখন এক আতঙ্ক ও ভয়ের শহর। জেলার মানুষ হাজারী ও তার ক্যাডার বাহিনীর নির্যাতনে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন - কবে শেষ হবে আওয়ামী জাহিলিয়াত? কবে তারা মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়াতে পারবে ? কবে শাস্তি হবে এই নরপশু হাজারীর ? *(অক্টোবর ২০০০, যুগান্তর/ মানবজমিন/ প্রথম আলো)*

মামুনুর রশীদ মামুন

আওয়ামী ওয়ার্ড কমিশনার ও যুবলীগ নেতা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী, চাদাঁবাজ, আ'লীগের যুবসংগঠন **যুবলীগ নেতা মামুন**। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাতারাতি পরিণত হয়েছে কোটিপতি গডফাদার হিসাবে। স্থানীয় ওমরগনি কলেজে নিজস্ব ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলে দলের সতীর্থদের সরিয়ে দিয়ে পরিণত হয়েছে সন্ত্রাসী থেকে রাজনৈতিক নেতায়। চট্টগ্রামের দু'জন মন্ত্রীর পৃষ্ঠ-পোষকতায় সন্ত্রাসী মামুন হয়ে উঠেছে আরো বেপরোয়া। পুলিশের খাতায় পলাতক হয়েও প্রকাশ্যে চলছে তার সন্ত্রাস। তার বিরুদ্ধে খুন, অপহরন, ধর্ষণসহ ১৮টি মামলা থাকলেও সম্প্রতি স্থানীয় একটি পত্রিকা অফিসে মাতাল অবস্থায় হামলা করে ও রিপোর্টারকে মারধর করায় সে নতুন আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। অভিযোগ রয়েছে, রাজনৈতিক পৃষ্ঠ-পোষক এবং তদবিরের কারণে পুলিশ প্রশাসন গডফাদার মামুনকে সমীহ করে চলে। ***চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ এলাকার দুধ বিক্রেতা ও ঠেলাগাড়ী চালক আব্দুল মান্নানের পুত্র মামুন কলেজ ও তার আশেপাশের এলাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা অঘোষিত ক্যান্টনমেন্টের মাধ্যমে নিজেকে পরিণত করেছে নগরীর টপ অব দ্যা গডফাদার হিসাবে।*** তার অত্যাচার, নির্যাতন, জেল-জুলুমের কাহিনী খুলনার আওয়ামী ওয়ার্ড কমিশনার এরশাদ শিকদারের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। খুন, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, রাহাজানিসহ কোনটিতেই তার জুড়ি নেই। নগরীর জিইসি মোড় থেকে বহদ্দারহাট পর্যন্ত বড় দোকান থেকে পানের দোকান পর্যন্ত সবই তার পৈত্রিক (!) সম্পত্তি। নগরীতে যেসব কার সেন্টার আছে তার পছন্দকৃত নতুন মডেলের গাড়ী বাসায় পৌছে দিতে হয়। মন্ত্রীসহ ঢাকা কেন্দ্রিক ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিজের এবং পরিবার পরিজনের জন্যে প্রয়োজনে মামুন এসব গাড়ী সরবরাহ করে। খুনের রাজনীতিতে তার যাত্রা ৮০'র দশকে। নিজ দলের একাদিক সতীর্থকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খুন করেছে মামুন ও তার বাহিনী। '৯৮ সালে লালদিঘীতে শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ছাত্রলীগ নেতা মোমিনকে হত্যা করে। এমনকি নিজের সহযোগী চন্দন ভৌমিককে পর্যন্ত নিজ হাতে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি মামুন। স্থানীয় লোকজনের মতে, মামুন ও তার বাহিনীর ভয়ে নগরীর অভিজাত এলাকার বাসিন্দারা তটস্থ থাকে। এলজিআরডি ভবনসহ সরকারী অফিস আদালতের সব ***টেন্ডার মামুন সিন্ডিকেটের*** হাতে। শত শত কোটি টাকার টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করে এই সিন্ডিকেট। স্থানীয় কালুরঘাট রেলসেতুর ইজারা কম মূল্যে অস্ত্রের মুখে আদায় করে

নেয় মামুন বাহিনী। তার এই অপকর্ম থেকে নগর আ'লীগ নেতা সিকান্দার হায়াত খানসহ কেউই রেহাই পায়নি। নবম চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক শিল্প মেলার গেইট ইজারার সর্বোচ্চ দর দাতাকে (৬০ লাখ টাকা) হটিয়ে দিয়ে ৪৫ লাখ টাকা দিয়ে ইজারা নিয়েও ১৬ লাখ টাকা দেয়নি মামুন বাহিনী। গত (২০০১) কোরবানীর ঈদে চট্টগ্রামের আতুরার ডিপো এলাকা থেকে ২ ট্রাক চামড়া ছিনিয়ে নিয়েছে মামুন বাহিনী। এছাড়া, ১৯৯২ সালে চট্টগ্রামে দামপাড়া পুলিশ লাইনে অস্ত্রের গুদাম লুটপাটের ঘটনায় মামুন বাহিনী জড়িত বলে পুলিশ জানলেও কিছুই করা হয়নি। এর পাশাপাশি, নগরীর মিমি সুপার মার্কেটে স্বর্ণের দোকান লুট ও ডাকাতি ঘটনার সরাসরি নেতৃত্ব দেয় এই মামুন। জনতার চাপে তখন তাকে গ্রেফতার করা হলেও পরে মহিউদ্দীন চৌধুরীর সাথে বিরোধের জের ধরে পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার করে নিতে হয় এবং মামুন মুক্তি পায়।

গডফাদার মামুনের অন্যান্য আয়ের উৎস হচ্ছে স্মাগলিং, দখল ও অস্ত্র ব্যবসা। গাছের ব্যবসার চাঁদাবাজিতেও সে জড়িত বলে জানা যায়। অবৈধভাবে পার্বত্য এলাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে পাচার হওয়া সব কাঠের ঠিকাদারের কাছ থেকে মামুন মাসোহারা আদায় করে। সমুদ্র উপকূলবর্তী চট্টগ্রামের অবৈধ চোরাচালানীর সাথেও সে জড়িত। গত বছর সোনা পাচার করতে গিয়ে মামুন বাহিনীর বেশ কয়েকজন ক্যাডার ধরা পড়লেও মামুনের খুনের হুমকিতে তারা চোরাচালানসহ বের হয়ে যায়। জায়গা-জমি দখল নিয়েও সে পিছিয়ে নেই। রেলওয়ের ৪ একর জমি দখল করে সে গড়ে তুলেছে বিশাল কলোনী। অবৈধ বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন জানি তার কিছুই হয় না। তার সহকর্মীরা জানায়, চট্টগ্রামের আন্ডারওয়ার্ল্ডের নিয়ন্ত্রন কর্তা হবার সুবাধে '৯৭ সালে ফটিকছড়ি উপজেলার জাফরনগর ইউনিয়নে ভোট কেন্দ্র দখল করতে গিয়ে মামুন বাহিনী ঐ সময় ৩ জন গার্মেন্টস কর্মীকে ধর্ষণ করে।

বিভিন্ন মামলায় ৩৬ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী মামুন '৯৯ সালে চট্টগ্রামে ভোটার বিহীন একদলীয় নির্বাচনে ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত (!) হন। এই সময় তাকে স্বাগত জানাতে চট্টগ্রামের মন্ত্রী এম.এ মান্নান তার বাসায় ছুটে গিয়েছিলেন বলেও জানা যায়। গত ১৮ এপ্রিল (২০০১) মামুন মাতাল অবস্থায় সহযোগী সন্ত্রাসীদের নিয়ে স্থানীয় দৈনিক পূর্বকোণ অফিসে হামলা করলে তার বিরুদ্ধে সর্বমহলে নিন্দা ও ধিক্কারের ঝড় উঠে। এক পর্যায়ে পুলিশ তাকে ধরার জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করে। কিন্তু সন্ত্রাসী মামুন তখনও স্থানীয় আওয়ামী নেতাদের বাসায় অবস্থান করলেও পুলিশ তাকে

গ্রেফতারের চেষ্টা করেনি। অবস্থা বেগতিক দেখে ৮ মে (২০০১) সন্ত্রাসী মামুন আদালতে আত্মসমর্পণ করে। জানা যায়, আত্মসমর্পণের দিন সকালে মামুন আওয়ামী মেয়র মহিউদ্দীন চৌধুরীর সাথে দীর্ঘক্ষণ গোপন বৈঠক করে সিটি কর্পোরেশনের গাড়ীতে করে আদালতে উপস্থিত হন। অবাক কান্ড হচ্ছে, অন্য আসামীদের যেখানে কোর্টের যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করতে ৪/৫ ঘন্টা সময় লাগে - সেখানে মামুনকে ১৫ মিনিটের মাথায় জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

পত্রিকা অফিসে হামলার অভিযোগে সর্বমহলের ধিক্কারের মুখে মেয়র মহিউদ্দীনের সহযোগীতায় মামুন কোর্টে আত্মসমর্পন করলে তাকে ভিআইপি মর্যাদায় চট্টগ্রাম জেলে রাখা হয়েছে। যুবলীগ নেতার এই সাময়িক আত্মসমর্থনে (!) চট্টগ্রামের মানুষ হয়তো ক্ষনিকের জন্যে স্বস্তি পেয়েছে কিন্তু শেষ হাসি হাসতে পারবে কি ? *(১৮-৩০ এপ্রিল ২০০১, মানবজমিন/ যুগান্তর/ ইত্তেফাক/ সংগ্রাম/ পূর্বকোণ/ কর্ণফুলী)*

নজরুল ইসলাম বাবুল
আওয়ামী নেতা, সিলেট

শাসকদল আ'লীগের প্রচার বিমুখ এক দুর্ধর্ষ গডফাদারের নাম নজরুল ইসলাম বাবুল। আন্ডারওয়ার্ল্ডের জগতে "বাবুল ভাই" বলে পরিচিত। ব্যবসায়ী হিসাবে তাকে সবাই জানে-চিনে। কিন্তু এ পরিচয়ের বাইরে রয়েছে তার অন্য পরিচয়। তার রয়েছে প্রাইভেট বাহিনী, রয়েছে বিশাল নেটওয়ার্ক। সিলেটের আন্ডারওয়ার্ল্ডে কখন কি ঘটছে বা ঘটবে - সবই তার নখদর্পনে। অনেক ঘটনার তিনিই নায়ক। ৩০০ সদস্যের প্রাইভেট বাহিনী এই বাবুলের। গডফাদারের চলাফেরার রয়েছে রাজকীয় স্টাইল। পেছনে বিশাল এস্কর্ট নিয়ে চলেন তিনি। যে কোন ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় এস্কর্ট বাহিনী প্রস্তুত থাকে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করে গড়া হয়েছে এই বাহিনী। গডফাদার নিজেও সবসময় অত্যাধুনিক অস্ত্র সাথে রাখেন। তার বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সুদুর লন্ডনে। নতুন এই গডফাদারের নানা কাহিনী স্থান পেয়েছে পুলিশ বাহিনী ও গোয়েন্দাদের পাতায়।

গডফাদার বাবুলের পিছনে রয়েছে এক অজানা ইতিহাস। জন্ম সিলেটের দক্ষিণ সুরমার তেতলী ইউনিয়নের নামাপাড়া গ্রামে। পিতা আলহাজ্ব আলতাফ মিয়া। সরকারী অগ্রগামী স্কুলে অধ্যায়নকালে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন বাবুল। পরবর্তিতে রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলে ভর্তি হন। এক সময় এই স্কুল ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরিত হলে বাবুল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা পরীক্ষা ছাড়া ভর্তির সুযোগ দেয়ার দাবিতে

আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করলে বাবুলদের বহিস্কার করা হয়। স্কুল থেকে বহিস্কৃত বাবুল তখন পারিবারিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান "বনফুল" সময় দিতে থাকে। '৮৫ সালে সপরিবারে লন্ডন পাড়ি জমায়। দেশে ফিরে বিয়ে করে ব্রিটিশ নাগরিক বেদানা বেগমকে। '৯৬ সালে সিলেটের জিন্দাবাজারে রাজনৈতিক সংঘর্ষে তার ছোট ভাই বুলবুল নিহত হলে বিদ্যুতের বেগে ছুটে আসে বাবুল লন্ডন থেকে। একই সময়ে বাবুলের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাদাঁবাজি চলে বেপরোয়াভাবে দলীয় প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসী দ্বারা। বাবুল আর দেরী করেননি। চকচকে অস্ত্র হাতে প্রতিরোধের নামে সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। একে একে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সিলেটের সব ক্ষেত্রে। চাদাঁবাজিতে নিজেই জড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক হত্যাকান্ডে অস্ত্র ও টাকার জোগাড় দিতে শুরু করেন। দলীয় প্রতিপক্ষকে শেষ করে দিতে সব কিছুই করেন বাবুল। গঠন করেন ৩০০ সদস্য নিয়ে প্রাইভেট বাহিনী। যে বাহিনীর সাথে কয়েক ঘন্টা ব্যাপক বন্দুক যুদ্ধ করছিল সিলেটের ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের সাথে। ২৫ নভেম্বর (২০০০) এ ঘটনার পর বাবুলের গোপন পরিচয় ফুটে উঠে রাজনৈতিক মহলে। কানাঘুষা শুরু হয়, নেপথ্যে ঘটনার নায়ক হিসাবে তার নাম বেরিয়ে আসে। পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থার টনক নড়ে। হানা দেয় অভিজাত বিলাসবহুল বাসায়। গ্রেফতার করা হয় বিপুল অস্ত্র-শস্ত্রসহ। কিন্তু বেশী দিন আটকে রাখা যায়নি। ১০৬ দিনের মাথায় বীরদর্পে বেরিয়ে আসেন বাবুল।

শুরু করেন নতুন ধরনের সশস্ত্র লড়াই। সব ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়েন এই বাবুল। সীমান্তের চোরাচালানের কাজে তার বিশাল নেটওয়ার্ক। বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে চাদাঁ সংগ্রহে তার রয়েছে আলাদা গ্রুপ। প্রতিপক্ষকে শেষ করে দিতে সদা প্রস্তুত রাখা হয় বিশ সদস্যের কিলিং স্কোয়ার্ড। মুহূর্তেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে গডফাদারের নির্দেশে। আইন-শৃখংলা রক্ষাকারী সংস্থার সাথে তার রয়েছে দহরম মহরম। মাসিক মাসোহারা দিতে কার্পণ্য করেন না তিনি পুলিশ বাহিনীকে।

আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিলেটের দু'মন্ত্রীর সাথে তার সমান সম্পর্ক। দু'জনই বাবুলকে নিজের লোক মনে করে। বাবুলও তাদের হতাশ করেনা। প্রয়োজনে অস্ত্র দিয়ে তাদের পক্ষে মাঠে নামতে কোন দ্বিধা বোধ করেনা। শহর, জেলাসহ সর্বস্ত রের দলীয় নেতারাও তাকে দলীয় গডফাদার হিসাবে জানে ও সমীহ করে। শহরে বেশ কয়েকটি সুসজ্জিত অফিস থেকে নিয়ন্ত্রন হয় সব কিছু।

কোটি কোটি টাকার মালিক বাবুল সম্প্রতি সংবাদপত্রের পাতায় নিজের নাম দেখে কিছুটা বিব্রত বোধ করছেন। প্রচারবিমুখ বাবুল সবসময় পেছন থেকে কাঠি নাড়তে পছন্দ করতেন। থাকতে চাইতেন মাফিয়া সম্রাট হিসাবে। *(১৫ মে ২০০১, মানবজমিন)*

এরশাদ সিকদার

আওয়ামী নেতা ও ওয়ার্ড কমিশনার, খুলনা

দেশের টপ কিলার, আওয়ামী ওয়ার্ড কমিশনার ও খুলনাঞ্চলের চোরাচালান সিন্ডিকেট প্রধান এরশাদ সিকদার এখন দেশব্যাপী আলোচিত ব্যক্তিত্ব। পুরো নাম এরশাদ আলী সিকদার। ঝালকাটির নলছিটি থানার বাহাদুরপুর গ্রামে তার জন্ম। দেশ স্বাধীন হবার পর '৭২-৭৩ সালে মায়ের হাত ধরে কাজের সন্ধানে খুলনা আসে। খুলনার জাহাজ ঘাটে বস্তার গম চুরি করে মহাজনের কাছে বিক্রির মাধ্যমে অপরাধ জগতে তার যাত্রা। এরপর শুধুই সামনে তার চোখ। শ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে ঘাটের ৪ নং জেটিতে গড়ে তোলে নিজস্ব বাহিনী। শুরু হয় চাঁদাবাজি। দখল করে নেয় প্রতিপক্ষকে হটিয়ে কয়েকটি ঘাট। নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে পুরো বন্দর এলাকায়। এরপর চোরাচালান ও মাদক ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়ে কোটিপতি হয়ে যান এক দশকের মধ্যে।

কিন্তু '৯৯ সালের শুরুতে যুবলীগ নেতা খালিদকে হত্যার কারণে এরশাদ সিকদার আর রক্ষা পায়নি। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আ'লীগ ওয়ার্ড কমিশনার হয়ে নিজ দলের যুবসংগঠনের নেতাকে হত্যার অপরাধে নিজ দলের বিরাগভাজন হন এরশাদ। প্রকাশিত হতে থাকে নৃশংস ঘটনা, তার উত্থান কাহিনী, পৃষ্ঠ-পোষক রাজনৈতিক নেতা, সুবিধাভোগী প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তি ও সম্ভ্রমহারা মা-বোনের তালিকা। সহযোগীদের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষীতে বের হতে থাকে তার হরেক রকমের লোমহর্ষক অবিশ্বাস্য কাহিনী।

সূত্রমতে, এই পর্যন্ত তার হাতে খুন হয়েছে ৬০ জন। তার দেহরক্ষী, ঘনিষ্ট সহযোগী ও অন্যদের দেয়া স্বীকারোক্তি থেকে এ কথা জানা যায়। হত্যাসহ মামলাও হয়েছে গোটা চল্লিশেক। আওয়ামীলীগের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় মাদক দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা, পুরোকীর্তি পাচার, রেলওয়ের জমি দখল করে সেখানে বাজার ও বস্তি স্থাপন সহ এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে এরশাদ -যেখান থেকে তার হাতে আসতো প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা। বিশাল প্রাসাদ খুলনার ***'স্বর্ণকমল'*** ছাড়াও এরশাদের আছে অঢেল সম্পত্তি। অনুমিত হিসাবে এরশাদ সিকদারের সহায় সম্পত্তির পরিমাণ **দেড়'শ কোটি টাকা**। দু'দশকেই সে এই সম্পত্তি ও অর্থ আয় করেছে ভিখিরি থেকে - আর একই

সময়ে উৎকোচ হিসাবে সে ব্যয় করেছে সমপরিমান অর্থ। শহুরে এই মাফিয়ার প্রতিটি হত্যাকান্ডই ছিল পরিকল্পিত। ***তার বরফকলটি ব্যবহৃত হতো কনসেনট্রেশন ক্যাম্প হিসাবে।*** হাত-পা বেধে জীবন্ত মানুষকে নদীতে নিক্ষেপ করে সে যেমন হত্যা করেছে, তেমনি লাশ গুম করার জন্য ভৈরব নদীতে তা নিক্ষেপ করেছে জমাট সিমেন্টের সঙ্গে বেঁধে। একটি খুনের সাক্ষ্য নষ্ট করতে খুন করেছে আর একজনকে। এভাবে তার হাতে খুনের তালিকা বেড়েছে একটির পর একটি। বলা হয় ডজনখানেক নারীকে সে ব্যবহার করেছে স্ত্রীর মতো। বহুল আলোচিত সানজিদা নাহার শোভা তার বড় প্রমাণ। আর কত নারী যে তার কাছে সম্ভ্রম হারিয়েছে, তার হিসাব সে নিজেও দিতে অপারগ। একইভাবে তার হাতে যারা চিরতরে নিখোঁজ হয়েছে, সে তালিকা বের করাও কঠিন। এরশাদের উত্থান প্রমাণ করে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের মাফিয়ানির্ভরতার এক অন্ধকার দিক।। যারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং উর্ধ্বতন পদে আসীন - তাদের এরশাদঘনিষ্ঠতা জানার পর দেশবাসী বিস্ময়ের পাশাপাশি শঙ্কিতও হয়েছে। কারণ এদের পরই নাগরিকের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত। এরশাদের পৈশাচিকতা বলিউডের সিনেমার খলনায়কদের বিকৃতিকেও হার মানায়। মাফিয়ারা শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই করুণভাবে দৃশ্যপট থেকে বিদায় নেয়। দেশবাসীও চায় এরশাদ শিকদার আর যেন বলতে না পারে, 'আমার কিছুই হবে না'।

জনতার রুদ্ধরোষ থেকে বাচাঁর জন্য গত ১১ আগষ্ট '৯৮ তাকে গ্রেফতার করে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করালেও এখনো গুজব রয়েছে এরশাদ সিকদার হয়তো আইনের ফাঁকে বা রাজনৈতিক আশির্বাদে(!) বের হয়ে আসবে। ইতিমধ্যে খুলনা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে তাকে ৭ টি মামলায় মৃত্যুদন্ড ও ১টিতে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে ৪টি হত্যা মামলার বিচার চলছে। খুলনা সহ দেশবাসীর মনে প্রশ্ন - *কবে আওয়ামী গডফাদার এরশাদ সিকদারকে ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলানো হবে ? তাহলেই হয়তো শত শত নির্যাতিত পরিবার একটু তৃপ্তি পাবে এবং সম্ভ্রমহারা নারীরা মৃত্যুর আগে একজন ঘাতকের শাস্তি দেখার সুযোগ পাবেন। সেই সৌভাগ্য (!) হবে কি ? (জুন- ডিসেম্বর '৯৮, ইত্তেফাক/ প্রথম আলো/ জনকণ্ঠ/ ইনকিলাব/ সংগ্রাম)*

আবুল হাস্নাত আব্দুলাহ্
সাবেক চীফ হুইপ, আওয়ামী লীগ

অস্ত্র, পেশী-শক্তি আর ক্ষমতার প্রভাবকে জিম্মী করে দেশের বরিশাল ও ঢাকায় যুগপৎ সন্ত্রাসের মদদ দাতা হিসাবে যিনি বেশ পরিচিত তিনি হচ্ছেন আওয়ামী লীগ দলীয় চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুলাহ। নিজের নির্বাচনী এলাকা বরিশালে এই হাসনাত আব্দুলাহ এক ত্রাসের নাম। সকল প্রকার সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, খুন, চাঁদাবাজি রাহাজানি সহ বিবিধ অপকর্মের পিছনে আব্দুলাহর নাম বরিশালের সবার জানা। সাতটি কমান্ডিং জোনে ভাগ বরিশালে শহরের উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন সর্বময় ক্ষমতা। অপকর্মের তত্ত্বধানে সমন্বয়কারী নিয়োগ করেছেন তার শ্যালক "কেকে" কে। পানামা বাহিনী, মামা খোকন বাহিনী, কুতুব রানা বাহিনী, মোনায়েম বাহিনী, মিল্টন বাহিনী, আফতাব বাহিনী ও বাশার বাহিনী নামক ৭টি ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী গোটা বরিশাল শহরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে হাসনাত আব্দুলাহর এ সব বাহিনী নিমিষেই জেলার সকল বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে। "মুরগী চুরি থেকে মানুষ খুন" - সব কিছুরই আসামী জেলাতেই বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী। অথচ চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, লুট-পাট, দখলসহ এমন কোন কুকর্ম নেই হাসনাত বাহিনী এলাকায় করেনি।

হাসনাত আব্দুলাহ্র ত্রাসের রাজত্ব যেমন বরিশালে তেমনি রাজধানীতেও। তার পুত্রদের চাঁদাবাজি-সন্ত্রাস ও রাহাজানি রাজধানীর অনেক মানুষের ঘুম হারাম করে দেয়। বড় পুত্র সাদেক আবদুলাহ কলাবাগানের একটি বাড়ী জোর করে দখল করার পরও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিতে সাহস করেনি। গুলশানের জনৈক ব্যবসায়ীর ৩ কন্যাকে অপহরন করতে গিয়ে গভীর রাতে ক্যান্টনমেন্ট থানায় ধরা পড়লেও হাসনাত আব্দুল-াহ্র চাপে পুলিশ সাদেককে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। চাঁদাবাজি করতে গিয়ে সাদেক বার বার বলে এসেছে "আমি চীফ হুইপের ছেলে যাকে টার্গেট করি - তাকে শেষ করে ফেলি - টাকা রেডি রাখবি"। এমন কোন কুকর্ম নেই রাজধানীতে - আব্দুলাহ পুত্ররা করেনি। মেজ ছেলে আশিক আব্দুলাহ রাস্তায় চলাচলে পর্যন্ত কাউকে তোয়াক্কা করার প্রয়োজন মনে করে না। গত মার্চ (২০০০) মাসে বরিশাল থেকে সদরঘাট হয়ে আসার পথে ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়লে এই আশিক তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে পুলিশসহ বেশ কয়েকজন পথচারীদের বেদড়ক প্রহার করে। ছোট ছেলে মঈন আব্দুলাহ্ কলাবাগানে একটি ক্লিনিকের নার্সকে অপহরণ করে এবং ক্লাব দখল করে নেয়। রাজধানীর টপ-টেরদের সাথে আব্দুলাহর পুত্রদের রয়েছে বেশ ঘনিষ্টতা।

আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর থেকে আবুল হাসনাত আব্দুলাহর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় বরিশালে চলেছে নীরব সন্ত্রাস। শহরের প্রতিটি কমান্ডিং জোনের

দায়িত্বে যিনি আছেন তিনিই নিয়ন্ত্রন করেন এই এলাকার চাঁদাবাজি, ব্যবসা, সন্ত্রাস ও চোরাচালান। এরা বরিশালে মৃত্যু দেবতা আবদুলাহ্‌র স্থানীয় প্রতিনিধি। প্রতিটি কর্মকান্ডের তাৎক্ষনিক রিপোর্ট গড়ফাদার আবদুলাহ্‌র কাছে পৌছে দেয়া হয় এবং সাথে ভাগ-বাটোয়ারার অর্থ। শহরের প্রতিটি নারী-পুরুষ প্রতিনিয়ত: হাসনাত আবদুলাহ্‌র বাহিনীর নির্যাতন-নিপীড়ন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, রাহাজানি, লুট, দখল, খুন সহ অজানা নানা আশঙ্কায় দিনানিপাত করতে বাধ্য হচ্ছেন। *(১২-২২ জুন ২০০১, আজকের কাগজ)*

হাজী সেলিম

আওয়ামী নেতা, ঢাকা

রাজধানীর লালবাগ, কামরাঙ্গীরচর ও হাজারীবাগে কিংবদন্তীতুল্য ক্ষমতার অধিকারী আওয়ামী সাবেক সংসদ সদস্য হাজী সেলিম। পুরো নাম হাজী মোহাম্মদ সেলিম। এই এলাকাই তিনিই আইন, তিনিই আদালত। সংসদে ও সভা-সমাবেশে ঢাকাইয়া ভাষায় ভাষণ দেয়া (শুদ্ধ উচ্চারণ করতে না পেরে), হরতাল বিরোধী শান্তি (!) মিছিলের সামনে দাড়িয়ে অস্ত্র উচিয়ে বিরোধী দলকে ভয় দেখানো, সন্ত্রাসী দমনের নামে বিরোধী দলীয় নেতাদের ঘরে তালা মারা, নিজের বাড়ীতে আদালত বসানো, বুড়িগঙ্গা নদীর তীর দখল করা, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাকে পিটিয়ে অফিস থেকে বের করে দেয়া, সচিবালয় থেকে টেন্ডার ছিনতাই, বোরকা পরে ইডেন মহিলা কলেজে হামলা সহ আরো বহুবিধ কুকর্মের নায়ক এই হাজী সেলিম।

আলোচনা-সমালোচনায় থাকতে এবং চমক দেখাতে পছন্দ করেন সেলিম। এর উত্থানটাও অনেকটা চমক সৃষ্টি করে। চোরাই সিমেন্টের ব্যবসার মাধ্যমে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে নব্বইয়ের দশকে লালবাগে পরিচিত এই সেলিম চোরাই সেলিম নামে। এর আগে, সেলিম বুড়িগঙ্গার বিভিন্ন ঘাটের ইজারা ও সদরঘাট টার্মিনাল নিয়ন্ত্রনসহ চাঁদাবাজি করেই দিনানিপাত করতো। ঘাটের সন্ত্রাসী হিসাবে চোরাই সিমেন্টের ব্যবসার পর রাতারাতি সেলিম শুরু করে ফলের আড়ত, পাষ্টিক ইন্ডাষ্ট্রি, জুস ফ্যাক্টরী, বিশুদ্ধ পানি তৈরীর কারখানাসহ নামে-বেনামে নানা ব্যবসা (!)। ১৯৯৪ সালে রাজধানীর দু'টি ওয়ার্ডে সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত (!) হবার পর মেয়র হানিফের বিজয় মিছিলে গুলি করে ৭ জনকে খুন করে রাজনীতিতে তার অভিষেক। এই অপকর্ম ঢাকা দিতে '৯৬ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষ হয়ে লালবাগে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে নবধারায় শুরু করেন তার সন্ত্রাসী তৎপরতা।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষায় সেলিম পরিবারের দৌড়-ঝাপ খুবই সামান্য। ব্যক্তিগতভাবে সেলিমের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও রয়েছে এলাকার নানা রকম মুখরোচক কাহিনী। কেউ কেউ বলেন, ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত সর্বোচ্চ পড়ালেখা করেরেছেন এই সেলিম। আর

এই সেলিম সাংসদ নির্বাচিত হবার পর পরই ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের (মহিলা কলেজ) ছাত্রী হোস্টেল দখল করতে গিয়ে বোরকা পরে ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে বেশ আলোচিত হয়ে উঠেন। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের কোন দেশে বোরকা পরে মেয়েদের হল দখল করতে কোন পুরুষ অংশ নিয়েছে কিনা আমরা জানিনা। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও হাজী সেলিম সরকারী আনুকুল্যে আরো বেশী বেপরোয়া হয়ে উঠে। বিরোধী দলের হরতাল কর্মসূচী চলাকালে তার নির্বাচনী এলাকায় জোর করে দোকান-পাট খোলা রাখতে বাধ্য করা, বিরোধী দলীয় নেতাদের বাসায় তালা মেরে দেয়া, মেয়েদের হুমকি-ধমকি দিয়ে বিরোধী দলীয় পুরুষ কর্তাদের নিয়ন্ত্রন রাখা সহ সার্বিক কুকর্মে জড়িয়ে পড়েন এই সেলিম। এলাকার অর্ধশতাধিক ক্লাব প্রতিষ্ঠার নামে কয়েক শ' সন্ত্রাসী তৈরী করে তিনি তার এসব কুকর্ম চালান। সব ধরনের ক্লাব, সমিতি সহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের ঘোষিত-বেঘোষিত সভাপতি এই সেলিম। গত জানুয়ারী মাসে দলীয় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ডাঃ জালাল মহিউদ্দীনের একটি সভায় তাকে প্রধান বক্তা হিসাবে দাওয়াত না দেওয়ায় তার সন্ত্রাসীরা ঐ সমাবেশ গুলি-বোমা বর্ষণ করে পন্ড করে দেয়। শুধু তাই নয়, লালবাগ এলাকায় থানা প্রশাসনের সকল আদেশনামা হাজী সেলিমের অফিস থেকে অনুমোদন নিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। স্থানীয় সকল প্রকার সন্ত্রাসের বিচারের নামে তিনি তার সুদৃশ্য বাড়ীতে নির্যাতন সেলে বন্দী করে ক্যাডার বাহিনী দিয়ে অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়ন চালান। তার কথাই আইন, তার বাসায় আদালত (!)।

সর্বশেষ, গত বছরের শেষ দিকে তার তথাকথিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ডাকাতির অভিযোগে তার ক্যাডার বাহিনী চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়ক দিনব্যাপী অবরোধ করে রাখে। আর ১৪ জুন ২০০১ সালে দেশের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ের অভ্যন্তরে এই সেলিম নিজে সশস্ত্র দলীয় ক্যাডার নিয়ে উপস্থিত হয়ে ১০ কোটি টাকার টেন্ডার মাত্র ৪ কোটি টাকায় আদায় করে নিয়ে আসে।

মোটকথা সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, চোরাইপণ্য আমাদনী সহ নানাবিধ কুকর্মের নায়ক এই সেলিম। পুরানো ঢাকার মানুষ আজ এই সশস্ত্র সন্ত্রাসীর হাতে পুরোটাই জিম্মী। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সহ সকল কিছুরই নিয়ন্ত্রক এই চোরাই সেলিম। (১৩-১৬ জুন ২০০১, আজকের কাগজ)

ঢাকার রাজপথে প্রকাশ্যে আওয়ামী এমপি ডা. ইকবালের গুলিতে ঝরে পড়ে ৪টি
'ণ।
সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন

আওয়ামী দু:শাসনে দেশে সৃষ্টি হয় শত শত গডফাদার, মাফিয়াডন।
সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন
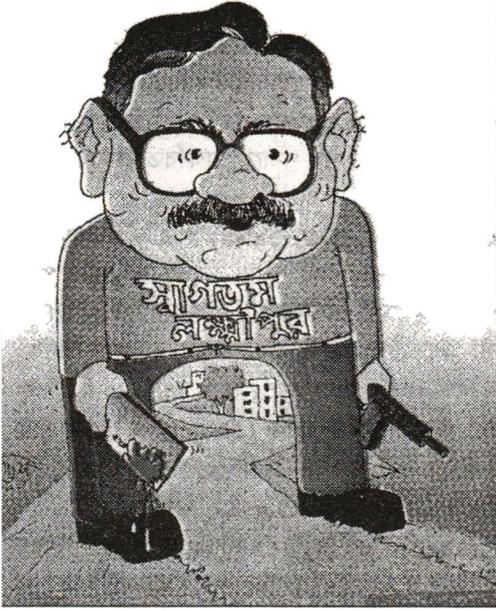
সৌজন্যে : দৈনিক সংবাদ

খবর : লক্ষ্মীপুরের কৃতি সন্তান (!) আওয়ামী লীগ নেতা লক্ষ্মীপুর পৌর চেয়ারম্যান আবু তাহেরের নৃশংসতার শিকার হাজার হাজার নিরীহ নাগরিক

দেশ বিনাশী চুক্তি

১৯৯৬ সনে ক্ষমতারোহনের পর আওয়ামী লীগ ভারতের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী **মৈত্রী (!) চুক্তি** মেয়াদোত্তীর্ণ বলে বাতিল ঘোষণা করে নানা ছদ্মাবরণে আবার তাদের সাথে অসংখ্য গোপন ও প্রকাশ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। যা ঐ ২৫ বছর মৈত্রী (!) চুক্তির চেয়েও বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য বেশী ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকর। নব পর্যায়ে স্বাক্ষরিত ঐ সব চুক্তির মধ্যে রয়েছে-

- **ভারত-বাংলাদেশ ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানিচুক্তি (১৯৯৬) ঃ** এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরও চুক্তির মেয়াদ কালে বাংলাদেশ গঙ্গা-পদ্মায় নির্দিষ্ট পরিমান পানি পায়নি। বরং ভারতপন্থী পত্র-পত্রিকায়ই দেখা গিয়েছে যে, ঐ সময় অর্থাৎ শুকনো মৌসুমে পদ্মার হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নীচ দিয়ে ট্রাক-গরুর গাড়ী চলছে, ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে।
- **ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমন চুক্তি (১৯৯৮)ঃ** এ চুক্তির ধারা অনুযায়ী ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্যের স্বাধীনতাকামীদের তৎপরতা দমনে (যেমন-উল্ফা -ULFA) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকতে পারবে।
- **ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি (১৯৯৯)ঃ** এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারত থেকে শত শত পণ্য আমদানী করলেও ভারত বাংলাদেশের মাত্র ২৫টি পণ্যের উপর থেকে ট্যারিফ তুলে নিতে অস্বীকার করে।
- **ভারত নেতৃত্বাধীন আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক জোট ও উপ-জোট গঠনের বিভিন্ন চুক্তি** (যেমন-বিস্টেক, বিমসটেক, গ্রোথ-কোয়াড্রাঙ্গল চুক্তি ইত্যাদি)।
- **ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ও বিনিময় চুক্তি।**
- **পার্বত্য-চট্টগ্রাম 'শান্তি চুক্তি' (১৯৯৭)ঃ** এ চুক্তিটিতে ভারত সরাসরি জড়িত না থাকলেও এর ধারাগুলো বাংলাদেশে ভারতের মদদপুষ্ট পার্বত্য-চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী চাকমা শান্তিবাহিনীর ইচ্ছানুসারে ও ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই হয়েছে বলে অনুধাবন করা যায়। চুক্তিটি পুরোপুরিই দেশের স্বার্থ, অখন্ডতা ও সংবিধানের (৩৬, ৪২ নং ধারা, তৃতীয় অনুচ্ছেদ) পরিপন্থী।
- বিদেশী কোম্পানীগুলোর সাথে **আত্মঘাতি ও অলাভজনক তেল গ্যাস চুক্তি।**
- বিভিন্ন যোগাযোগ চুক্তি যা ভারতের সাথে করতে চেয়েছিল- ট্রানজিটের নামে করিডোর চুক্তি, পরিবর্তিত এশিয়ান হাইওয়ে চুক্তি, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহার চুক্তি, রেল ও সড়ক যোগাযোগ চুক্তি প্রভৃতি।

ভারতের আধিপত্যবাদ যেন মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে তার জন্য সম্মিলিতভাবে উপমহাদেশের সাতটি শরিক ছোট-বড় রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পারিক সাহায্য সহযোগীতার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সার্ক (SAARC) নামক এক সহযোগীতামূলক জোট গঠন করা হয়। সার্ক নামক আঞ্চলিক জোটটি ১৯৮০ সালে রূপ লাভ করে এবং উপ-

মহাদেশের সাতটি রাষ্ট্রের নানাবিধ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সমাধানে ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে পারস্পারিক সহযোগীতা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক দারুণ আশার সঞ্চার করে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠলে আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন ভারত পাকিস্তানকে কৌশলে বাদ দিয়ে বাংলাদেশসহ সার্কের জোটভূক্ত অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে বিভিন্ন রকমের উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৭৪ সনে হিমালয় পাদদেশীয় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য সিকিম'কে স্থানীয় সিকিমী কুইসলিং বা মীর জাফরীরূপী লেন্দুপ দর্জিদের সহযোগীতায় দখল, হিমালয় কন্যা নেপাল ও ভূটানকে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে সম্পূর্ণরূপে ভারত নির্ভর করার পর বাংলাদেশকে হজম করার নিমিত্তে সার্ককে কাফন পরিয়ে ভারত উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন করেছে। যার পরিবর্তিত রূপায়ন হচ্ছে ১৯৯৭ এর শেষাংশে স্বাক্ষরিত "বিসটেক" নামক এক ষড়যন্ত্রের বিষফোঁড়া। এ উপ-আঞ্চলিক জোট সাধারণ হিসাবে একটি নিতান্ত সহযোগীতামূলক চুক্তি হিসাবে প্রতিভাত হলেও এর বাস্তবায়নের মধ্যে প্রথমেই সার্কের বিলুপ্তি ও ক্রমে চুক্তিভূক্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রয়ত্তের (বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটান) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং সিকিমের মত তিনটি নতুন প্রদেশের সৃষ্টি হবে।

যোগাযোগ চুক্তি

(i) **ট্রানজিট**- ভারতের প্রস্তাবিত ট্রানজিট সুবিধাবলীর আওতায় বাংলাদেশের ভূমির উপর দিয়ে সড়ক, রেল ও নৌপথে পশ্চিমাঞ্চল থেকে অথবা মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তম বন্দর থেকে আনীত মালামাল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দূরবর্তী সাতটি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরাসরি প্রেরণের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের বেনাপোল, হিলি প্রভৃতি স্থল বন্দর দিয়ে ভারতীয় পণ্য অবাধে প্রবেশ করবে। ভারতের ট্রানজিট প্রস্তাবের আওতায় ভারত সমুদ্র পথে আনীত তার মালামাল ও পণ্য প্রথমে চট্টগ্রাম বন্দরে খালাস করে তা স্থানীয়ভাবে গড়ে তোলা নিরাপদ এবং সুপরিসর ওয়্যারহাউসে মজুদ করবে এবং পরে তা বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে ত্রিপুরায় যাবে। আওয়ামী সরকার প্রাণঘাতি ট্রানজিট চুক্তি করতে তৎপর হলেও এদেশের আপময় জনতার চাপে তা ক্ষণিকের জন্য স্থগিত হয়ে আছে। তবে ১৯৬৫ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া বনগাঁ-বেনাপোল রেল যোগাযোগ ও ঢাকা- কলিকাতা সড়ক যোগাযোগ পুনরায় শুরু করেছে।

(ii) **এশিয়ান হাইওয়ে** ঃ অক্টোবর (১৯৯৬) - এর প্রারম্ভে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে 'Asian Highway" তে যোগদানের মাধ্যমে ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের ঘোষণা পুনরাবৃত্তি করেন। তবে ট্রানজিট ও চট্টগ্রাম বন্দর ইজারা' প্রশ্নে জাতি যখন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে তখন ধুরন্ধর কূটনীতিক গুজরাল ও ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ট্রানজিটের স্থলে 'Asian Highway' ও Trans-Asian Railway' র কথা বলতে শুরু করে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া 'Asian

Highway' র নামে এশিয়ার বৃহত্তর শক্তি চীনকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভারতকে সুবিধা প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। যে কোন সচেতন ও চোখ-কান খোলা মানুষই স্বীয় দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার চেতনায় 'Asian Highway' বাস্তবায়নের উদ্যোগকে খুব সহজেই 'ট্রানজিট বাস্তবায়ন চুক্তি' বা 'নবায়নকৃত গোলামি চুক্তি' উদঘাটন করতে সক্ষম।

তেল-গ্যাস চুক্তি

তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ এক সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র বাংলাদেশের ২৩টি গ্যাস ক্ষেত্রে প্রায় ২৩ ট্রিলিয়ন ঘণফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে যার মধ্যে ১৩ ট্রি. ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন যোগ্য। এর মধ্যে আবার ৩ ট্রি. ঘনফুট গ্যাস ইতিমধ্যে উত্তোলন করে ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের সামান্য অংশেই এই গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। এইভাবে ব্যবহার চলতে থাকলেও যদি নতুন কোন গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কৃত না হয় তবে মজুদ গ্যাস ২০১৭ সালে নিঃশেষ হয়ে যাবে। বাংলাদেশ সরকার এই গ্যাস ভারতে বিক্রির জন্য পাঁয়তারা করে দেশ ও জাতির নিকট বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছে। এছাড়া গ্যাস উত্তোলনের জন্য বিভিন্ন কোম্পানীর (যেমন-ইউনোকল) সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী তাদের নিকট থেকে কয়েকগুন বেশী টাকা দরে গ্যাস ক্রয় করে ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লোকসান দিচ্ছে। বাপেক্স ইতিমধ্যে তাদের নিকট ১ হাজার কোটি মার্কিন ডলার ঋণী হয়ে পড়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি

- আওয়ামী সরকার ১৯৯৭ সালের ১৩ মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনীর সঙ্গে প্রথম বৈঠক করে এবং একই বছরের ২ ডিসেম্বর 'শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙ্গালীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করা হয়েছে।
- স্থানীয় বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থাগুলিতে বাঙ্গালীরা কোনকালে প্রাধান্য যাতে না পায়, সে ব্যবস্থা পাকাপোক্তভাবে করা হয়েছে। বাঙ্গালীরা সেখানে নিজ দেশে পরবাসী।
- সংবিধানে কোন এলাকাকে বিশেষ অধিকার দেয়ার বিধান নেই। অথচ আওয়ামী সরকার কথিত 'শান্তি চুক্তি' -এর মাধ্যমে পার্বত্য-চট্টগ্রামকে বিশেষ অধিকার দিয়ে স্পষ্টত: সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন।
- দেশের সংবিধান অনুযায়ী যে কোন নাগরিক যেকোন এলাকায় জমি কিনতে পারবে। অথচ ঐ কালো চুক্তিতে বলা হয়েছে, পার্বত্য এলাকায় জমি কিনতে হলে চাকমাদের অনুমতি লাগবে- যা সুস্পষ্ট বাংলাদেশের সংবিধান লঙ্ঘন।

গঙ্গার পানি বন্টণ চুক্তি

ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে বাংলাদেশের বৃহত্তর ৮টি জেলা মরুকরণের প্রক্রিয়ায় পড়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলিতে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করেছে। যার বিষময় ফলে সুন্দরবনের বৃক্ষরাজীও হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এগুলির হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন মনে না করে শুধুমাত্র ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী আওয়ামী সরকার ১৯৯৬ সালে ১২ ডিসেম্বর ৩০ বছর মেয়াদী প্রহসন মূলক গঙ্গার পানি চুক্তি করে বাংলাদেশের জনগণকে ধোকা দেয়। শুষ্ক মৌসুমে কমপক্ষে ৩৫ কিউসেক পানি দেয়ার কথা থাকলেও কার্যত দেখা গেছে চুক্তির পরে শুষ্ক মৌসুমে একদিনও নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি গঙ্গা নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়নি। পানির পরিমাণ এতই কম আসে যে পদ্মার উপর নির্মিত হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নীচ দিয়ে গরুর গাড়ী পার হয়, জেগে ওঠা চরের উপর ক্রিকেট খেলা চলে নিয়মিত। এই চুক্তিতে কোন গ্যারান্টি ক্লজ নেই।

বাংলাদেশ -অর্থনীতির চালচিত্র

বাংলাদেশের অর্থনীতি কেমন চলছে- এ প্রশ্ন প্রায়ই উত্থাপিত হয়। ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে দাবী করা হয় অর্থনীতি যথাযথ দিক নির্দেশনায় এগিয়ে চলছে। সরকারের গৃহীত কর্মসূচী সাফল্যজনকভাবে দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিচ্ছে। অপরদিকে সরকারের সমালোচকরা বলেন ভিন্ন কথা। তারা অর্থনীতির বিভিন্ন নেতিবাচক দিক উল্লেখ করে আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সরকারের ব্যর্থতার নানা দিক তুলে ধরেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ যে সুবিস্তৃত দারিদ্র এ ব্যাপারে সবাই একমত। একটা সময় ছিল যখন এদেশের মানুষ ছিল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ। দরিদ্র বিশ্বের লোকজন ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এদেশে ছুটে আসত। কিন্তু দুই শতকের উপনিবেশিক শাসন সে চিত্রকে পাল্টে দিয়েছে। পরবর্তী অর্ধশতকের দু'বার স্বাধীনতা লাভ এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার বড় ধরণের কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ এখনো দরিদ্র সীমার নীচে। এক চতুর্থাংশের বেশী মানুষ একেবারেই হত দরিদ্র।

পূর্ববর্তী সরকারগুলোর মতই বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরও প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল দারিদ্র্য বিমোচনকে। এ লক্ষ্যে সুষম বন্টন সম্বলিত মূল্যস্ফীতিহীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়। ৫ বছরের সময় শেষে সে লক্ষ্য কতটুকু পূরণ হয়েছে তা মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

বস্তুতঃ দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি এমন নয় যে, ইচ্ছা করলেই তা দূর করা যাবে। দারিদ্র্য দূর করে সমৃদ্ধি আনার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ৫ বছর সময় সে কর্মসূচীর সাফল্য পরিমাপের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে এ সময়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন সম্ভব।

যে কোন দেশের অর্থনীতি কতগুলো মৌলিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এ সব কাঠামোর দুর্বলতা বা বিপর্যয়ের প্রভাব পড়ে অর্থনীতিতে। আর অর্থনীতির ভাল মন্দ ব্যক্তির জীবনে দুর্ভোগ বা সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। ফলে ব্যক্তি জীবন থেকে দারিদ্র্য দুর করতে হলে অর্থনীতির মৌলিক কাঠামোগুলোকে সচল ও গতিময় রাখতে হয়। বাংলাদেশ - অর্থনীতির সেসব মৌল কাঠামোগুলোর অবস্থা কি ? সমষ্টিক অর্থনীতির সুচকগুলো থেকে অর্থনীতির অবস্থা সম্পর্কে কি ধরনের ইঙ্গিত আমরা পেতে পারি? অর্থনীতির শংকা সৃষ্টির কোন কারণ এখন বিরাজ করছে কিনা? এসব বিষয়ে আলোকপাত করা বর্তমান নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

একটি দেশের অর্থনীতির প্রধান সুচক হিসাবে বিবেচনা করা হয় স্থুল দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিকে। প্রতি বছর দেশের মোট উৎপাদন বা আয় কি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির চিত্রে দেখা যায়। সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার প্রভাব পড়ে স্থুল দেশজ উৎপাদনের উপর। প্রতি বছর বাজেট ঘোষণা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা থাকলে আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থা ক্রটিপূর্ণ হয়। এর প্রভাব পড়ে জনজীবনে। একই সাথে এর প্রভাব পড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অন্যান্য সূচকের উপর।

বস্তুতঃ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা এবং দেশের উন্নয়নের জন্য কোন্ কোন্ খাত থেকে রাজস্ব আদায় করবে এবং কোন কোন খাতে তা ব্যয় করবে তা নির্ধারণ করে বাজেটে। সরকার যদি দেশের দরিদ্র জনসাধারণ ব্যবহার করে-এমন পণ্যের উৎপাদন বা আমদানীর উপর কর শুল্ক আরোপ করে অথবা বৃদ্ধি করে তাহলে তার শিকার হয় সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী। আর যদি অপেক্ষাকৃত ধনীদের ব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদন বা আমদানীর উপর শুল্ক-কর আরোপ করে তার প্রভাব পড়ে ধনীদের উপর।

অপরদিকে সরকার আদায়কৃত রাজস্ব এমন উন্নয়নশীল খাতে যদি ব্যয় করে যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে এর সুফল পৌছে তাহলে সেই উন্নয়ন কর্মসূচী দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হয়। আর উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থ চুরি বা অপচয় হলে তার সুফল গরীব মানুষের কাছে পৌছেনা।

দেশের ২০০০-২০০১ অর্থবছরের বাজেটে ২৪ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের কর্মসূচী ছিল। এ রাজস্বের সাড়ে ৭৫ শতাংশ আসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের খাত থেকে। রাজস্ব বোর্ড যে রাজস্ব আদায় করে তার সড়ে ৫৭ শতাংশ আসে বিদেশ পণ্য আমদানীর খাত থেকে। এর মধ্যে আমদানী শুল্ক থেকে ৩২ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) থেকে সাড়ে ২০ শতাংশ এবং সম্পূরক শুল্ক থেকে সাড়ে ৫ শতাংশের মত শুল্ক আসে।

পণ্য বা উপকরণ আমদানীর ক্ষেত্রে যে রাজস্ব আদায় করা হয় তা চূড়ান্তভাবে প্রদান করতে হয় ভোক্তা সাধারণকে। সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য তেল, দুধ, মশলা বা এধরনের ভোগ্য পণ্যের উপর যে শুল্ক নেয়া হয় তা সরাসরি ভোক্তাদের উপর পড়ে। আবার কাঁচামাল আমদানীর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে তৈরী পণ্যের ক্ষেত্রেও আমদানী পর্যায়ের শুল্ক সাধারণ ভোক্তাদের উপর পড়ে। একইভাবে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ের আবগারী শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর বা সম্পূরক শুল্কও ভোক্তাদের দিতে হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে সরকারের যে রাজস্ব আদায় হয় তার ৮৪ শতাংশই হল পরোক্ষ কর-যা শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের উপর পতিত হয়। এই পরোক্ষ কর আদায়ে বিগত ৫ বছরের বাজেটে যে

পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছে তাতে দরিদ্র মানুষের উপর রাজস্বের বোঝা বেড়েছে। গ্রামের দরিদ্র মানুষ কেরোসিন ব্যবহার করে। একজন হতদরিদ্র মানুষ এক কেজি কেরোসিনে যে মূল্য পরিশোধ করে তার ৬০ শতাংশই হল সরকারকে প্রদত্ত রাজস্ব। একইভাবে গ্রামের যে সাধারণ মানুষটি কাঁচা সাবান ব্যবহার করে তাতে ব্যবহৃত কাঁচামাল সোপ নুডুলস আমদানীর উপর উচ্চ হারে শুল্ক রয়েছে। গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ চিনি ব্যবহার করে। ১ কেজি আমদানীকৃত চিনিতে ক্রেতাকে ১২ টাকা বা এক তৃতীয়াংশের বেশী শুল্ক দিতে হয়।

এভাবে দেখা যায়, আমাদের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থায় দরিদ্র ও নিম্ন বিত্তের মানুষের কাছ থেকেও প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা হয়। আয়কর হিসাবে যে প্রত্যক্ষ কর সরকার আদায় করে তার পরিমাণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্বের ১৬ শতাংশের মত। এধরণের কর ভোক্তার উপর চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ থাকে না বলে এ করকে ধনীদের কর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। উন্নত দেশগুলোতে রাজস্ব আদায়ের একটি বৃহৎ অংশ আসে প্রত্যক্ষ কর থেকে। আমাদের দেশে সে অবস্থা নেই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের খাতের বাইরেও সরকারী সেবার ব্যাপারে যে কর বা ফি ধার্য রয়েছে তার একটি গড় অংশ দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর পড়ে।

অপরদিকে যে সব কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের অনিয়ম ও দূর্নীতির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান লোকসান দিচ্ছে বা মুনাফা কমে যাচ্ছে, তার সুফল বিত্তবানদের কাছে গেলেও এ লোকসানের কারণে সাধারণের উপরই করের বোঝা বৃদ্ধি পায়।
সরকারের রাজস্ব আদায়ের সকল খাতকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে- দেশের ২০ শতাংশ আয় যারা করে তাদেরকে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ রাজস্বের যোগান দিতে হচ্ছে। গত ৫ বছরের বাজেট প্রস্তাবে এ অবস্থার গুণগত পরিবর্তন তো হয়নি। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে এর অবনতি ঘটেছে। সাধারণ নিম্নবিত্তদের উপর এধরণের রাজস্বের বোঝা চাপিয়ে রেখে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার গুণগত মান উন্নয়ন দুরুহ হয়ে দাঁড়ায়।

সরকারের বাজেটের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় ব্যবস্থাপনাকে বিশ্লেষণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে গরীব বিরোধী চিত্র খুজে পাওয়া যায়। সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের একটি বড় অংশ যায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাবদ। এক্ষেত্রে দূর্নীতির অবকাশ থাকে কম। মেরামত, সংরক্ষণ ও বিবিধ খরচ খাতে যে অপব্যয় ও দূর্নীতি হয় তার সিংহভাগ পৌঁছে অধিক বেতনধারীদের কাছে। এরপরও সরকারের রাজস্ব খাতের যে ব্যয় হয় তাতে পুকুর চুরির মত ব্যপকহারে দূর্নীতির সুযোগ থাকে না। কিন্তু উন্নয়ন বাজেটের অবস্থা একেবারেই ভিন্ন। রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে যতটা অডিট বা চেকের ব্যবস্থা থাকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা থাকে না।

প্রতিবছর রাজস্ব ব্যয়ের খাতে যে বরাদ্দ থাকে তার প্রায় সম পরিমাণ বরাদ্দ থাকে উন্নয়ন কর্মসূচীতে। সহস্রাধিক প্রকল্পে প্রতিবছর এখন ১৭/১৮ হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থের বড় অংশ অপচয় ও চুরি হচ্ছে। ১০ কোটি টাকার একটি রাস্তা নির্মাণের প্রকল্পে দেখা যায়, কর্মকর্তা, ঠিকাদার ও সন্ত্রাসী মাস্তানদের সমঝোতার মাধ্যমে ৩০/৪০ শতাংশ অর্থ ভাগাভাগি হয়ে যায়। বাস্তব কাজ করতে গিয়ে দিতে হয় আরো নানা ধরণের বখ্‌রা। কাজের বিল পেতেও দিতে হয় কমিশন। আবার কোন কোন প্রকল্পে দেখা যায়, যাদের জন্য প্রকল্প নেয়া হচ্ছে তাদের কল্যাণে ১০ থেকে ২০ শতাংশ ব্যয় হচ্ছে। বাকী অর্থ যাচ্ছে দেশী-বিদেশী পরামর্শক, গাড়ী আমদানী ও বেতন ভাতা বাবদ। এভাবে উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয়ের বড় অংশ হয়ে যায় চুরি বা অপচয়। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, উন্নয়ন প্রকল্পের ২৫ শতাংশ ব্যয় হয় যাদের জন্য এ প্রকল্প নেয়া হয় তাদের উদ্দেশ্যে। বাকী অর্থ অপচয়, লুটপাট ও দূর্নীতির মধ্য দিয়ে চলে যায় স্বদেশী বিত্তবান বা বিদেশীদের কাছে। এতে দেখা যায়, দেশের মানুষের জন্য ১৮ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পে বাস্তবে কার্যকর ব্যয় হয় চার থেকে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। দেখা যায় সরকারের আয়ের একটি বড় অংশ নিম্ন বা মধ্যবিত্তদের কাজ থেকে নেয়া হচ্ছে। অপরদিকে দূনীতি, লুঠপাট, অপচয় ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যয়ের সিংহভাগ যাচ্ছে বিত্তবানদের কল্যাণে। গত ৫ বছরের বাজেট ও সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করলে এ চিত্রই পাওয়া যায়।
বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন ভারসাম্য দেশের অর্থনীতির একটি মৌল সূচক। বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের ভারসাম্য গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমাদের অর্থনীতিতে কি ঘটছে তার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন বা আগমন নির্গমনের ভারসাম্যে অনেকগুলো বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে। এতে দেশের রপ্তানী আয় ও আমদানী ব্যয়, রেমিটেন্সের অন্তঃ ও বহিঃপ্রবাহ, মূলধনের আগমন-নির্গমন, প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ, পোর্টফোলিও বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ সহায়তার অন্তঃ ও বহিঃপ্রবাহ ইত্যাদি চিত্র পাওয়া যায়।

গত ৫ বছরে আমদানী রপ্তানীর চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সময়ে দেশের রপ্তানী আয় দিয়ে ৬১ থেকে ৬৯ শতাংশ পর্যন্ত আমদানী ব্যয় মিটানো সম্ভব হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ঘাটতি পূরণ হয় বৈদেশিক অনুদান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের মাধ্যমে।

গত ১ দশকের রপ্তানী বাণিজ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সময়ে পাট, চা-এর মত ঐতিহ্যগত পণ্যের আমদানী হ্রাস পেয়েছে - যেগুলোতে ৮০ থেকে শত ভাগ পর্যন্ত মূল্য সংযোজন হয়। অপরদিকে পোশাক খাতের রপ্তানী আয় বাড়তে বাড়তে এর অংশ ৭৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এ খাতে স্থানীয় মূল্য সংযোজন গড়ে ৩০ ভাগের বেশী নয়। এধরনের পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার একেবারেই স্পর্শকাতর। রেয়াতী সুবিধার উপরে নির্ভরশীল বাংলাদেশী পোশাকের বাজার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিরীয় ও সাব সাহারান দেশগুলোকে অধিক সুবিধা দানের একটি সিদ্ধান্তেই হুমকির মুখে পড়ে গেছে। গত কয়েক মাসে এতে রপ্তানী আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। রপ্তানী আয়ের এধরনের দুর্বল ও স্পর্শকাতর ভিত্তি আয়ের আকস্মিক পতনের আশংকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করেছে।

বিগত ৯০ এর দশকের প্রথমার্ধের শেষ পর্যায়ে আমদানী উদারীকরণের পদক্ষেপ নেয়ার পর আকস্মিকভাবে বাংলাদেশের বাজার উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এতে বাংলাদেশের বাজারের বড় সুবিধা লাভ করে প্রতিবেশী ভারত। অন্যদিকে বাংলাদেশ বাণিজ্য উদারীকরণের সুবিধা ভারতকে দেয়ার পরও সে দেশের বাজার বাংলাদেশী পণ্যের জন্য পায়নি। বাংলাদেশকে তার পণ্যের রপ্তানীর বাজার খুঁজে নিতে হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকায়। এতে দেখা যায়, যারা আমাদের রপ্তানী বাজার সুবিধা দিচ্ছে তাদের পণ্য আমাদের দেশে আমদানী হচ্ছে না। আমাদের দেশে যে দেশের পণ্য আমদানী হচ্ছে সে দেশের বাজারে আমরা পণ্য রপ্তানীর সুযোগ পাচ্ছি না। এ পরিস্থিতি একদিকে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুবিধা গ্রহণের কারণে তাদের চাপের মুখে রেখেছে, অন্যদিকে আমাদের বিশাল বাজার শর্তহীনভাবে প্রতিবেশী ভারতের কাছে উন্মুক্ত করে রাখতে হয়েছে। বার বার দাবী জানানো সত্ত্বেও ভারত বাংলাদেশী পণ্যকে টারিফ সুবিধা দিতে রাজী হচ্ছে না। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের এ অসম চিত্রের বড় রকমের সূচনা হয় এবং বিগত ৫ বছরে তা আরো বিস্তৃত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বা এফডিআই এর আগমন বাংলাদেশে খুব একটা সুখকর নয়। সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাগুলো আমাদেরকে বলছে, অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হলে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এশিয়ার যে সব দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করেছে তারা ব্যপকভাবে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করেছে। আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকরা মনে করেছেন, বিদেশী বিনিয়োগ আসলেই দেশের অটোমেটিক উন্নয়ন হয়ে যাবে। এশিয়ার যেসব দেশ বিদেশী বিনিয়োগের সুবিধা গ্রহণ করেছে তারা কিভাবে এ বিনিয়োগকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন করেছে তা আমরা বিচার বিশ্লেষণ করিনি। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য আমরা হিসাব নিকাশ না করে সকল দ্বার

উন্মুক্ত করে দিয়েছি। ফলে বিদেশী বিনিয়োগ আমাদের দেশে যত না সম্পদ সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে বেশী সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল বা ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করে তাদের এমন সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে যে তারা একদিকে দীর্ঘমেয়াদী কর অবকাশ পেয়েছে অপরদিকে রপ্তানী আয় বাংলাদেশে আনার বাধ্যবাধকতা থেকে তাদের রেহাই দেয়া হয়েছে। ফলে ইপিজেডগুলোতে যে বড় বড় বিদেশী বিনিয়োগের হিসাব দেখা যায়, তাতে কিছু লোকের কর্মসংস্থান ছাড়া আর কোন উপকার বাংলাদেশের হচ্ছে না। এমনকি ইপিজেড এর রপ্তানী আয়ের বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে ফিরেও আসছে না।

অন্যদিকে, কাফকোর মত এমন বিদেশী বিনিয়োগও আমরা গ্রহণ করেছি- যেখানে বাংলাদেশকে প্রতিদিন ৭২ লাখ টাকা ভর্তুকী দিয়ে গ্যাস সরবরাহ করতে হচ্ছে। বিনিময়ে কিছু লোকের কর্ম সংস্থান ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। জ্বালানী খাতের বিনিয়োগেও একই চিত্র দেখা যায়। এসব বিনিয়োগের মুনাফাসহ পুঁজির যখন ব্যাপক বহিপ্রবাহ শুরু হবে তখন বাংলাদেশ বড় ধরনের সংকটে পড়ে যাবে। এ ব্যাপারে সরকারের নীতি নির্ধারকরা সতর্কবাণীকে তেমন একটা আমলে নেয়ার প্রয়োজন মনে করছেন না।

শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে ১৯৯৬ সালে। মাড়োয়ারীরা ১ লাখ ডলারের বিনিয়োগ নিয়ে এসে স্বল্প সময়ে ১ কোটি ডলার নিয়ে ফিরে গেছে। মাঝখানে দেশের নিম্ন মধ্যবিত্তের সারা জীবনের সঞ্চিত মূলধন শেষ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈদেশিক ঋণের আরেকটি দিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণ পেত সহজ শর্তে। এক/দেড় শতাংশ সুদ ও ৩০ বছরের দীর্ঘ মেয়াদে তা পরিশোধ করতে হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রেয়াতী ঋণের প্রবাহ হ্রাস পেয়ে বাণিজ্য ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলছে। এর মধ্যে নগদ প্রাপ্তির সুযোগ নেয়ার জন্য সরকার অধিক ব্যয় সম্বলিত সরবরাহকারীর ঋণের দিকে ঝুকে পড়েছে। এর প্রতিক্রিয়া এখনই দেখা যাচ্ছে না। তবে কয়েক বছর পর যখন এর কিস্তি সুদে-আসলে পরিশোধ করতে হবে তখন ঋণের বোঝা ক্রমেই বাংলাদেশের জন্য দুর্বহ হয়ে পড়বে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্ণর সাম্প্রতিককালে এ ব্যাপারে সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে স্থুল দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিকে সমষ্টিক অর্থনীতির মুখ্য সূচক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ অব্যাহতভাবে জিডিপি'র

প্রবৃদ্ধি আকাঙ্খিত হারে হলে তাকে গতিশীল অর্থনীতির লক্ষণ বলে মনে করা হয়। তবে যারা অথনৈতিক পরিস্থিতিকে আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে চান তারা কোন্ কোন্ খাতে উৎপাদন বাড়ছে দেশের মানুষের উপর, কর্মসংস্থানের উপর, টেকসই উন্নয়নের উপর এর কি প্রভাব পড়ছে তাও খতিয়ে দেখতে চান।

১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এক দশকের বিশ্ব অর্থনীতির ধারার মধ্যে তেমন পরিবর্তন আসেনি। বলা যায় বিশ্ব অর্থনীতি ছিল একই ধারায় প্রবাহমান। বাংলাদেশে এ সময়ে দুটি সরকার ক্ষমতায় ছিল। প্রথমার্ধে ছিল বিএনপি এবং দ্বিতীয়ার্ধে আওয়ামী লীগ। বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে দু'দলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় দলই ক্ষমতায় যাবার আগে এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করেছে। সুতরাং পুরো ৯০ এর দশক এবং এই দশকের দুই অর্ধে অর্থনীতিতে কি অবস্থা বিরাজ করেছে বা করছে তা মূল্যায়ন করা যায়।

১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৫ বছরে বাংলাদেশে জিডিপি'র গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৬৪ শতাংশ। দশকের প্রথম ৫ বছরের অধ্যায় শুরুর পূর্ববর্তী ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৩ শতাংশ। ভিত্তি বছরের তুলনায় বিবেচ্য ৫ বছর সময়ে গড়ে প্রতিবছর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১.৩৪ শতাংশ হারে বেড়েছে। অন্যদিকে ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত ৫ বছরে জিডিপি'র গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৪৯ শতাংশ। পূর্ববর্তী ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৬ শতাংশ। অর্থাৎ ৯০ এর দশকের শেষার্ধে ৫ বছর ভিত্তি বছরের তুলনায় গড়ে ০.৮৮ শতাংশ অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

১৯৮৬-৮৭ অর্থবছর থেকে ১৯৯০-৯১ অর্থবছরের গড় প্রবৃদ্ধির সাথে পরবর্তী ৫ বছরের গড় প্রবৃদ্ধি তুলনা করা হলে দেখা যায়, ৯০ এর দশকের প্রথমার্ধের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পূর্ববতী ৫ বছরের তুলনায় ০.৭২ শতাংশ বেশী। দশকের শেষ ৫ বছরের গড় প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী ৫ বছরের গড় প্রবৃদ্ধি থেকে ০.৮৫ শতাংশ বেশী। ভিত্তি বছরের সাথে তুলনা করা হলে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় *গত ৫ বছরে গড়* অগ্রগতি আগের ৫ বছরের তুলনায় অনেক কম হয়েছে। অপর দিকে পূর্ববর্তী ৫ বছরের সাথে তুলনা করা হলে দুই অগ্রগতি প্রায় অর্ধের কাছাকাছি।

উপরে জিডিপি'র যে হিসাব করা হয়েছে তা হল স্থানীয় মুদ্রা টাকার মানে। ডলারের মানে মাথাপিছু জাতীয় আয় বা জিডিপি'র হিসাবে প্রকৃত ও টেকসই চিত্র পাওয়া যায়। বিএনপি সরকারের ৫ বছরে (১৯৯১-১৯৯৬) মাথাপিছু জাতীয় আয় ২৮৫ মার্কিন ডলার থেকে ২০.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৩ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। অপরদিকে আওয়ামী লীগের ৫ বছরে (১৯৯৬-২০০১) মাথাপিছু জাতীয় আয় ১২.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি

পেয়ে ৩৮৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। একইভাবে বিএনপি'র ৫ বছরে মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯.৭১ শতাংশ। অপরদিকে আওয়ামী লীগের ৫ বছরে ডলারের হিসাবে মাথাপিছু জিডিপি বেড়েছে মাত্র ১০.৪৭ শতাংশ।

অর্থনীতিতে যে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় তা এক ধরনের ধারাবাহিকতার ফসল। নব্বই-এর দশকের প্রথম থেকে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ধারা শুরু হয় তা বলা যায় ২০০১ অর্থবছর পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। তবে জিডিপি'র এই প্রবৃদ্ধিকে আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে কতগুলো চিত্র বেরিয়ে আসে। চলতি দশকের প্রথমার্ধে জিডিপি'র যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার প্রধান ভিত্তি ছিল শিল্প খাত। অপরদিকে শেষার্ধের প্রবৃদ্ধির ভিত্তি ছিল কৃষি খাত। ৯০ দশকের প্রথম ৫ বছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি হয় গড়ে ১.৭৩ শতাংশ। শেষার্ধে এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয় ৪.৯ শতাংশ। অপরদিকে শিল্প খাতে প্রথমার্ধে .৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। শেষার্ধের ৫ বছর শিল্প খাতে গড় প্রবৃদ্ধি হয় ৬.৭ শতাংশ। কৃষিতে অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে বিদেশ নির্ভরতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায়। একই সাথে দেশের দরিদ্র কৃষক ও কৃষিজীবিদের আর্থিক সামর্থ বৃদ্ধি পায়। এর প্রভাব পুরো বাজারের উপর পড়ে। দশকের প্রথমার্ধে কৃষিতে সাফল্য আসেনি। আমাদের দেশের প্রকৃতি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থায় আবহাওয়ার উত্থান পতন কৃষিজ ফলনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বিবেচ্য সময়ে আবহাওয়া কৃষিজ ফলনের অনুকুল ছিল না। কৃষির উপকরণ সরবরাহেও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে সার্বিকভাবে আবহাওয়া কৃষির অনুকুল ছিল। ১৯৯৮ সালের বন্যার ফলে আমন ধান মার খেলেও পরবর্তী বোরো ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাম্পার ফলন ঘটেছে। ফলে শেষার্ধের কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল আকর্ষনীয় কিন্তু যে হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা সরকারীভাবে দাবী করা হচ্ছে বাস্তব অবস্থার সাথে এর মিল পাওয়া যায় না। বলা হচ্ছে, ১৯৯৯-০০ অর্থবছরে দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্যের বাইরে আরো সাড়ে ১০ লাখ টন বাড়তি উৎপাদন হয়েছে। ২০০০-০১ সালে এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন গড়ে ২১ লাখ টন বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ হিসাবে গত ২ অর্থবছরে ৩২ লাখ টনের বেশী খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকার কথা। অথচ এ সময়ে ৮৬ লাখ টন খাদ্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে আমদানী করা হয়েছে। চাল বা গম এমন খাদ্যশস্য নয় যা আমদানী করে গুদামজাত করে রাখা যায়। সঙ্গত কারণেই সৃষ্টি হয়েছে সরকার যে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হবার দাবী করছে বাস্তবে তা হয়েছে কিনা। আর খাদ্য শস্যের উৎপাদন যদি বেশী হিসাব করে প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাহলে সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও যথার্থ হবে না। জিডিপি'র শুধু কৃষি খাতই নয়, মৎস্য ও বনজ খাতে গত কয়েক বছর যে প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হচ্ছে তা বাস্তবে হয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

নব্বই-এর দশকের প্রথমার্ধে শিল্প খাতে যে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে তা বেশ কমে গেছে। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের প্রধান ক্ষেত্র হল শিল্প খাত। শিল্প খাতে যত দ্রুত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় অন্য খাতে তা সম্ভব হয় না। শিল্পায়নের জন্য কয়েকটি শর্তের উপস্থিতি অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। প্রথমতঃ আভ্যন্তরীণ বা অর্থনৈতিক বাজার। দ্বিতীয়তঃ অনুকুল পরিবেশ তথা ইতিবাচক আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ও অবকাঠামো সুবিধা। তৃতীয়তঃ সস্তা শ্রম প্রাপ্তি। চতুর্থতঃ অর্থায়নের সুবিধা।

১৯৯৪ সালে আকস্মিকভাবে শুল্ক হ্রাস বা বাণিজ্য উদারীকরণের পদক্ষেপ নেয়ার পর বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজার বিদেশী পণ্যের জন্য একেবারেই উম্মুক্ত হয়ে পড়ে। দশকের দ্বিতীয়ার্ধেও এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায় অনেকগুলো স্থানীয় শিল্প অসম প্রতিযোগিতার মুখে রুগ্ন হয়ে পড়ে। আর বাংলাদেশের বাজারের বিরাট অংশ প্রতিবেশী ভারতীয় পণ্যের দখলে চলে যায়। আভ্যন্তরীণ বাজার হারিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করার মত শক্তি বাংলাদেশী শিল্পগুলোর ছিল না। জিএসপি ও কোটাসহ কিছু রেয়াতী সুবিধা প্রাপ্ত পোশাক খাত ছাড়া অন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বাজারে উল্লেখ করার মত স্থান করে নিতে পারেনি।

সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও অন্যান্য আইন শৃংখলা বিরোধী তৎপরতা গত দশকের শুরু থেকেই কম বেশী ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে এসে তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সাম্প্রাতিক বছরগুলোতে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি শিল্পায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসাবে কাজ করেছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, বন্দর ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার তাৎপর্যপূর্ণ কোন উন্নতি সাধন পুরো দশকেই ঘটেনি। অধিকন্তু শেষার্ধে এসে বিদ্যুৎ ও বন্দর সংকটের অধিকতর অবনতি ঘটেছে।

সস্তা শ্রম পাবার সুবিধার ব্যত্যয় বাংলাদেশে কোন সময় ঘটেনি। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা দেশে হয়নি।

শিল্পায়নে অর্থের যোগান দানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পের অর্থায়নের দুই প্রতিষ্ঠানিক উৎস হল শেয়ার বাজার ও ব্যাংকিং খাত। ১৯৯৬ সালের বিপর্যয়ের পর শেয়ার বাজার শিল্পে অর্থের যোগান দানের ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত হাতে গুণা স্বল্প সংখ্যক কোম্পানী বাজারে প্রাথমিক শেয়ার ছেড়েছে। যারা শেয়ার ছেড়েছে তারাও বাজার থেকে তেমন একটা সাড়া পায়নি। নীতি নির্ধারকদের প্রতি অবিশ্বাস শেয়ার বাজারকে অর্ধমৃত করে রেখেছে এখনো পর্যন্ত। ব্যাংকিং খাত শিল্পায়নে অর্থের যোগান দানের ক্ষেত্রে গত দশকে কম বেশী ভুমিকা পালন করেছে। তবে বিপুল অংকের খেলাপী ঋণের বোঝা নিয়ে বৃহৎ ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ বড় অংকের ঋণ দানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এছাড়া

খেলাপী ঋণ গ্রহিতাদের নতুন ঋণ প্রদানে সরকারী নিষেধাজ্ঞা কারণে অনেক উদ্যোক্তা এর জালে আটকে গিয়ে নতুন ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ হারিয়েছেন। এসব কারণে সার্বিকভাবে গত দশকের শেষার্ধ ছিল শিল্প খাতের জন্য নৈরাশ্যজনক। এ খাতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপর এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ডলারের হিসাবে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতে বিএনপি'র ৫ বছরে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪৯.২৫ শতাংশ। আওয়ামী লীগ সরকারের গত ৫ বছরে শিল্প খাতে জিডিপি বেড়েছে মাত্র ২১.১৮ শতাংশ। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ খাতে বিএনপি'র ৫ বছরে জিডিপি বেড়েছিল ২৬.২২ শতাংশ। এ খাতে আওয়ামী লীগের ৫ বছরে জিডিপি বেড়েছে ৭.৯৯ শতাংশ। নির্মাণ খাতে বিএনপি'র ৫ বছরে ডলারের হিসাবে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫০.৫১ শতাংশ। আওয়ামী লীগের ৫ বছরে এ খাতে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪০.৭৩ শতাংশ।

বাংলাদেশের জিডিপি'র অর্ধেকের মত আসে সেবা খাতসমূহ থেকে। এর মধ্যে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা, পরিবহণ যোগাযোগ ও হিমাগার, ব্যাংক-বীমা, রিয়েল এস্টেট হাউজিং ব্যবস্থা, কমিউনিটি ও সোসাল সার্ভিস এবং জনপ্রশাসন অন্যতম। এর মধ্যে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা বহুলাংশে কৃষি উৎপাদন দ্বারা প্রভাবিত হয়। রিয়েল এস্টেট ব্যবস্থার বিকাশ নির্ভর করে উচ্চবিত্তের আর্থিক উন্নতির ওপর। প্রথমোক্ত খাতের অবস্থা দশকের প্রথমার্ধে মোটামুটি ভাল ছিল। শেষের অর্ধে উৎপাদন বাড়ায় প্রবৃদ্ধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। শেষোক্ত খাতে গত ১ দশক ধরে ৯ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এটি দেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ভাল অবস্থার ইঙ্গিতবহ বলে প্রতীয়মান হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় প্রশ্ন হল মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি'র যে প্রবৃদ্ধি তার সুফল সমাজের কোন শ্রেণী পাচ্ছে। গত ১ দশক ধরে গড়ে ৫ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাদ দিলে মাথা পিছু জিডিপি এ সময়ে ৩ শতাংশের বেশী বেড়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী (নতুন পদ্ধতি) ১৯90 অর্থবছরে মাথা পিছু জাতীয় আয় ২৮৫ মার্কিন ডলার থেকে ১৯৯৬ অর্থবছরে ৩৩৪ ডলার এবং ২০০১ অর্থবছরে ৩৮৭ ডলারে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ ১১ বছরের ব্যবধানে মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়েছে ৩৬ শতাংশের মত। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৫-৮৬ সালে ৫৫.৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করত। ১৯৯১-৯২ সালে এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে তা ৪৭.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত ছিল। ১৯৯৯ সালে দারিদ্রের হার নেমেছে ৪৪.৭ শতাংশে। মাথাপিছু জাতীয় আয় যেখানে ১০ বছরে ৩৬ শতাংশ বেড়েছে সেখানে একই সময়ে দারিদ্র কমেছে সোয়া ৬ শতাংশ। এ অবস্থার মূল কারণ হল সম্পদ বন্টনে বৈষম্য। জাতীয় আয় যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বাড়ছে মূলত: উচ্চবিত্তের জন্য। নিম্নবিত্ত বা হতদরিদ্রদের প্রকৃত আয় বাড়ছে না। বিদ্যমান সম্পদ নতুন সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টি করে। ব্যাংক ও অন্যান্য আধুনিক খাত ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা দেয় বিত্তবানদের। ক্ষুদ্র ঋণ দাতা এনজিওরাও নিম্ন মধ্যবিত্ত ও উচ্চ নিম্নবিত্ত

পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছে। যারা একবারেই হতদরিদ্র তাদের কাছে পৌছা এনজিওগুলোর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে সরকার জিআর, টিআর, ভিজিডি, ভিজিএফ ও কাজের বিনিময়ে খাদ্যের মত কিছু নিরাপত্তাবেষ্টনীমূলক কর্মসূচী নিয়েছে। এসব কর্মসূচী হতদরিদ্রদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে, অবস্থার উন্নয়নের জন্য নয়।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমতঃ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে তা বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক অগ্রগতির যে চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে তা প্রশ্নের উর্ধে নয়। তৃতীয়তঃ দেশে যে মাথাপিছু আয় বাড়ছে তা ধনীদের আয় বাড়ার কারণে হচ্ছে, দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধির জন্য নয়। চতুর্থতঃ জাতীয় আয় বৃদ্ধি হলেও সম্পদ বন্টনে বৈষম্যের কারণে দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। পঞ্চমতঃ আইন শৃংখলার অবনতি ও সুশাসনের অভাব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে। ষষ্ঠতঃ বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দারিদ্র দূর করা কার্যকরভাবে সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখন যে অবস্থা বিরাজ করছে তার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সম্পদের ব্যবহারকে দরিদ্রমুখী করে তাদের অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা। কার্যকরভাবে এটি করা সম্ভব হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে একই হারে দারিদ্র কমবে। ইসলাম হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে উপার্জনে নৈতিক সীমা রেখা টেনে, জাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনীর সম্পদকে দরিদ্রমুখী করার মাধ্যমে এবং দরিদ্র ও অসহায়ের প্রতি দান খয়রাতকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ও মানুষকে কর্মমুখী ও আয়-উপার্জনে উৎসাহিত করে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান ভারসাম্যের মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে। এতে একজন মানুষ এমন দরিদ্র হয়ে থাকতে পারে না যাতে তার মৌলিক প্রয়োজন অপূরনীয় থেকে যায়। আবার দেশের সম্পদরাজী স্বল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে কেন্দ্রিভূত হবারও সুযোগ থাকে না। এমন একটি ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে রাষ্ট্রের রয়েছে অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব।

সমষ্টিক অর্থনীতির সূচক অর্থ বছর ঃ ১৯৯১/৯২-২০০০/০১

খাত/উপখাত	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/২০০০	২০০০/০১
জিডিপি চলতি বাজার মূল্যে (কোটি টাকা)	১১৯৫৪২	১২৫৩৬৯	১৩৫৪১২	১৫২৫১৮	১৬৬৩২৪	১৮০৭০১	২০০১৭৭	২১৯৬৯৭	২৩৭০৮৬	২৫৮০৬৮
জিডিপি স্থির মূল্যে (কোটি টাকা)	১৩৯২০০	১৪৫৫৬৮	১৫১৫১৪	১৫৮৯৭৬	১৬৬৩২৪	১৭৫২৮৫	১৮৪৪৪৮	১৯৩৪২৯	২০৪৯২৮	২১৭৩০৬
জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার (%) (স্থির মূল্যে)	৫.০৪	৪.৫৭	৪.০৮	১২৭২০	১৩৬২২	১৪৫৩৮	১৫৮২৪	১৭১৫০	১৮২৭০	১৯৬৩২
মাথাপিছু জিডিপি (টাকা) (চলতি মূল্যে)	১০৫৫১	১০৮৫৫	১১৫০৫	১২৭২০	১৩৬২২	১৪৫৩৮	১৫৮২৪	১৭১৫০	১৮২৭০	১৯৬৩২
জিডিপি (কোটি ডলারে)	৩১৩৩.৪৭	৩২০৩.০৯	৩৩৮৫.৩০	৩৭৯৩.৯৮	৪০৭২.৫৭	৪২৩১.৮৭	৪৪০৩.৩৬	৪৫৭১.৩০	৪৭১২.৫০	৪৮৫৩.৬৩
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%) ডলার	১.১৬	২.২২	৫.৬৮	১২.০৭	৭.৩৪	৩.৯১	৪.০৫	৩.৮১	৩.০৮	২.৯৯
মাথাপিছু জিডিপি (ডলারে)	২৭৭	২৭৭	২৮৮	৩১৬	৩৩৪	৩৪০	৩৪৮	৩৫৭	৩৭৭	৩৮৭
ডলার টাকার বিনিময় হার	৩৮.১৫	৩৯.১৪	৪০.০০	৪০.২০	৪০.৮৪	৪২.৭০	৪৪.৮৬	৪৮.০৬	৫০.৩১	৫৩.১৭
জিডিপি'র তুলনায় % হার										
সঞ্চয়										
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৩.৮৬	১২.৩০	১৩.১০	১৩.১৩	১৪.৯০	১৫.৯০	১৭.৪১	১৭.৭১	১৭.৮৮	১৮.৭৬
জাতীয় সঞ্চয়	১৯.৩০	১৭.৯৬	১৮.৭৯	১৯.১২	২০.১৭	২১.৫৮	২১.৭৭	২২.৩১	২৩.১০	২৩.৭৮

মোট বিনিয়োগ	১৭.৩১	১৭.৯৫	১৮.৪০	১৯.১২	১৯.৯৯	২০.৭২	২১.৬৩	২২.১৯	২৩.০২	২৩.৬৩
সরকারী	৬.৯৭	৬.৪৮	৬.৬৫	৬.৭৪	৬.৪২	৭.০৩	৬.৩৭	৬.৭২	৭.৪১	৭.৯১
খাত/উপখাত	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/২০০০	২০০০/০১
বেসরকারী	১০.৩৩	১১.৪৭	১১.৭৬	১২.৩৮	১৩.৫৮	১৩.৭০	১৫.২৬	১৫.৪৭	১৫.৬১	১৫.৭২
ভোগ	৮৬.১৪	৮৭.৭০	৮৬.৯০	৯৩.৮৭	৮৫.১০	৮৪.১০	৮২.৫৯	৮২.২৯	৮২.১২	৮১.২৪
বাজেট										
মোট রাজস্ব	৭.৯৬	৮.৮২	৯.০৭	৯.৩২	৯.৩৩	৯.৪৯	৯.৩৮	৮.৯৭	৯.০০	৯.৩৮
কর রাজস্ব	৬.৪৭	৭.২০	৭.৩০	৭.২৪	৭.৩৫	৭.৭৯	৭.৪৯	৭.২২	৭.১২	৭.৪৭
মোট ব্যয়	১২.৭৪	১৩.৫৪	১৩.৮৫	১৫.১৩	১৪.২২	১৩.৮৪	১৩.৫২	১৫.১১	১৬.০১	১৬.৬১
সার্বিক বাজেট ঘাটতি	৪.৭৮	৪.৭২	৪.৭৮	৫.৮১	৪.৮৯	৪.৩৫	৪.১৪	৬.১৪	৭.০১	৭.২৩
আমদানী	১১.২২	১২.৭০	১৩.৩১	১৫.৫০	১৬.৯০	১৬.৯৩	১৭.০৯	১৭.৫৪	১৭.৮৩	-
রপ্তানী	৬.৩৭	৭.৪১	৮.০৫	৯.২১	৯.৫৫	১০.৪৮	১১.৭৬	১১.৬৫	১২.২৩	১৩.০৮
মূল্যস্ফীতির হার	৪.৫৬	২.৭৪	৩.২৮	৮.৮৭	৬.৬৫	২.৫২	৬.৯৯	৮.৯১	৩.৪১	১.৫৯
বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (মিঃ মার্কিন ডলার)	১৬০৮	২১২১	২৭৬৫	৩০৭০	২০৩৯	১৭১৯	১৭৩৯	১৫২৩	১৬০২	১৩০৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অর্থ বিভাগ

এক বছরের কম)

হিলা প্রতি মোট ফার্টিলিটি হার, ২০০০

র্ভ নিরোধ ব্যবহারের হার (%) ২০০০

আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশ ঃ ক্রমাবনতিশীল আর্থনৈতিক পরিস্থিতি

আপাত বাহ্যিক দিক দিয়ে জোড়াতালি ও গোঁজামিল দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে আওয়ামী লীগ সরকার একটি প্রবৃদ্ধিশীল এবং অবস্থাসম্পন্ন দেখানোর চেষ্টা করলেও খোদ সরকারী হিসেবেই দেশের অর্থনীতির ক্রমাবনতিশীল চিত্র ফুটে ওঠে। গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের ১৯৯৯ সালের (জুন) মাসে প্রকাশিত 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা' (অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়)-এর তথ্য থেকে দেখা যায়, আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের GDP (Gross Domestic Products) বা গড় জাতীয় উৎপাদন ক্রমেই নিম্নগামী হয়ে চলেছে। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার বছর প্রথম জাতীয় বাজেটে যেখানে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯৬-৯৭-এ ছিল ৫.৯%, ১৯৯৭-৯৮-এ তা ৫.৭%-এ দাঁড়ায় এবং ১৯৯৮-৯৯-এ মাত্র ৪.৪%-এ নেমে আসে। শেষোক্ত হিসেবটি বিশ্ব ব্যাংক-এর উৎস হতে প্রকাশিত সাম্প্রতিক 'এশিয়া উইক' থেকে নেয়া। ঐ একই উৎস থেকে দেশের মুদ্রাস্ফীতির ক্রম-উর্ধ্বগামিতার চিত্র দেখা যায়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে যেখানে দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল মাত্র ৩. ৯%, পরের বছর ১৯৯৭-৯৮ সালে তা ৭.০%-এ উন্নীত হয় এবং ১৯৯৮-৯৯-এ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৮%-এ দাঁড়ায় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৯)। বিশ্ব ব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জিডিপি'র সাথে সাথে দেশের মানুষের মাথাপিছু গড় আয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে অবনতির দিকে। গত তিনটি অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথপিছু আয় G.N.P (Nom) ৩১০-৩৩০ মার্কিন ডলার থেকে (নভেম্বর, ২০০০) তা ২৯৯ মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে। প্রতিক্রিয়াশীল জাতি-বিধ্বংসী আওয়ামী সরকারের শাসনামলে দেশের ছোট-বড় কল-কারখানা শিল্প স্থাপনা দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়েছে। বিদেশী বিশেষ করে বৃহত্তর আগ্রাসী প্রতিবেশী ভারতের বাণিজ্যিক আগ্রাসনের মুখে বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের হাজার হাজার শিল্প স্থাপনা, মিল, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং দেশের শিল্পোৎপাদন দারুণভাবে কমে যাচ্ছে। দেশের পাট শিল্প সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। দেশের বর্তমানকালের অর্থনীতির মূল চালিকা গার্মেন্টস শিল্পও প্রচন্ড চাপ ও হুমকির মুখে। আওয়ামী লীগের ভারতমুখী ত্রুটিপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্যনীতির ফলে আমাদের গার্মেন্টস শিল্প উল্লেখযোগ্য হারে বৈদেশিক রপ্তানী কোটা হারিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ থেকে প্রকাশিত ১৯৯৯ সালের 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' থেকে দেখা যায়, দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প-বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন উভয় ক্ষেত্রেই দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি দারুণ নিম্নাভিমুখী। ১৯৯৫-৯৬ সালে দেশের গড় শিল্পোৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৩ ভাগ; ১৯৯৬-৯৭ তা ৩.৫%-এ নেমে আসে এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে তা দাঁড়ায় মাত্র ২.২% ভাগে।

আওয়ামী সরকারের শাসনামলে দেশের প্রান্তিক ক্ষুদ্র কুটির শিল্প-নির্ভর উদ্যোক্তাদের অবস্থা সবচেয়ে বেশী শোচনীয় হয়ে গেছে। ব্যর্থ দুর্নীতিপরায়ণ লুটেরা আওয়ামী শাসনের বিগত পাঁচ বছরে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মেরুদন্ড সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অবাধ সস্তা ও বাহ্যিক চাকচিক্যময় পচা ভারতীয় পণ্যের বল্গাহীন আমদানীকে সরকারী প্রশ্রয় ও মদদ্দানের ফলে বাংলাদেশের গরীব তাঁতীরা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তারা তাঁদের হাজার হাজার কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। তাঁরা এখন অসহায় হয়ে পথে বসেছে। দেশের মাঝারি এবং ছোট ব্যবসায়ীদেরও ঐ একই অবস্থা। এককথায়, দেশের শিল্প উৎপাদনের অবস্থা চরম দুর্বল ও ভঙ্গুর।

আওয়ামী সরকার দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ফাঁকা বুলি আওড়ালেও খাদ্যদ্রব্যের ক্রম-উর্ধ্বগতি, মাছ-গোশ্ত ও তরিতরকারির অগ্নিমূল্য এবং ভোজ্যতেল, দুধ, ডিমসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দুর্লভ্যতা আওয়ামী সরকারের তথাকথিত স্বয়ম্ভরতার অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রকটিত করে তুলেছে। সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের F.P.M.U-এর তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৯৯৬-৯৭ সালে যেখানে দেশে সর্বসাকুল্যে ৯৬৭ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানী কারতে হয়। আওয়ামী শাসনের পরবর্তী দু'টি অর্থবছরে অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে তা কয়েক গুণ বেড়ে যথাক্রমে ১৯৫১ হাজার মেট্রিক টন এবং ৫৪০৬ হাজার মেট্রিক টনে দাঁড়ায়।

দেশের অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতির মূল চালিকা বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতও আওয়ামী সরকারের অদূরদর্শিতা, অপরিপক্কতা ও সর্বগ্রাসী দুর্নীতির ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। বিদেশী মাফিয়া বহুজাতিক কোম্পানীর নব্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী বিভিন্ন বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর সাথে যোগসাজশ্ করে আওয়ামী লীগ দেশের একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ন্যাচারাল গ্যাস অত্যন্ত অলাভজনক উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তি (P.S.C) -র মাধ্যমে বিদেশী কোম্পানীসমূহের কাছে তুলে দেয়ার চক্রান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে। পরিহাসের বিষয়, আমাদের দেশের সম্পদই নামমাত্র মূল্যে কিনে নিয়ে ঐ সব বিদেশী বহুজাতিক বেনিয়া কোম্পানীগুলো তা দ্বিগুণের চেয়ে বেশী মূল্যে আবার আমাদের কাছে বিক্রি করার উদ্যোগে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, আওয়ামী সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে এবং ভারত ও মার্কিন সরকারের নেপথ্য যোগসাজশে বাংলাদেশের মাত্র ১০/১২ ট্রিলিয়ন সিএফটি প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদকে ৪০/৫০ এমনকি কখনো কখনো ১০০ ট্রিলিয়ন সিএফটি সম্ভাব্য মজুদপ্রাপ্তির গোয়েবলসীয় প্রচার চালিয়ে দেশের ১৩ কোটি জনগণকে বিভ্রান্ত করে ঐ বেনিয়া বিদেশী কোম্পানীগুলো দেশের অত্যন্ত মহার্ঘ্য ও সীমিত প্রাকৃতিক গ্যাসকে ভারতে পাচার করে দেবার নীলনক্শা বাস্তবায়ন করে চলেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ শিল্প-স্থাপনা, কল-কারখানা ও অন্যান্য উৎপাদনমুখী প্রকল্প দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস-নির্ভর তাপবিদ্যুৎ

দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। আওয়ামী সরকার যখন ভারতে আমাদের অত্যাল্প অনবায়নযোগ্য বা 'নন-রিনিউএ্যাবল' (Non-Renewable) প্রাকৃতিক সম্পদ খনিজ গ্যাস রপ্তানীর অশুভ পাঁয়তারায় রত তখন গত ৪ ডিসেম্বর ২০০০ দেশে লোডশেডিংয়ের রেকর্ড সৃষ্টি হয়। ঐ দিন দেশব্যাপী নজিরবিহীন প্রায় ৮০০ মেগাওয়াট পরিমাণ লোডশেডিং হয় এবং দেশের ৩টি বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৬টি ইউনিটের মধ্যে ১২টিই বন্ধ হয়ে পড়ে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়াও প্রলম্বিত লোডশেডিং এখন দেশের অতি পরিচিত নাগরিক দুগর্তি ও অর্থনৈতিক শোচনীয়তার পরিচায়ক।

বাংলাদেশের চমৎকার আল্লাহ প্রদত্ত বিনিয়োগ উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থান থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী সরকারের দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও দেশের অত্যন্ত হিংসাত্মক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের হার কমিয়ে দিয়েছে। খোদ আওয়ামী সরকারের সমর্থক বলে পরিচিত 'থিংক ট্যাঙ্ক' (Think Tank) অধ্যাপক রেহমান সোবহান পরিচালিত 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ' (সিপিডি) প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায়, বর্তমানে দেশের বিদেশী বিনিয়োগ খাতে চরম মন্দা চলছে। জিপিডি ও ইউপিএল-এর যৌথভাবে প্রকাশিত ঐ রিপোর্টে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনীতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেশের প্রখ্যাত আওয়ামী ঘরানার অর্থনীতিবিদ ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের লেখা প্রবন্ধ 'Recent Trends in Bangladesh Economy, 1999' -তে দেখা যায়, ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে যেখানে বাংলাদেশে ৩২০.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশী নীট ইনভেস্টমেন্ট হয়, পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গিয়ে ২৬২.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। পরের অর্থবছরে তা আরো কমে গেছে। এমনকি অনেক বিদেশী বিনিয়োগকারী দেশের বর্তমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে তাদের বিনিয়োগ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেয়ারও উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানা গেছে। ডক্টর ভট্টাচার্যের ঐ একই প্রবন্ধ থেকে দেখা যায়, আওয়ামী শাসনামলে দেশের আমদানী ও রপ্তানী অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই চরম নেতিবাচক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে দেশে মাত্র ৫.১৫% ভাগ আমদানী বৃদ্ধি হয় এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে তা খুবই অল্প বেড়ে ৬.৪৬% বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ঐ একই অর্থবছরদ্বয়ে অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ ও ১৯৯৮-৯৯ সালে দেশের রপ্তানী অর্থনীতির অবস্থা আরো করুণ অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে দেশের রপ্তানী বাণিজ্যে যেখানে গড় ১৬.৮২% ভাগ প্রবৃদ্ধি ঘটে পরের বছর তা মাত্র ৩.০%-এর চেয়েও নীচে নেমে যায়। এ সব অবস্থা দেশের অর্থনীতির বর্তমানের বন্ধ্যাত্বকেই প্রকটিত করে প্রকাশ করে। সিপিডি'র ঐ রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, দেশের অর্থনীতি বিপুলাংশে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর হয়ে পড়ছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে বাংলাদেশকে মোট ১৬৬১.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৯৭-৯৮ সালে ১৭৯০.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে ২৬৪৮.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশী আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয় এবং ঐ সকল অর্থবছরে যথাক্রমে ১৪৮১.২৩

মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ১২৫১.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৫৩৬.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থের বাস্তব যোগান দেয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, জাতি আজ বিপুল পরিমাণের বৈদেশিক ঋণে ন্যূজ ও তার সুদের অর্থ পরিশোধের ভারে জর্জরিত। উপরোক্ত আলোচনা ও পরিসংখ্যান থেকে আওয়ামী শাসনামলে দেশের অর্থনীতিক অবস্থার চরম দেউলিয়াত্ব এবং করুণ অসহায়তার চিত্র ধরা পড়ে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্মরণকালের সর্বনিম্নস্তরে নেমে গেছে। বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশী টাকার বিনিময় হার মার্কিন ডলারের নিরিখে রেকর্ড হিসাব ১৯ বার অবমূল্যায়ন বা ডিভ্যালুয়েশন করা হয়। মাত্র পাঁচ বছর আগে যে ১ মার্কিন ডলারের মূল্য ৪০ টাকা ছিল তা আজ ৫৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে। আওয়ামী সরকার বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানীর হারও সর্বকালের সর্বনিম্নে দাঁড়িয়েছে। আওয়ামী সরকার বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসার পর পরই দেশের স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে বিরাট বিপর্যয় ও ধস্ নামে। ১৯৯৮ সালে ভারতের দুরাচার ফটকাবাজিরা কলিকাতার এজেন্টদের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রামের স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে কৃত্রিম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বাংলাদেশের গরীব ও ক্ষুদ্র হাজার হাজার বিনিয়োগকারীর প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। সংবাদ পত্রিকান্তরে জানা যায়, ঐ স্টক এক্সচেঞ্জ জালিয়াতি ও বিপর্যয়ের চক্রান্তে ভারতীয় র‍্যাকেটিয়ার্সদের সঙ্গে আওয়ামী সরকারের কোন কোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর যোগসাজশও ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে যে অর্থনীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে তা পুরোপুরি বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, এডিপি প্রভৃতি সংস্থার মর্জিমাফিক ও ইচ্ছায় তৈরী ও বাস্তবায়িত হয়। পর-নির্ভরতা ও বৈদেশিক ঋণের শর্তের চাপে বাংলাদেশের সরকারসমূহ কোনই স্বাধীন অর্থনীতি প্রকল্প বা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

সৌজন্যে : দৈনিক দিনকাল

বর আওয়ামী দু:শাসনের পাঁচ বছরে টাকার অবমুল্যায়ণ হয় ১৮ বার। সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন
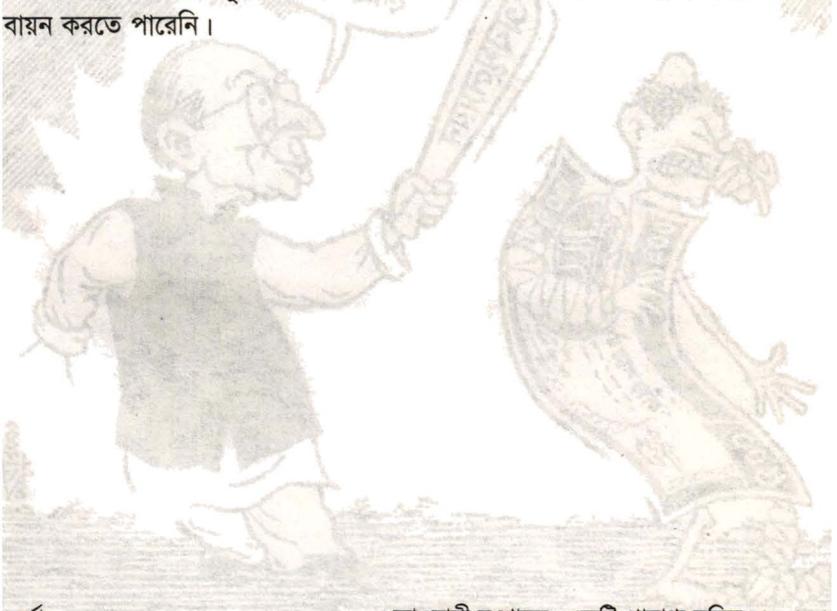
আওয়ামী শাসনামলে ভারতীয় আগ্রাসন

পূর্বকথা

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও অবস্থান তার তিনদিক ঘিরে থাকা বৃহৎ-প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের জন্য একটি ভূ-কৌশলগত কাঁটা-স্বরূপ। বাংলাদেশের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এশিয়ার উঠতি পরাশক্তি, অতীব উচ্চাকাঙ্খী এবং ততোধিক আগ্রাসী বৃহদাকার ভারতকে বিশেষ বেকায়দায় আটকে রেখেছে। পররাজ্যগ্রাসী বলে বিশ্বে কুখ্যাত ভারত বা হিন্দুস্তান বিগত মাত্র ক'দশকের মধ্যেই তার দূর্বল প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম, হায়দারাবাদ, গোয়া, দমন, দিউ, জুনাগড়, মানভাদর-এর পুরো এবং কাশ্মীরের দু'তৃতীয়াংশ শক্তিবলে নিজের ভূ-বুভুক্ষ উদরে প্রবিষ্ট করে নিয়েছে। হিমালয়-পাদদেশের পার্বত্য যমজ কন্যা বলে খ্যাত দূর্বলতর প্রতিবেশী নেপাল ও ভূটান ভূ-পরিবেষ্টিত হওয়ায় ভারত কৌশলে এ' রাষ্ট্র দু'টির স্বাধীন অস্তিত্বকেও ধীরে ধীরে অজগরের মত গ্রাস করে নিতে সচেষ্ট রয়েছে। ইতোপূর্বেই দেশ দু'টির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পররাষ্ট্র নীতি এবং অর্থনীতির প্রায় পুরোটাই ভারতের কব্জায় চলে গেছে। শুধু তাই নয়, সিকিম-খেকো ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বীপ রাষ্ট্র 'সিন্দুর-টিপ' 'শান্তির দ্বীপ'-বলে খ্যাত ক্ষুদ্রাকার শ্রীলঙ্কায়ও ভারত তার হিংস্র থাবার নখর বসিয়েছে। সেখানকার উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারি ভারত থেকে স্থানান্তরিত ও প্রতিস্থাপিত হিন্দু-ধর্মাবলম্বী তামিল ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীকে উস্‌কিয়ে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার মাধ্যমে "তামিল ইলাম" প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নগ্ন মদদদানের মাধ্যমে। সার্ক জোটের ক্ষুদ্রতম দ্বীপ-রাষ্ট্র মালদ্বীপেও ভারত ভাড়াটে নৌ-সেনার ছদ্মবেশে তার প্রশিক্ষিত আগ্রাসী বাহিনী পাঠিয়েছিল রাষ্ট্রটিকে কুক্ষিগত করার হীন মানসে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিলে ভারত কিন্তু ঐ মোক্ষম সুযোগে গ্রহন করে বাংলাদেশের মিত্র বা বন্ধু সেজে মুলত: জানি-দুশম প্রধান প্রতিদ্বন্দী ও শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিভক্তিকরণ (Disintegration) ও ধ্বংস সাধনে তার অতি কাঙ্খিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। পাকিস্তানের বিখন্ডিকরণ-প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের মাধ্যমে (১৯৭১) শুরু করা আগ্রাসন-প্রক্রিয়ার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭৫ সালে ভারত সিকিম দখল করে নেয় সে সময়েই নব্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্বাধীন বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় জেগে ওঠা অত্যন্ত গুরুত্ববহ কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিকগত দিক দিয়ে

মূল্যবান উপকূলীয় দ্বীপ দক্ষিণ-তালপট্রি দখল করে নেয় জোরপূবর্ক। আর এ'ভাবেই ভারত তার সব ক'টি প্রতিবেশী রাষ্ট্রেই তার জন্মের পর থেকেই বার বার নানাভাবে ঘৃণ্য ও হীন আগ্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

আধিপত্যবাদী আগ্রাসী রাষ্ট্র ভারত তথা তার ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রনায়করা কখনই উপমহাদেশের অন্যান্য স্বাধীন জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেনি। গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল থেকে নিয়ে ইন্দিরা-গুজরাল এবং বাজপাই সহ সকলেই মনে প্রাণে উপমহাদেশে এক বৃহত্তর 'অখন্ড ভারত' এর স্বপ্ন দেখে। স্বাধীন ভারতের তাত্ত্বিক রাষ্ট্রনায়ক প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ডিসকাভারি অব ইন্ডিয়া" - 'আসমুদ্র হিমাচল'-ব্যাপি ঐ স্বপ্নের 'অখন্ড ভারত'-এর রূপরেখা বিধৃত করে গেছেন বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যায়-যা বিশ্বের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে বহুল আলোচিত 'ইন্ডিয়া' ডক্ট্রিন' (India Doctrine) নামে খ্যাত। পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ সনে পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে রূপ দিয়ে এবং ১৯৭৫ সনে সিকিমকে পুরো গ্রাস করে নিয়ে নেহরুকন্যা ইন্দিরাগান্ধী তাঁর পিতার 'India Doctrine' কে 'Indira Doctrine' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের স্বপ্নের 'অখন্ড ভারত' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে আরো খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যান। নেহরু-ইন্দিরার India বা 'Indira Doctrine কে কোন কোন ভূ-রাজনীতিবিদ ও কৌশলবিদ 'বর্ধিত সীমান্ত মতবাদ' বা 'Extended Frontier Concept' বলেও উল্লেখ করেছেন। তাঁদের এ মতবাদ অনেকটা মার্কিন 'মনরো ডক্ট্রিন' (Monroe Doctrine) এর মতো।

'ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন'-এর মূলকথা হচ্ছে..."উপমহাদেশে ভারতই হবে মূল শক্তি, চালক বা নীতিনির্ধারক। এখানে অন্য কোন দেশই স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত নীতিনির্ধারণ করবে না বা অন্য কোন বহি:শক্তি উপমহাদেশের কোন রাষ্ট্রকেই ভারতের মতামত ছাড়া কোন বিষয়েই সাহায্য-সহযোগীতা বা চুক্তিভুক্ত করতে পারবে না। স্থানীয় সকল দক্ষিণ-এশীয় রাষ্ট্রকেই ভারতের মর্জিমাফিক চলতে হবে....."। আর 'বর্ধিত সীমান্ত মতবাদ' বা 'Extended Frontier Concept' অনুযায়ী "ভারতের ঐ 'ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন' হাসিলের জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ -যেমন নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানসহ অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহ, আফগানিস্তান, তিব্বত (চীনের প্রদেশ), মায়ানমার, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এমনকি দূরবর্তী ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ক্যাম্বোডিয়া, লাওস এবং পশ্চিমে ইরান পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগকে নিজের দখলে নিয়ে কিংবা পুরোপুরি স্বীয়

প্রভাব বলয়ভূক্ত করে নিজ রাষ্ট্রের বহি:সীমাকে প্রবর্ধিত করে দেবে....”। ভারত ১৯৭১-এ পাকিস্তানকে খন্ডিত করে, ১৯৭৫-এ সিকিম গ্রাস করে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে শ্রীলঙ্কার তামিল এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্রগ্রামের চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদদদানের মাধ্যমে তার ঐ বিঘোষিত 'ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন' ও 'Extended Frontier Concept' বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। একই পররাজ্যগ্রাসী আধিপত্যবাদী মনোবাসনা পূরণের অভিলাষে ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহে অন্তর্ঘাতমূলক অস্থিরতা বজায় রাখতে চক্রান্ত ও গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। একই উদ্দেশ্য সাধনে আগ্রাসী ভারত ঐসব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও নিরন্তর নাক গলাচ্ছে এবং স্বীয় গোয়েন্দা এজেন্সি সমূহের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের প্রচার মাধ্যম (রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্র ইত্যাদি), শিক্ষাব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান এমনকি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসনেও প্রভাব বিস্তারে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য আধিপত্যবাদী শক্তির মত ভারতও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে ছদ্মবরণের অসংখ্য এনজিও (N.G.O), সাহায্য সংস্থা, মিশনারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এসব এনজিও এবং সংবাদ মাধ্যমের সহযোগীতায় দেশটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে ব্যাপক প্রচার-প্রপাগান্ডার মাধ্যমে নিজেদের আদর্শ ও স্বার্থের অনুকূল এবং সমর্থক রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিবর্গকে ক্ষমতায় বসানোর সার্বিক প্রচেষ্টা চালায় এবং তার স্বার্থের পরিপন্থী স্বাধীনচেতা ও ভারতের আগ্রাসনের বিরোধী শক্তি ও ব্যক্তিবর্গকে অপপ্রচারের মাধ্যমে কোনঠাসা করে ধ্বংস করার চেষ্টা চালায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনাপতি ও দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষায় সচেষ্ট প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে একই কারণে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা R.A.W. (Research and analysis Wing) এর চক্রান্তে পরিচালিত এক সেনাবিদ্রোহে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে হীন প্রচার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ভারত তার স্থানীয় মদদপ্রাপ্ত বা নিয়োজিত সংবাদপত্রসমূহ, টিভি-রেডিও এবং এনজিও (N.G.O.) চক্রের মাধ্যমে। এক কথায়, ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে নিজের আগ্রাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চালিয়ে যাচ্ছে বহুমুখী সুসংঘবদ্ধ আগ্রাসন যুদ্ধ। আর ভারতের ঐ বহুমুখী আগ্রাসন-যুদ্ধের এক অন্যতম টার্গেট ১৩ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বিশ্বের তৃতীয়-বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাতটি রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মনিপুর, অরুণাচল,

নাগাল্যান্ড এবং মিজোরাম, যা' একত্রে 'সাতবোন রাজ্যমালা' (Seven-sisters States) নামে খ্যাত-সেগুলোর সাথে নিজের মূল বৃহত্তর অংশের সংযোগ রক্ষা, সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং পণ্য-পরিবহণ ব্যবস্থা চালু রাখার মাধ্যমে ঐ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্বীয় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্যই ভারত বাংলাদেশকে তার পদানত ও আজ্ঞাবহ করে রাখতে এত তৎপর। আর এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই ভারত ১৯৭১ এর পর থেকেই চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের দাবী, ট্রানজিট-করিডোর ও ট্রান্সশীপমেন্ট চুক্তি সম্পাদন, পার্বত্য-চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন, ৩০ বছরের গঙ্গার পানি-চুক্তি, বিসটেক, বিমসটেক, সাপটা ইত্যাদি হরেক রকমের চুক্তি-সম্পাদন এবং উপ-আঞ্চলিক জোটগঠনসহ ইত্যাদির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ'সবের পাশাপাশি ভারত চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের উপর নানা ধরণের নগ্ন আধিপত্যবাদী আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্রমূলক অনধিকার চর্চা। জন্মের পর থেকেই বাংলাদেশের অস্তিত্বের উপর ভারত শুরু করে তার ঐসব আগ্রাসী অপতৎপরতা-যার ধারা এখন আরো প্রকট ও নগ্নরূপ নিয়ে এদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের উপর এক প্রচন্ড হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বিজয়ের পর পরই "মিত্রবাহিনীর" কপট রূপ ঝেড়ে ফেলে ভারত পাকিস্তানী বাহিনীর ফেলে যাওয়া মহামূল্যবান অস্ত্র-শস্ত্রের সবকিছুই (যার মূল্য তৎকালীন প্রায় ৬০,০০০ কোটি রূপী) একতরফাভাবে চেটেপুটে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের শিল্পস্থাপনা, কলকারখানা, পুল-ব্রীজ ইত্যাদির লোহা-লক্কড়, কলকব্জা এমনকি নাটভল্টুও নিয়ে যায় ভারতীয় বাহিনী। ভারতীয় বাহিনীর এই হীন লুট-পাট ও তস্করবৃত্তিতে বাধা দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডর বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম এ জলিল। এর ফলে তৎকালীন মুজিববাদী সরকার ভারতের নির্দেশে তাকে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত তার নৌবাহিনী পাঠিয়ে বিপন্ন বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় জেগে ওঠা কৌশলগত দিক দিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দক্ষিণ-তালপট্রি একতরফাভাবে দখল করে নেয় বলপূর্বক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের উত্তরকালের বিগত তিন দশকের প্রায় সবসময়ই দেশটির উপর তার আগ্রাসী প্রতিবেশী তিনদিক দিয়ে ঘিরে থাকা দানবরাষ্ট্র ভারত নানা ধরণের আগ্রাসী অপতৎপরতা চালিয়ে যায়। এর মধ্যে স্বাধীন অস্তিত্বের সূচনালগ্নের সাড়ে ৩ বছরের বাকশালী শাসনামল এবং বিগত ৫ বছরের আওয়ামী শাসনামলেই বেশী এবং

জোরালো ভারতীয় আগ্রাসন ও ভারতীয়করণ তৎপরতা কার্যকর বা বলবৎ থাকে। আধিপত্যবাদী ভারতের ঐসব পররাজ্যগ্রাসী অপতৎপরতায় দেশের ক্ষমতাসীন ভারতপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুজিববাদী-আওয়ামী সরকার পরোক্ষ সমর্থন অথবা সহযোগীতা করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ ভারতীয় আগ্রাসী অপতৎপরতাগুলোকে কয়েকভাগে চিহ্নিত করা যায়ঃ

(ক) পারিসরিক আগ্রাসন ও সীমান্ত-হামলা;

(খ) দেশের অস্তিত্ব-বিনাশী গোয়েন্দা তৎপরতা;

(গ) ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন;

(ঘ) ভারতের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য আগ্রাসন;

(ঙ) শিক্ষাব্যবস্থায় ও ধর্মীয়-পরিমন্ডলে আগ্রাসন;

(চ) সংবাদ মাধ্যম ও তথ্যমাধ্যমে ভারতীয় আগ্রাসন;

(ছ) অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতীয় প্রভাব ও আগ্রাসন এবং

(জ) বাংলাদেশের পারিবেশিক পরিমন্ডলে আগ্রাসন বা পরিবেশ-যুদ্ধ।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বেই ভারত তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের নানা স্থানে অসংখ্যবার পারিসরিক হামলা চালিয়েছে এবং দখল করে নিয়েছে আমাদের বিভিন্ন ভূ-কৌশলগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিসর ও ভূমি। এসবের মধ্যে সিলেটের পাথারিয়ার পাহাড়ী সীমান্ত, লাটিটিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সিঙ্গারবিল, ফেনীর বিলোনিয়া সীমান্তের মুহুরীরচর উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান আমলেই ভারতীয় প্রশিক্ষিত গোয়েন্দাচক্র অত্যন্ত সুকৌশলে বাংলাদেশের বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে আঞ্চলীকতার বীজ ও ঘৃণার জাল ছড়িয়ে দেয় (১৪ এপ্রিল ২০০১, ইনকিলাব)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ের পর পরই ভারত তার বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। ঐ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রায় ভূমিপরিবেষ্টিত 'সাতবোন রাজ্যমালা'-য় সমুদ্র-সংযোগ লাভের একমাত্র উপায় বঙ্গোপসাগরের প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দর চিরতরে দখল করে নিতে উদ্যত হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল উবানের "ফ্যান্টম্‌স্‌ অব চিটাগাং" নামক গ্রন্থে আমরা ভারতের ঐ আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় পাই। পরে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারত মহাসাগরীয় কৌশলগত স্বার্থে আঘাত লাগায় সে ভারতকে আর বেশী বাড়াবাড়ী না করার কঠোর হুমকি প্রদান করলে ভারত সাময়িকভাবে চট্টগ্রাম বন্দর

থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। জেনারেল উবানের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ ছাড়াও ভারতীয়দের আগ্রাসী মনোভাবের আরো পরিচয় পাওয়া যায় ঐ দেশটির প্রখ্যাত সমর-কৌশলবিদ ও পন্ডিতদের খোলামেলা লিখিত বক্তব্য থেকে। ১৯৭১ সালে ভারতের সহযোগীতায় তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে পরাভূত করে স্বাধীন বাংলাদেশ আবির্ভূত হলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী সংকীর্ণ 'চিকেন লেক' শিলিগুঁড়ি করিডোর-এর পরিপূরক হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের ভূমির ভূ-কৌশলগত সুবিধালাভের দিকে ইঙ্গিত করে প্রখ্যাত ভারতীয় সমর-কৌশলবিদ সুব্রামনিয়াম তাঁর বই "Bangladesh and India's Security" -তে লেখেন, "*there is not the same risk of the Chinese cutting of Assam (i.e. N.E.States) as there was in 1962, since in the course of hostilities, the Northern Bangladesh is likely to be over run by Indian forces, and the communication lines with Assam or N.E. will be broadened rather than narrowed down or closed...*"। তিনি আশ্বস্ত হয়ে আরও বলেন, "*this country (India) needs no longer be afraid that in case of military pressure from China, Assam (N.E.) will be cut off from the rest of India...*"।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পটভূমিতে বাংলাদেলের ভূ -রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত গুরুত্ব এবং তার জন্য বাংলাদেশের ভূমির অপরিহার্যতার দিকে ইঙ্গিত করে অন্যএকজন প্রখ্যাত নিরাপত্তাবিষয়ক বিশ্লেষক ইন্দর মালহোত্রা বলেন, "*In the unlikely event of a major military conflagration between India and China in the north-eastern region, Bangladesh because of its geo-strategical location, would acquire immense signaficance for India's defence planning. Any pre-emptive Chinese attack Southward from Tibetan Chumbi Valley might result in the falling of the narrow Shilliguri Corridor, thus totally cutting off the entire north-easten region from the rest of the country. In such an eventualty, the territory of Bangladesh could only help to establish a link between these two regions (i.e. North-Eastern*

States and rest of India)" [Quoted by S. Mahapatra in Strategic Analysis, 1991]

উপরোল্লেখিত বক্তব্যগুলো থেকে বাংলাদেশের ভূ-ভাগের উপর ভারতীয়দের আগ্রাসী মনোভাবের কিছুটা আঁচ করা যায়। নিচে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে ভারতীয় নগ্ন আগ্রাসনের কিছু চিত্র তুলে ধরা হল।

পারিসরিক আগ্রাসন ও সীমান্ত-হামলা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় বাহিনী ও সশস্ত্র ভারতীয়দের হামলা, জমি দখল, হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ এবং অপহরণের ধারা চালু হয় যা এখন পর্যন্ত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের দক্ষিণ-তালপট্টি দখলের পর ভারত শেখ মুজিবের শাসনামলেই ১৯৭৪ সনের "ইন্দিরা-মুজিব সীমান্ত চুক্তি"-র বদৌলতে বাংলাদেশের বিশাল ছিটমহল "বেরুবাড়ীর" দখল চিরতরে লাভ করে। এর পর থেকেই ভারত একরের পর একর করে এ'পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার একর জমি কৌশলে অথবা জোর করে দখল করে (BDR HQ Records, 2001)। এসব জমির মধ্যে সীমান্ত এলাকার বিতর্কিত জমি এবং সীমান্তের সীমানা চিহ্নিতকারী নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তন জনিত চর ও শিকস্তি জমি প্রধান। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী যেসব এলাকার জমি ভারতের দখলে গেছে সে সব অঞ্চল হচ্ছে, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, চাঁপাই-নবাবগঞ্জ, তিস্তার চরাঞ্চল, ফেনীর বিলোনিয়া সীমান্তের মুহুরীর চর, বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ সীমান্ত অঞ্চল, যশোরের শার্সা বর্ডার এবং ভুরুঙ্গামারীর বিস্তির্ণ এলাকা।

- আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর 'পার্বত্য-শান্তি চুক্তি' সম্পাদন-উত্তর কালে সরকারের 'সুহৃদ' বলে খ্যাত ভারত বাংলাদেশের পার্বত্য-চট্রগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্তবর্তী আচালং মৌজার প্রায় ১৭০০ একরের এক বিশাল পরিসরের ভূমি জোরপূর্বক অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। বাংলাদেশের ঐ বেদখলজমির উপর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ অবৈধভাবে অসংখ্য বাঙ্কার, পাকাসড়ক ও কালভার্ট তৈরী করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে (*আজকের কাগজ, ২৮ নভেম্বর ২০০০*)। খোদ আওয়ামী সরকার-পন্থী ঘাদানিক সমর্থক বলে খ্যাত '*দৈনিক আজকের কাগজ*' আরো রিপোর্ট করে যে, "১৯৭৩-'৭৪ সালে ভারত পরিল্পিতভাবে মূল সীমান্ত রেখা থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এগিয়ে এসে একটি কৃত্রিম ছড়া বা 'নালা' কাটে এবং এর মাধ্যমে বিস্তীর্ণ বাংলাদেশী ভূমি দখল করে নেয়। ভারত বাংলাদেশ থেকে দখলকৃত এই এলাকার নতুন নামকরণ করে 'লাল ফেনীছড়া'। জমি দখলের সাম্প্রতিক সময় ভারতীয় বাহিনী প্রথমে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সীমানা নির্ধারক পিলার চরমারফত বা জোরপূর্বক নিজেরাই উৎপাটন করে ফেলে এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের ভিতরের জমি দখল করে এগিয়ে আসতে থাকে"।
- অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভারত মাত্র ক'দিন আগে বাংলাদেশের পঞ্চগড় সীমান্তে ২৮২টি সীমানা-নির্দেশক পিলার উৎপাটন করে, তেতুঁলিয়া-গোয়ালগাছ বর্ডারের (৪৪৮ নং পিলার থেকে ৭৩০ নং পিলার পর্যন্ত) বাংলাদেশের ভূ-ভাগের প্রায় এক হাজার একর জমি জোর পূর্বক দখল করে নিয়েছে। সীমানা পিলার উৎপাটন ও সহস্র একর জমি বেদখল হবার পরও বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত

কোনই উচ্চ বাচ্য করা হয়নি। অর্থাৎ "সুহৃদ বন্ধু রাষ্ট্রের" এ আগ্রাসনকে নীরবে সমর্থন জানিয়েছে আওয়ামী সরকার। ভারতীয়দের এ জবর দখলের ভয়াবহ খবরটি ছেপেছে চরম ভারতপন্থী ও খোদ ভারতের রিলায়েন্স গ্রুপের অংশিদারীত্বে প্রকাশিত দেশের আর একটি ঘাদানিক সংবাদপত্র। (*দৈনিক জনকণ্ঠ* গত ২৯শে মার্চ, ২০০১)

- ঐ একই তারিখে সরকার সমর্থক *দৈনিক জনকণ্ঠ* আরো লিখেছে, পঞ্চগড় জেলার বোদা, পঞ্চগড় সদর ও দেবীগঞ্জ উপজেলার ৭টি সীমান্তবর্তী মৌজার এক হাজার একশত সাতাশ (১১২৭ একর) একর জমি বি.এস.এফ. (B.S.F) এর সহযোগীতায় ভারতীয়রা দখল করে নিয়েছে (দৈনিক জনকণ্ঠ, পৃঃ ৫, ২৯-০৩-২০০১)।

তিস্তা নদীর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অব্যাহত ভাঙ্গন ও বন্যায় ভারত- বাংলাদেশ সীমানা নির্দেশক পিলার ভেসে যাওয়ায় ভারতীয়রা বি.এস.এফ. এর সহযোগীতায় ঐ অঞ্চলের প্রায় ২০০০ একর, নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার ছাতাইন ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী এলাকার আরো কয়েক হাজার একর জমি জোর পূর্বক দখল নিয়েছে (*দৈনিক সংগ্রাম, ১৯-০৯-২০০০ সন*)।

বর্তমানে ভারতের আগ্রাসনের কবলে বাংলাদেশের যেসব ভূ-ভাগ নিপতিত ও জবরদখলকৃত তার একটি চিত্র নিচের ছকটিতে দেখা যায় ঃ

ছক নং-১ঃ **ভারতের দখলে বাংলাদেশের ভূমি**

এলাকা ঃ	জিলা ঃ	ভূমির পরিমাণ
১। আচালং সীমান্ত	খাগড়াছড়ি	১৭০০ একর
২। তেতুঁলিয়া গোয়ালগছ	পঞ্চগড়	১০০০ একর
৩। বোদা, দেবীগঞ্জ ও সদর	পঞ্চগড়	১১২৭ একর
৪। তিস্তা সীমান্তবর্তী এলাকা		২০০০ একর
৫। ডিমলা- ছাতাইন সীমান্ত	নীলফামারী	কয়েক হাজার একর
৬। শার্সা (ইছামতি কোদালা)	যশোর	৫৭০ একর
৭। মাটিরাবন সাতছড়ি	সুনামগঞ্জ	৩২৯৫ একর
৮। প্রতাপপুর (গোয়াইনঘাট)	সিলেট	২৩০ একর
৯। নয়াগ্রাম (গোয়াইনঘাট)	সিলেট	১৩৭ একর
১০। শিবগঞ্জ-ভোলাহাট সীমান্ত	চাপাই-নবাবগঞ্জ	৬৫০০ একর
১১। মশালডাঙ্গা (ভূরুঙ্গামারী)	কুড়িগ্রাম	৩০০ একর
১২। মুহুরীর চর (বিলোনিয়া)	ফেনী	২৪ একর
১৩। দক্ষিণ -তালপট্টি	সাতক্ষীরা	১০,০০০ একর
১৪। উত্তর বঙ্গের অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চল	ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট	১০,০০০ একর

তথ্যসূত্র ঃ BDR, জনকণ্ঠ, সংগ্রাম, আজকের কাগজ, ইনকিলাব, ইত্তেফাক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট

- ভারত ছাড়াও বর্তমানে টেকনাফ- উখিয়া থানাদ্বয়ের কক্সবাজার জেলার সীমান্তবর্তী প্রায় আরো ১০,০০০ একর জমি মায়ানমারের দখলে রয়েছে। ভারতের তুলনায় বহুগুন ছোট ও দূর্বল ছ'কোটি জন অধ্যুসিত পশ্চাদপদ প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারও প্রায়শঃই বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে সশস্ত্র মহড়া প্রদান করে ও সীমান্তে হামলার হুমকি হয়ে দেখা দেয়। মায়ানমারের না-সা-কা নামের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী প্রায়শঃই বাংলাদেশের নিরীহ সীমান্তবাসী ও মৎস্য শিকারীদের ধরে নিয়ে যায় বা তাদের উপর অত্যাচার চালায়। কখনো বা তারা সীমান্তবর্তী বাংলাদেশে ফাড়িতে বা বি.ডি.আর. (BDR) এর অবস্থানে চালায় অতর্কিত হামলা।
- বাংলাদেশের ফেনী জেলার বিলোনিয়া সীমান্তের ভূ-কৌশলগত দিক দিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহুরীরচরের বেশীর ভাগ ভূমিই ভারত জোর করে দখল করে নিয়েছে।

১৮৯৩ সালের চাকলা- রওশনাবাদ মানচিত্র অনুযায়ী চরটি বর্তমানের বাংলাদেশের আঞ্চলিক পরিসীমার অন্তর্ভূক্ত। ১৯৭৪ সনের 'ইন্দিরা-মুজিব সীমান্ত চুক্তি' অনুসারেও নদী সিকস্তি চরটির মালিকানা পুরোপুরি বাংলাদেশের বলে নির্দেশ করা হয়েছে। ১৯৭৪ এর পর এ পর্যন্ত ভারত মুহুরী নদীর উজানে কৃত্রিম বাঁধ নির্মাণ করে এবং নদীটির ভারতীয় অংশে ১৯টি স্পার, গ্রোয়েন ইত্যাদি নদী-শাসন কাঠামো নির্মাণ করে। এ সব নদী শাসন কাঠামো তৈরীর মাধ্যমে নদীর মধ্যস্রোতকে জোরপূর্বক পশ্চিমে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিয়ে ভারত এ' পর্যন্ত প্রায় ২৪ একর বাংলাদেশের ভূমি দখল করে নিয়েছে এবং ঐ চরটির আরো ৫৩ একর বিরোধপূর্ণ জমির উপর স্বীয় মালিকানার অবৈধ দাবী বজায় রেখে চলেছে।

- শুধু বাংলাদেশের ভূমি দখল করেই নয় হিংস্রদানব প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বিগত ১১ বছরে প্রায় ২৩০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে। বি.ডি.আর সহ ঐ হতভাগা বাংলাদেশী নাগরিকদের বেশীর ভাগই বি.এস.এফ -এর গুলীতে প্রাণ হারায়। শুধুমাত্র গত বছর (২০০০ সালে) বি.এস.এফ. -এর হাতে মোট ৩৫ জন বি.ডি.আর সদস্য নিহত হয়েছেন। ঢাকার ইংরেজী দৈনিক *The Indepentent* গত ১২-১২-২০০০ তারিখের এক সরকারী সূত্রের উল্লেখ করে "35 BDR men killed in border skirmishes this year" - শীর্ষক এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্র সমূহ ভারতীয় সীমান্ত- রক্ষী বাহিনী বি.এস.এফ. (B.S.F) এর নিরীহ বাংলাদেশী নাগরিকদের উপর হত্যাকান্ড ও আক্রমনের খবর প্রায়শই প্রকাশ করে থাকে। গত ৩০শে মার্চ, ২০০১ তারিখের দৈনিক যুগান্তর UNB –এর বরাতের এক খবরে লিখে যে, "ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বি.এস.এফ) চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চাঁদপুর গ্রাম থেকে এক বাংলাদেশী তরুণ জুলুকে (২৭) অপহরণ করে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করেছে।" ১৩ মার্চ (২০০১) তারিখের *দৈনিক মানবজমিন* -এর এক প্রতিবেদনে ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বি.এস.এফ.-এর গুলিতে জকিগঞ্জের সীমান্তবর্তী কুশিয়ারা নদীতে খলিলুর রহমান নামের এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর সম্পর্কে জানা যায়।
- বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় বি.এস.এফ. (B.S.F) - এর অত্যাচারের বাড়াবাড়ির বিষয়ে খোদ ক্ষমতাসীন সরকারী দলের মুখপত্র বলে খ্যাত শেখ মনি প্রতিষ্ঠিত *দৈনিক বাংলার বাণীর* ৬ ফেব্রুয়ারী (২০০১) একটি খবর খুবই প্রনিধানযোগ্য। কলকাতা থেকে দীলিপ চট্টোপাধ্যায় প্রেরিত ঐ খবরে বলা হয় যে, "পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে নিরীহ জনসাধারণকে বি.এস.এফ. সদস্যদের অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য ঐ সীমান্তে বাংলাভাষী B.S.F জওয়ান নিয়োগের জন্য ভারতের কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছে"।

- ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের সত্যতা ধরা পড়ে ১৫ জানুয়ারী (২০০১) তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে যার শিরোনাম ছিল "সাতক্ষীরা সীমান্তে বি.এস.এফ -এর উস্কানিমূলক তৎপরতা একমাসে ১৫ জনের মৃত্যু"। ইত্তেফাকের সাতক্ষীরা সংবাদদাতার ঐ খবরে প্রকাশ ১১ জানুয়ারী (২০০১) সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার খাঞ্জিরা সীমান্তের ইছামতি নদীর ঘারকাঘাটে ভারতীয় বি.এস.এফ-এর একটি টহলদার গানবোট বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করে বাংলাদেশের একটি যাত্রীবাহী নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে দুদলি গ্রামের জিন্নাহ নামের ৩২ বছরের এক যুবককে হত্যা করে। একই ভাবে ঐ জানুয়ারী মাসের ৬ তারিখে বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলের কালিন্দী নদীতে আর একটি যাত্রীবাহী নৌকায় B.S.F গুলি চালিয়ে আরো দু'ব্যক্তিকে হত্যা করে। তা'ছাড়া ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর ইছামতি নদীতে B.S.F বাংলাদেশের আরো ৪ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে বলে *ইত্তেফাকের* (১৫-০১-২০০১) ঐ রিপোর্টে প্রকাশ।
- ২০ ডিসেম্বর (২০০০) -এর *দৈনিক মানবজমিনে* প্রকাশিত অপর এক খবরে দেখা যায়, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বি.এস.এফ -এর গুলিবর্ষণে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার চরখিদিরপুর সীমান্তে খুশবু নামের একজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন হয়। ঐ ঘটনায় বি.এস.এফ বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ৪৭টি বৈধভাবে আমদানিকৃত গরু ছিনতাই করে নিয়ে যায়।
- ১৯৯০ সাল থেকে নিয়ে ২০০০ সাল পর্যন্ত মোট ১১ বছরে ভারতের সীমান্ত রক্ষী বি.এস.এফ. -এর গুলিতে বাংলাদেশের মোট ২২৮ জন নাগরিক নিহত হয়। এর মধ্যে বি.ডি.আর. -এর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী, হিন্দু-উগ্রবাদী এবং ভারতীয় নাগরিকদের নগ্ন হামলা, ভূমি দখল, লুটতরাজ, নারীধর্ষণ, অপহরণ ও চোরাচালানসহ অন্যান্য আগ্রাসন বাংলাদেশে আওয়ামী শাসনামলে উল্লেযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচের ছকে বিগত ১ দশকে ভারতীয়দের হাতে নিহত ও আহত বাংলাদেশী নাগরিকদের হিসেব তুলে ধরা হল ঃ

ছক -২ ঃ ভারতীয় বি.এস.এফ -এর হাতে নিহত এবং আহত বাংলাদেশী নাগরিকদের

বছরওয়ারী হিসাব (১৯৯০-২০০১)

সাল	নিহত	আহত	আক্রমণ ও গোলাগুলীর ঘটনা
১৯৯০	২৯	১৯	-
১৯৯১	২৭	১৭	-
১৯৯২	১৬	১৩	-
১৯৯৩	২১	-	-
১৯৯৪	২১	১৪	১৭০
১৯৯৫	১২	৯	৭৫
১৯৯৬	১৩	১৮	১৩০
১৯৯৭	১১	১১	৩৯
১৯৯৮	২৩	১৯	৫৬
১৯৯৯	৩৩	৩৮	৪৩
২০০০	৩২	২৬	৪২
২০০১ (এপ্রিল পর্যন্ত)	১৩	১০০	১৭৪

তথ্যসূত্রঃ ২২-২৫ অক্টোবর, ২০০০ তারিখ ঢাকার পীলখানা বি.ডি.আর সদর দপ্তরে বি.ডি.আর - বি.এস.এফ শীর্ষ পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলনে উপস্থাপিত তথ্যানুসারে উপস্থাপিত রিপোর্ট। (দৈনিক সংগ্রাম, ২৯-১০-২০০০)

উপরোল্লিখিত ছক থেকে দেখা যায় যে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সনের এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে আওয়ামী শাসনামলে মোট ১২৫ জন বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়েছে ভারতীয় বি.এস.এফ. -এর গুলিতে; আহত হয়েছে মোট ২১২ জন বাংলাদেশী। ঐ সময়ে সীমান্তে সর্বমোট ৩১০টি ভারতীয় হামলা ও গুলাগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়।

- ভারতীয় সীমান্ত-রক্ষী বাহিনী বি.এস.এফ. -এর হামলা ও হত্যাকান্ড, ভারতীয় রক্ষী ও নাগরিকদের বাংলাদেশী ভূমি জবর-দখল ছাড়াও বাংলাদেশী সীমান্ত জিলাগুলোতে ভারতীয় ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের আক্রমণ ও অপরাধের হারও আওয়ামী সরকারের আমলে আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১০-১২-২০০০ তারিখের *দৈনিক মানবজমিন* পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায়, ভারতীয় পুলিশ বাহিনীও বাংলাদেশী নিরীহ সীমান্ত জনপদবাসীর জীবনকে অতিষ্ট করে

তুলেছে। ভারতীয় পুলিশের সদস্যরা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় ছিটমহলবাসী বাংলাদেশীদের বাড়িঘরে চুরি ডাকাতি শুরু করেছে। এ বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য বাংলাদেশী পররাষ্ট্র সচিব সি.এম. শফি সামি তাঁর ১৩-১৪ ডিসেম্বর (২০০০) -এ ভারত সফরকালে বাংলাদেশী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আলোচ্য বিষয়ের এজেন্ডাভুক্ত করেন বলে প্রকাশ।

- ভারতীয় বি.এস.এফ. -এর সীমান্ত হামলা, ভুমিদখল, ভারতীয় পুলিশের ডাকাতির সাথে ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত আগ্রাসনের নুতন মাত্রা হচ্ছে বাংলাদেশী তরুণ নুতন প্রজান্মকে ধ্বংশ করার জন্য সীমান্ত দিয়ে লক্ষ লক্ষ বোতল ফেন্সিডিল ও শত শত কিলোগ্রাম হিরোইনসহ আরো নানা ধরনের ভয়াবহ মাদকদ্রব্যের পাচার ও চোরাচালান। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ ভারতীয় মাদকদ্রব্যের বৃহত্তম বাজারে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পরোক্ষ মদদ ও সহযোগীতায় বাংলাদেশে এখন ভারতীয় মাদকদ্রব্য মদ, গাঁজা, ভাং, চরস, হেরোইন, ফেন্সিডিলের অবাধ চোরাচালান চলছে। বাংলাদেশের বাজারকে সামনে রেখে সীমান্তের অপরপারে ভারতীয়রা গড়ে তুলেছে ফেন্সিডিল তৈরীর অসংখ্য কারখানা ও চোলাইঘর। যশোর, বেনাপোল, কুমিল্লা ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত পথে ড্রামে ড্রামে পাচার করা হচ্ছে ঐ সব ভারতীয় কারখানায় তৈরী প্রজন্মনাশী ভয়াবহ মাদকদ্রব্য। বাংলাদেশের কিশোর, তরুণ ও যুবকদের নৈতিক, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে ধ্বংশের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্যই অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে ভারত বাংলাদেশে ঐ মাদক আগ্রাসন চালাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। *(দৈনিক সংগ্রাম, ১৬-৯-২০০০; দৈনিক ইত্তেফাক ২০-১০-২০০০ ; দৈনিক মানবজমিন ৪-০১-২০০০১)*
- ২৯-৯-২০০০ তারিখের *দৈনিক ইত্তেফাকের* এক এক্সক্লুসিভ রিপোর্টে বলা হয়,"বাংলাদেশের বারটি সীমান্ত পথে আগ্নেয়াস্ত্র আসিতেছে"। ইত্তেফাক ছাড়াও দেশের প্রায় সব ক'টি সংবাদপত্রে ভারত থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঐ সব অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবরুদ পাচারের অসংখ্য তথ্য প্রকাশ পায়। ইত্তেফাকের খবরে জানা যায় ২০০০ সালে শুধুমাত্র প্রথম ৮ মাসেই বাংলাদেশে মোট ২৮৪৮টি নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র আসে।

- বাংলাদেশের চরম ভারতপন্থী এবং ইসলাম বিদ্বেষী বলে খ্যাত এন.জি.ও. *-দৈনিক জনকণ্ঠ* ২ ডিসেম্বর (২০০০) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় বাহিনী সমূহের অনুপ্রবেশ ও বল প্রয়োগের বাহানা দাড়ঁ-কারানোর উদ্দেশ্যে দু'টি বিশেষ খবর ছাপে। খবর দু'টিই ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী নয়াদিল্লী ও পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা থেকে যথাক্রমে শর্মিষ্ঠা রায় এবং অমিত বসুর পাঠানো রিপোর্টের ভিত্তিতে ছাপানো। আবার ঐ একই তারিখের ভারতপন্থী জনকণ্ঠের একই পাতায় ছাপা ১ ডিসেম্বরের এ.এফ.পি (A.F.P.) এর অন্য একটি প্রকাশিত খবরের বিশ্লেষণে (গৌহাটি থেকে পাঠানো) 'ভারতকণ্ঠ' খ্যাত সংবাদপত্রটির প্রথমোক্ত

সংবাদ দুটো প্রকাশের গূঢ়ার্থ উদঘাটিত হয়ে যায়। নয়াদিল্লী থেকে শর্মিষ্ঠা রায়ের পাঠানো খবরে বলা হয়, "পশ্চিম বঙ্গ সীমান্ত আই.এস.আই (অর্থাৎ পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা) এর মদদে উগ্রপন্থীরা তৎপর"। একই খবরে আরো বলা হয় ভারতের উগ্র সাম্প্রদায়িক নেতা বি.জে.পি-র মন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানী বলেন "উক্ত উগ্রপন্থীদের তৎপরতা দমাতে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথ অভিযান চালানোতে তাঁর সম্মতি আছে"।

কলিকাতা থেকে পাঠানো জনকণ্ঠের সংবাদদাতা অমিত বসুর খবরে প্রকাশ ভারতীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ঐ কথিত "সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আই.এস.আই. (পাকিস্তানী) দমনে বাংলাদেশ, ভুটান ও ভারতের ত্রিদেশীয় সম্মিলিত এ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী অভিযান চালাতে ত্রিদেশীয় সর্বসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে"।

শর্মিষ্ঠা ও অমিতবসুর আই.এস.আই. জুজুর কাল্পনিক ফাঁকা অজুহাতের অসারত্ব প্রমাণ করেছে ভারতপন্থী ঐ সংবাদপত্রের একই পাতায় ছাপানো গৌহাটি থেকে পাঠানো এ. এফ.পি.-র অপর সংবাদটির বিশ্লেষণে। খবরটির শিরোনাম "আসামে গেরিলা হামলা হত ১৮"। ঐ খবরে উল্লেখ করা হয়েছে খোদ আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল কুমার মোহান্ত বলেছেন, "এই হামলার পেছনে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইউনাইটেড লিবারেশান ফ্রন্ট অব আসাম (উলফা/ULFA) এর হাত রয়েছে"। সংবাদটিতে আরো উল্লেখ হয়েছে যে, "শুধু গত মাসেই (অর্থাৎ নভেম্বর-২০০০) আসামে উলফা হামলায় ৭০ জন বিহারী ও অন্যান্য বহিরাগত ভারতীয় (অ-আসামীয়) নিহত হয়েছে"। আসামের মুখ্যমন্ত্রী মোহান্ত তাঁর বক্তব্যের কোথাও আই.এস.আই.-এর উল্লেখ করেননি। ভারত নিজ দেশের স্বাধীনতাকামী গ্রুপগুলির সাথে ইসলামী মৌলবাদীদের সংযোগের কথাও বারবার সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে এবং একই সাথে সুকৌশলে তারা বাংলাদেশেকেও স্বীয় আঞ্চলিক ভূমি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোকে ব্যবহার করার সুযোগ দানের জন্য অভিযুক্ত করেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান সন্ত্রাসীদের হাতে ব্যবহৃত সব ধরনের মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের প্রায় ৮০% ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকছে। আগ্নেয়াস্ত্র সমূহের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের দেশীয় বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার, শর্টগান, রাইফেল, বোমা, চকোলেট বোমা, গ্রেনেড এবং আর.এস.ডি-টি.এন.টি. এক্সপ্লোসিভ-বিস্ফোরক ইত্যাদি। ঐ সব সংবাদ মাধ্যমে থেকে আরো জানা যায় যে, বাংলাদেশের মধ্যে সক্রিয় সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র, চোরাচালানী সিন্ডিকেট, চরমপন্থী কম্যুনিষ্ট সন্ত্রাসী দল, উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ এবং বিভিন্ন ভারতপন্থী রাজনৈতিক উগ্রপন্থী মাফিয়া চক্র

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (R.A.W.) এবং বিএসএফ (B.S.F.) প্রভৃতি বাহিনীর সহযোগীতায় বাংলাদেশ অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য নানা ধরনের প্রায় দু'লক্ষের বেশী আগ্নেয়াস্ত্র এবং শত শত টন বিস্ফোরক বাংলাদেশে পাচার করেছে। ২৯-৯-২০০০ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ঢাকার পুলিশ সদর দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী শুধুমাত্র ২০০০ সনের আগষ্ট মাস পর্যন্ত আট মাসেই দেশে দু'হাজার আটশত আটচল্লিশ (২৮৪৮) টি নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র আটক করা হয়েছে। একই সঙ্গে ১২০৩৪ রাউন্ড গুলী-বুলেটও উদ্ধার করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের ঐ রিপোর্ট থেকে আরো অবহিত হওয়া যায় যে, একই সময়ে, অর্থাৎ ২০০০ সনের ৮ মাসেই মোট ৪৪ হাজার ৫৯৭টি (৪৪৫৯৭টি) বোমা ও ককটেল উদ্ধার করা হয়। ঐ সব অস্ত্রের বেশীর ভাগই বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, খাগড়াছড়ি,- কুমিল্লা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও কক্সবাজার সীমান্ত দিয়ে দেশের ভেতরে পাচার হয় বলে পত্রিকাটি রিপোর্ট করে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা, বরিশাল, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ইত্যাদি বৃহত্তর জিলা নিয়ে গঠিত গাঙ্গেয়-বদ্বীপের অংশটি নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের এক বৃহদাকার ভূ-ভাগ। ভারতীয় গোয়েন্দা চক্র 'র' (R.A.W) এর প্রত্যক্ষ মদদ ও পরিকল্পনায় চিত্ত-ছুতার, প্রফুল্ল মোহান্ত, কালিপদ ঘোষ এবং বাংলাদেশের নিমচন্দ্র ভৌমিক, সি.আর.দত্ত প্রমুখ কট্টর সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির তৎপরতায় "স্বাধীন বঙ্গভুমি" আন্দোলন নামে স্বার্বভৌমত্ব বিধ্বংশী বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্ত দানা বেধে ওঠার সংবাদ প্রায়শঃই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ঐ হীন স্বাধীনতা-বিধ্বংশী অপতৎপরতা চালানো তথাকথিত "স্বাধীন বঙ্গভূমি" বাস্ত বায়নের জন্যও বাংলাদেশে বিপুল ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ অবৈধভাবে ভারত থেকে আনা হচ্ছে বলে ধারনা করা হয়।

ভারত তার জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনের জন্য তার 'জানি দুশমন' ১৫০০ কিঃ মিঃ দূরের পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই.এস. আই.-র অযুহাত খাড়া করে তাদের দেশের অর্থানুকুল্যে (রিলায়েন্স গ্রুপের মাধ্যমে) বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত চরম ইসলাম বিদ্বেষী, ভারতপন্থী সংবাদপত্র সমূহের মাধ্যমে এখন মনগড়া অজুহাত খাড়া করে প্রতিনিয়ত অসংখ্য সংবাদ প্রকাশ করে চলেছে এবং ঐ সব খবরের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতাবাদী জাতিসত্বাসমূহের আজাদির যুদ্ধে বাংলাদেশকে জড়ানোরও বিভিন্ন অযুহাত খাড়া করে চলেছে। ভারতের পার্লামেন্ট ও সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চলের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন স্থানে কল্পিত আই.এস. আই এবং উলফা সহ অন্যান্য স্বাধীনতাকামীদের ক্যাম্প বা আশ্রয়স্থল রয়েছে বলে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং এরই মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশে

আগ্রাসনের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে যাচ্ছে। কলিকাতা থেকে জনকণ্ঠের সাংবাদিক অমিত বসুর পাঠানো রিপোর্ট থেকে জানা যায় ২০০০ সালের ভারতে অনুষ্ঠিত 'ত্রিদেশীয় এ্যাকশন প্ল্যান'-এ বাংলাদেশ, ভূটান ও ভারতের গোয়েন্দা বাহিনীর মধ্যে আরোও সমন্বয় বাড়ানোর ব্যাপারেও কথা হয়েছে। তা'ছাড়া বিগত বছরগুলোর বাংলাদেশে আওয়ামী শাসনামলের বিভিন্ন সময়ে ভারত-কর্তৃক তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতবোন রাজ্যমালায় স্বাধীনতাকামী আন্দোলন দমন ও কল্পিত 'আই.এস.আই তৎপরতা' দমনে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের বিষয়ে দ্বিপাক্ষীক সম্মতি ও চুক্তি স্বাক্ষরের নানা বিষয়ে বহু নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও সংবাদাদি ছাপা হয়েছে। ঐ সব খবরে ভারতের আগ্রাসী আকাঙ্খা পূরণে বাংলাদেশের বর্তমান আওয়ামী সরকারের সক্রিয় সম্মতি এবং অনুমোদনেরই ভাষ্য ও চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সব সময়।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিবঙ্গের ৯টি জিলায় পাকিস্তানের আই.এস.আই (I.S.I) র কল্পিত চরদের অজুহাত দেখিয়ে "ভারতের যৌথ এ্যাকশন প্ল্যান" এর আর একটি চক্রান্তমূলক সংবাদ প্রকাশ করে বাংলাদেশের চরম ভারতপন্থী, ইসলাম বিদ্বেষী সংবাদপত্র দৈনিক ভোরের কাগজ ১৬ই ডিসেম্বর (২০০০)। সংবাদটি সাতক্ষীরা থেকে পাঠান শ্রী সুভাষ চৌধুরী কলিকাতার দৈনিক বর্তমান নামক সংবাদপত্রের বরাত দিয়ে। সংবাদটিতে ঐ সব অজুহাতের সাথে ভারতে ইসলামী "মৌলবাদীদের" সংযোগের কথাও উল্লেখ করা হয়।

ভারতের ঐ সকল তাবত অজুহাত, আই.এস. আই.-এর দোহাই, ট্রানজিট - ট্রান্সশীপম্যান্ট - করিডোর চুক্তির অন্তরালে রয়েছে বাংলাদেশের অত্যন্ত কৌশলগত (ভূ-রাজনৈতিক ও রন-কৌশলগত) গুরুত্বপূর্ণ উত্তরবঙ্গ ও সিলেটের ভুমিতে নিজেদের সামরিক ও নিরাপত্তাগত অবস্থানকে মজবুত ও সুসংহত করা। ভারতের ঐ হিংস্র হায়েনা- নেকড়ে মানসিকতার স্বা-দন্তের বিভৎস ঘঠনাটি আমরা অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রত্যক্ষ করি ১৬ই এপ্রিল, ২০০১ এর সিলেট-এর গোয়াইনঘাট- ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী B.S.F-এর নির্লজ্জ উস্কানী মূলক আচরণ, আগ্রাসী হামলা ও তার করুণ পরিনতির ঘটনাদ্বয়ের বিশ্লেষণে।

- ১৬ এপ্রিল, ২০০১ এ' বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বি.ডি.আর. সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজিলার তামাবিল সীমান্তের পাদুয়া গ্রামটি ভারতীয় বাহিনীর কবল থেকে পুনর্দখল করলে তার প্রতিশোধে ভারতীয় বি.এস.এফ. কুড়িগ্রামের রৌমারী থানার বরইগ্রামে প্রায় ৪০০ সৈন্যসহ আক্রমন চালায়। বাংলাদেশের বীর বি.ডি.আর. বাহিনীর মাত্র ১১ জন সৈন্য ভারতীয় বি.এস.এফ. -এর ঐ অতর্কিত হামলার উপযুক্ত জবাব দিলে বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী

আগ্রাসী ভারতীয় বি.এস.এফ. এর ১৭ জন সৈন্যকে করুণভাবে জীবন দিতে হয় এবং আহত হতে হয় আরো প্রায় অর্ধশত ভারতীয় হানাদারকে। উল্লেখ ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের শাসনামলের শেষ দিকে ভারতীয় বাহিনী ডাউকি- তামাবিল সীমান্তের প্রায় ২৩৭ একর বাংলাদেশী সার্বভৌম অঞ্চল নিয়ে গঠিত গ্রাম পাদুয়া জোরপূর্বক দখল করে নেয়। *(১৭-১৯ এপ্রিল ২০০১, ইত্তেফাক/ সংগ্রাম)*

নিরাপত্তা-গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় বিগত পাঁচ বছরেই ভারতীয় বি.এস.এফ. অন্ততঃ ৩০০০ (তিন হাজার) বার বাংলাদেশ সীমান্তে হামলা ও অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিয়েছে এবং ঐ সব হামলায় ৪৭ জন বি.ডি.আর. সদস্যসহ প্রায় দেড়শত বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়। এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশের প্রায় ১০,০০০ একর নথিভূক্ত (দাবীকৃত) বাংলাদেশী ভূমিসহ প্রায় ৫০,০০০ একরের মত সার্বভৌম ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের 'ল্যান্ড রেকর্ড এ্যান্ড সার্ভে' অধিদপ্তরের (১৯৯৭) হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশের ৩,২১,৮৫৬ একর ভারতের অপদখল বা Adverse Possession এ রয়েছে। (Bangladesh Survey & Land Records Directorate, 1997)।

এভাবে উপযুক্ত প্রমান সহ দেখা যাচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের পুরো অস্তিত্বকাল জুড়েই দেশটির উপর তার আগ্রাসী প্রতিবেশী বৃহদাকার ভারতের হিংস্র আগ্রাসন বলবৎ রয়েছে। এমনকি ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আদর্শের এদেশীয় বন্ধু আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় থাকার পরও পর-রাজ্যলোভী ভারতের ভূমিগ্রাসী লোলুপতা একটুও কমেনি। সিকিমেও এরূপ ভারতপন্থী লেন্দুপ দর্জির সরকার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসীন থাকায় ভারত ধূর্ত কৌশলে তাদের সুহৃদ সিকিমের তথাকথিত 'গণতন্ত্রী' দর্জি- সরকারের মাধ্যমেই পার্লামেন্টে আইন পাশ করিয়ে সিকিমকে চিরতরে গ্রাস করে নেয়। বাংলাদেশের বর্তমানের ক্ষমতাসীন সরকার দেশের স্বার্থ পরিপন্থী ৩০ বছরের গঙ্গার পানি চুক্তি সম্পাদন, সার্বভৌমত্ব বিনাশী 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষর এবং ট্রানজিট করিডোর, উপ-আঞ্চলিক জোট ইত্যাদি নানা ধরনের অস্তিত্ব পরিপন্থী চুক্তি স্বাক্ষর ও মৈত্রী গঠনের প্রেক্ষিতে কি বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক চিন্তাশীল জনগণ এদেশের ভবিষ্যৎকে লেন্দুপ-দর্জির ঐ হতভাগ্য সিকিমের দূর্ভাগ্যের সাথে তুলনা করে দেখতে পারে না ?

বাংলাদেশের বর্তমানের দারুন অসহায় ও চরম নৈরাজ্যকর অবস্থাদৃষ্টে এদেশের ভবিষ্যৎকে ঐ রকম ভাবা গেলেও আমরা মেঘে ঢাকা আকাশের ঘণকৃষ্ণ তমাশার কিনারায় আশার সোনালী রেখার ইঙ্গিতও দেখতে পাই। সাতাশ হাজার আন্তঃ মহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র (I.C.B.M.) সজ্জিত এককালের দ্বিতীয় পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন (U.S.S.R.) দূর্বল ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়ে মাত্র ২/৩ বছরের মধ্যে ভেঙ্গে খান খান হয়ে ২৭ টুকরোয়

পরিনত হয় এবং ঐ শক্তির মদমত্ততায় বিভোর বিশাল আগ্রাসী *শ্বেত-ভল্লুকরূপী* দানব রাশিয়া আজো ক্ষুদে ব্যাঘ্র শাবক চেচনিয়া, দাগিস্তান, ইঙ্গুসটিয়া, অসেটিয়া থেকে নিয়ে বাসকার, তাতারিস্তান দিয়ে খোদ রাজধানী মস্কোর সদর দরজা পর্যন্ত বিস্তারী জিহাদী সয়লাবে টালমাটাল। কে জানে, আমাদের আজকের আগ্রাসী প্রতিবেশী ভারতের নড়বড়ে জোড়াতালির কঙ্কাল আর কত কাল তার খোস পাঁচড়া ওঠা মেকী ঐক্যের চামড়াকে একত্রে রাখতে সক্ষম হবে। পাঞ্জাবের শিখদের স্বাধীন খালিস্তান আন্দোলন, দক্ষিণের দ্রাবিড়দের স্বাধীন তামিলনাড়ুর সংগ্রাম, উত্তর পূর্বাঞ্চলের অহমজাতিসত্ত্বার আজাদির (ULFA, উলফা) -এর ঘনঘট লড়াই আর উত্তর-পশ্চিমের জানবাজ কাশ্মীরীদের রক্তক্ষয়ী জিহাদ আমাদের সেই সোনালী ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা তৎপরতা

বাংলাদেশের জন্মের পূর্ব থেকেই বাংলাদেশকে ঘিরে ভারতীয় আধিপত্যবাদের যে নীলনক্শা প্রণীত হয় তার বাস্তবায়নে অর্থাৎ বাংলাদেশকে ভারতের ক্রীড়নক বা ইচ্ছাদাস হিসেবে খেলানোর জন্য ভারতের নানা গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করে আসছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বেই ষাটের দশকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা Indian Investigation Bureau (llB) এবং Research and Analysis wing বা 'র' (RAW) বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী (বাঙ্গালী) নেতৃবৃন্দের পেছনে কাজ করেছে বলে জানা যায়। তথাকথিত গোয়েন্দা সংস্থা সংশ্লিষ্ট একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী ইন্দন-সংযোগ ছিল তা' পরে ঐ মামলার সাথে সংশিষ্ট অভিযুক্তদের জবানি এবং নানা ভারতীয় কৌশলবিদ ও রাজনীতিক লেখকদের দেয়া তথ্য থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ১৯৬৮ সনে ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা Research and Analysis Wing বা 'র' (RAW) প্রতিষ্ঠিত হয় - যার সদর দপ্তর দিল্লীর বসন্ত বিহারে । পৃথিবীর হাতে গোনা প্রথম সারির কয়েকটি শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা যেমন, সি.আই.এ. (CIA), কে.জি.বি. (KGB, অধুনালুপ্ত), মোসাদ (MOSAD), M-16, আই.এস.আই. (ISI)- র সঙ্গে ভারতের 'র' (RAW) - কে সামনের দিকে বিচার করা হয়।

RAW মূলতঃ ভারতের বৈদেশিক গুপ্তার সংস্থা হলেও এর কর্মতৎপরতার প্রায় ৮০ ভাগই আবর্তিত হয় ভারতের চারপাশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে। এর লক্ষ্য হচ্ছে আঞ্চলিক স্বার্থ বিশেষ করে সার্বিক নিরাপত্তা, যেমন সামরিক, অর্থনীতিক, যোগাযোগ ইত্যাদি। ভারত তার প্রধানতম শত্রু পাকিস্তানকে খন্ডিত করে বাংলাদেশের সৃষ্টি, সিকিমকে গ্রাস করা, শ্রীলঙ্কায় তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদের উসকিয়ে দিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের খুনী শান্তিবাহিনী গঠন ও তাদের ট্রেনিং প্রদান, অস্ত্র ও আশ্রয় দানসহ সার্বিক বিচ্ছিন্নতাবাদী অপতৎপরতা চালানো, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশে স্বাধীন "বঙ্গভূমি" নামক হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি সব কিছুই 'র' (RAW) -এর সক্রিয় পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় সংঘটিত হয়ে চলেছে। ভারত কর্তৃক ১৯৭৫ সালে স্বাধীন পার্বত্য-রাজ্য সিকিম গ্রাস ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে সফলভাবে পাকিস্তান থেকে আলাদা করে সেখানে একটি সম্পূর্ণ ভারতমুখী তাবেদার সরকার গঠনে সফলতা RAW -এর উল্লেখযোগ্য অবদান বলে ভারতের তৎকালীন বিখ্যাত সপ্তাহিক *Illustrated weekly of India* -তে মন্তব্য করা হয়। এতে বলা হয় "RAW's major triumps in external intelligence were in Bangladesh and Sikim-----"। বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত নিরন্তর এবং ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW) বাংলাদেশে ভারতীয়

আধিপত্যের নখরকে তীব্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং প্রতিরক্ষাসহ প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা তৎপরতার মূল লক্ষ্য 'যে কোন উপায়ে বাংলাদেশকে হীনবল বা দুর্বল করে ভারতীয় আধিপত্য এবং প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা'। এ লক্ষ্য অর্জনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশে তার কর্মতৎপরতার আরো কয়েকটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য (Objectives) স্থির করে নিয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

- এদেশে ভারতপন্থী, ধর্ম নিরপেক্ষবাদী ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আদর্শ ও ধ্যান-ধারনাবিদ্বেষী অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী একটি দুর্বল নতজানু সরকারকে ক্ষমতায় জিইয়ে রাখা।
- বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে কখনো শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর হতে না দেয়া।
- বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নতুন প্রজন্মকে অঙ্কুরে বিনাস করে দেবার জন্য এবং তাদের মনমগজে এদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের ভিত্তি এবং আত্মসম্মান-আত্মপরিচয়ের সোপান ইসলাম, বাংলাদেশী জাতিয়তাবাদ ও স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে উৎপাটিত করে ফেলার জন্য বাংলাদেশে একটি ভারত নির্দেশিত, স্বকীয়তা বিবর্জিত, আদর্শহীন, জড়বাদী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে উচ্ছৃংখল ও আদর্শহীন করে তাদেরকে ধর্ম বিমুখ, দেশপ্রেমহীন ও ভোগবাদী রূপে গড়ে তোলার জন্য এদেশের 'প্রিন্ট মিডিয়া' ও 'ইলেকট্রনিক মিডিয়া' (Electronic Media) - দু'ক্ষেত্রেই শক্তিশালী ভারতপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, শিল্পী ও কলাকুশলীদের ক্ষমতায়ন ও প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা। এর মাধ্যমে প্রচার ও তথ্যপ্রবাহ, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নাটক, সিনেমাসহ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগের ব্যবস্থা এবং সিনেমা, টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, নাট্য ও সাংস্কৃতিক গ্রুপ ইত্যাদি সেক্টরে কৌশলে পুরোপুরি ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।
- বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে ভারতপন্থীদের প্রভাবকে শক্তিশালী করার জন্য রাজনৈতিক অঙ্গনে সব সময় মতানৈক্য, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, বিভাজন ও নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- বাংলাদেশে ভারতের উপরোক্ত নীলনক্শা বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য এখানে নানা ধরনের, নানা ছদ্মাবরণের অসংখ্য এন.জি.ও. (NGO), সংবাদপত্র, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ইনফরমেশন টেকনোলজি

ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য সদন ইত্যাদি সৃষ্টি এবং এসবের মাধ্যমে ভারতের চরসৃষ্টি, মগজধোলাই ও গুপ্তচরবৃত্তি চালানো।

- বাংলাদেশের প্রশাসন, শিক্ষা, সামরিক ও নিরাপত্তা বিভাগসমূহ, সাংবাদিকতাসহ অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ন বিভাগে ভারতপন্থী লোক নিয়োগ, অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং ভারতীয় নিয়ন্ত্রণের সম্প্রসারণ।
- উপরোলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা তার সরকারের নির্দেশে এবং বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাসের সক্রিয় সহযোগীতায় ১৯৭২ সাল থেকেই অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশে আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রের নীলনকশা বাস্তবায়নের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে 'র' (RAW) -এর বাস্তবায়িত অপতৎপরতার কিছু খতিয়ান নিম্নে বিধৃত করা হল ঃ
- **খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান ঃ** ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ভারতপন্থী আওয়ামী সরকারের পতন ঘটার পর বাংলাদেশে আবার ভারতীয় প্রভাবাধীন একটি সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য ঐ বছরের ৩ নভেম্বর (১৯৭৫) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ও 'র' (RAW)-এর মদদে একটি ভারতপন্থী অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। (*এস. মহাপাত্র, স্ট্র্যাটেজিক এ্যানালাইসিস, ১৯৯১ পৃঃ ৫৮৯*)

- **নতুন পর্যায়ে কাদেরিয়া বাহিনী গঠন ও সীমান্ত সংঘর্ষ ঃ** ১৯৭৫ পর *বাঘাসিদ্দিকী* খ্যাত কাদের সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনীর ১০/১৫ হাজার সদস্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে 'র' (RAW) -এর সহযোগিতায় আবার বাংলাদেশের সীমান্তে হামলা শুরু করে। তাদের আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ভারত সব সময় সহযোগিতা করে। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর কয়েক শ' সদস্যসহ বহু সংখ্যক বাংলাদেশী নিহত ও আহত হয়। (*ইনসাইড 'র' অশোক রায়না '৮৮*)

- **পার্বত্য -চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী 'শান্তিবাহিনী' গঠনঃ** ভারতের সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে ও 'র' (RAW) -এর পরিকল্পিত কৌশলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এক-দশমাংশ মাঠ-ভৌমাঞ্চল পার্বত্য-চট্টগ্রামে চাকমা উপজাতীয় বিপথগামী বিক্ষুদ্ধ তরুণদের উসকিয়ে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী এক অপতৎপরতার জন্ম দেয়া হয় তথাকথিত 'শান্তিবাহিনী' সৃষ্টির মাধ্যমে। এ শান্তিবাহিনীর হাতে এ পর্যন্ত কয়েক শ' নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বি.ডি.আর. পুলিশ, আনসারসহ) সহ প্রায় ৩০,০০০ হাজার বাংলাদেশী নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ

আবার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর তথাকথিত *পার্বত্য শান্তিচুক্তি* স্বাক্ষরের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদের ভারতীয় নীলনক্‌শা বাস্তবায়নের প্রথম পর্বের কাজ সম্পন্ন হয়। ১৯৯১ সালে শান্তি বাহিনীর অন্যান্য উপদলের সঙ্গে মতভেদ হওয়ার পর এর তৎকালীন প্রধান নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা শান্তিবাহিনী গঠনে ও এর পরিচালনায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW) -এর সংযোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন (*সূত্র: ১১ জুন '৯৩, ইনকিলাব*)। ১৯৯৪ সালের ৩১ আগষ্ট ডেইলী নিউ নেশন পত্রিকার "RAW's Role in Furthering India's Foreign Policy" শীর্ষক নিবন্ধে দিল্লীর "Institute of Strategic Studies" -এর রিসার্চ ফেলো অশোক বিশ্বাস লেখেন, "RAW is now involved in training rebels of Chakma tribes and 'Shanti Bahini' who carry out subversive activities in Bangladesh"। *(৩১ আগষ্ট '৯৪ নিউ নেশন)*

- **প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডঃ** বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশের মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ভারতপন্থী-আওয়ামী-বাকশালী রাজনৈতিক দর্শন থেকে মুক্ত করে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ও 'সর্বশক্তিমান আলাহ্‌র উপর চরম আস্থা' সম্বলিত রাজনৈতিক দর্শন সমৃদ্ধ আধিপত্যবাদ বিরোধী রাজনীতি উপহার দেন, তাঁর করুণ মৃত্যুর পেছনেও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW) -এর গোপন হাত ছিল বলে খোদ ভারতীয় সংবাদভাষ্যে প্রকাশ। ভারতীয় সাপ্তাহিক *Weekly Sunday* -এর ১৮তম সংখ্যায় প্রকাশিত "The second oldest Profession" শীর্ষক এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, "পচাঁত্তর - এর আগষ্টে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের মৃত্যুতে তৎকালীন RAW - এর চীফ আর.এন. কাও এবং তার সহকারী শঙ্কর নায়ার দারুনভাবে আহত হন এবং বাংলাদেশের নতুন সরকারের নায়ক জিয়াউর রহমানকে হত্যার পরিকল্পনা নেয় 'র'। ১৯৮০ সালে ভারতের ক্ষমতার মস্‌নদে ইন্দিরা গান্ধী আবার আসীন হলে 'র' (RAW) -এর পরিকল্পনা মাফিকই জিয়াকে চট্টগ্রামে সেনাবিদ্রোহে হত্যা করা হয়"। উলেখ্য, ঐ নৃশংস হত্যাকান্ডের অন্যতম নায়ক মেজর জেনারেল মঞ্জুরের সঙ্গী মেজর অনন্তসহ RAW-এর আরো ক'জন অনুপ্রবিষ্ঠ বা প্যান্টেড এজেন্ট চিরতরে ভারতে পালিয়ে যায় - যাদেরকে আজ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনা যায়নি।

- **বাংলাদেশে "হিন্দুল্যান্ড" বা "স্বাধীন বঙ্গভূমি" আন্দোলন ঃ** ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW) -এর সূক্ষ্ম পরিকল্পনায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল ভূ-ভাগ নিয়ে গাঙ্গেয় দ্বীপ অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী বৃহত্তর জেলা খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ফরিদপুর নিয়ে "হিন্দু-ল্যান্ড" বা "স্বাধীন বঙ্গভূমি" নামের একটি ভারতীয় স্যাটেলাইট রাষ্ট্র গঠনের গভীর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। এ উদ্দেশ্য সাধনে 'র' *বঙ্গসেনা* নাম দিয়ে হিন্দু তরুণদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে দিচ্ছে বলে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় খবর বেরুচ্ছে। আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগের সাবেক নেতা ডাক্তার কালিদাস বৈদ্য (ছদ্মনাম: পার্থ সামন্ত) পশ্চিমবঙ্গের ভাষানীপুরের রাজেন্দ্র রোডের চিত্ত রঞ্জন ছুত্তারের বিশাল বাসভবনে অফিস খুলে সার্বিক ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে 'র' -এর সহযোগীতায় তার অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীন বঙ্গভূমি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে বাংলাদেশের হিন্দু নেতা নীমভৌমিক, নীরদ মজুমদার, বাসুবাবু, রামু মজুমদার প্রমুখের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের সাংবাদিক ইরতিজা নাসিম আলীকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে 'বঙ্গভূমি' আন্দোলনের নাটেরগুরু ডাঃ কালিদাস বৈদ্য সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, *"বাংলাদেশ যদি ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য (State) হয়ে নীরবে ভারতের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় তবেই তাদের বঙ্গভূমির স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ হবে"। (Dhaka Courier, May, 1989)*
- **বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW) -এর অন্যান্য অপতৎপরতার উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি নিচে দেয়া হল ঃ**

➢ ১৯৯১ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন মেজর পদবীর অফিসার 'র' - এর কাছে গোপন তথ্য পাচারের অপরাধে ধরা পড়ে। এর উপর ভিত্তি করে অধুনালুপ্ত *The Telegraph (২৩ জুন, ১৯৯২)* -এ "Retd. Major Face Trial for Passing secrets to India" শীর্ষক একাট সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

➢ রাজশাহীতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'RAW' -এর পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির মামলায় গয়ানাথ, বলরাম মাহাতো, রামপদ সরকার, সঞ্জীবরায়, চিত্তরঞ্চন, তাপশ মিশ্র ও আয়েজুদ্দিনের বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশীট প্রদান করে। অভিযুক্তরা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট (রা.বি.), হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ, এবং এনজিও কারিতাস -এর কর্মী ও সদস্য। অভিযুক্তদের মধ্যে গ্রেফতারকৃত গয়ানাথ, বলরাম ও রামপদ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবান বন্দী দিয়েছে। *(পুলিশ রিপোর্ট, গোদাগাড়ি থানা, রাজশাহী সেপ্টেম্বর '৯২)*

- 'র' (RAW) -এর গোপন মদদে ১৯৯২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকার জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে *বিশ্বশান্তি পরিষদ* ও *বাংলাদেশ শান্তি পরিষদ* নামক দু'টি চরম ভারতপন্থী সংগঠন আয়োজিত এক সেমিনারে "দু'বাংলাকে এক হয়ে যাওয়া" তথা বাংলাদেশকে ভারতে মিশে যাবার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখা হয়। *(সংবাদভাষ্য, সকল জাতীয় সংবাদপত্র, ২৯ ফেব্রুয়ারী '৯২)*
- সাম্প্রতিক কালে নিহত প্রখ্যাত বামপন্থী সাংবাদিক শামছুর রহমানের লিখিত *রিপোর্ট বঙ্গভূমি ওয়ালাদের ব্লুপ্রিন্ট* থেকে জানা যায় ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত ভারত থেকে প্রায় ১৪ হাজার ছয়শ' ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে এসে চিরতরে রয়ে গেছে। *(২৩ মে '৯২ দৈনিক বাংলা)*
- দিল্লীর সাংবাদিক মি.অশোক.এ. বিশ্বাসের লেখা নিবন্ধ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী বি.এন.পি সরকারকে বিশ্বের দরবারে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী ও মৌলবাদী বলে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই 'র' (RAW) কুখ্যাত তসলিমা নাসরিনকে দিয়ে "লজ্জা" নামক বই লেখায়, ছাপায় এবং পরবর্তীতে তাদের ভারতীয় ও বাংলাদেশীয় সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। (৩১ *আগষ্ট '৯৪, দি নিউ ন্যাশন)*
- ভারতীয় সংবাদ সূত্রেই জানা যায় যে, বাংলাদেশে অশান্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা, সামাজিক বিভাজন, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক দারিদ্র সৃষ্টির পেছনেও 'র' (RAW) অত্যন্ত নিপুন ও ধুরন্ধর তৎপরতায় কাজ করে চলেছে। তাদের কিছু নৈরাজ্যময় কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

  ক) ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি (ঘাদানিক) গঠন ;

  খ) দেওয়ানবাগ দরবার, কাদিয়ানী ফেৎনা, হাক্কানী মিশন, 'অপারেশন ফতোয়াবাজ' প্রভৃতি ধর্মীয় সংঘাত ও অপচক্র সৃষ্টির পেছনে মূল অর্থায়ন ও চক্রান্ত;

  গ) 'গণ-আদালত' গঠন ও 'মুক্তিযোদ্ধা- অমুক্তিযোদ্ধা' এর বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমে জাতিকে বিভক্ত ও দূর্বল করার চক্রান্ত;

  ঘ) তসলিমা নাসরিন, দাউদ-হায়দার, সরদার আলাউদ্দিন, হাসান ইমাম, আরজ মাতুব্বর গং-দের পেছনে অর্থ ব্যয় ও তাদের ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতার প্রচার ও প্রসার;

  ঙ) বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যাপক মাদকাশক্তি, পাপাচার, অপকর্ম, যৌনাচার ছড়িয়ে দিয়ে তাদের জীবনীশক্তি ও ভবিষ্যৎ ধ্বংস্ব সাধনের জন্য তাদের মধ্যে ব্যাপক হারে ফেন্সিডিল, হিরোইন, মদ, গাঁজা, বু-ফিল্ম, নোংরা পর্নো ম্যাগাজিন সুপরিকল্পিতভাবে ছড়ি ছড়িয়ে দেয়া;

চ) নানা ধরণের আই.টি. (Information Technology Companies/Institute) ও কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও এন.জি.ও ইত্যাদির মাধ্যমে গোপনে RAW -এর নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দেয়া। জানা যায় যে বাংলাদেশের বর্তমানে সচল প্রায় সব ক'টি বড় I.T. ইনস্টিটিউশনের পরিচালনায় বিপুল সংখ্যক ভারতীয় প্রশিক্ষক এবং গুপ্তচর কাজ করে চলেছে।

ছ) বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থীদের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সম্মিলিত শক্তি চারদলীয় ঐক্যজোটে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার মাথুর নামধারী জনৈক কর্মকর্তা কারাগারে অন্তরীণ জাতীয় পার্টির প্রধান এরশাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে কারাগারে গিয়ে দেখা করেন ও অজানা প্রস্তাব দেন বলে খবরে প্রকাশ। তার সঙ্গে ছিল ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত শাহ্‌তা জারার। *(১৮ মার্চ ২০০১, প্রথম আলো)*

জ) RAW -এর নানা ব্যর্থতায় ভারত এখন আরো শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা "Defence Intelligence Agency" বা ডিয়া (D.I.A.) গঠন করার ছদ্মবরণে অফিস খোলার ও লোক নিয়োগের তৎপরতাও চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা যায়।

ঝ) বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন সমূহ নস্যাৎ ও ধ্বংস সাধনের জন্য RAW - বাংলাদেশের ও বিদেশের নানা সংবাদ মাধ্যমে (সংবাদপত্র, টি.ভি. চ্যানেল, রেডিও) বিপুল অর্থায়ন ও বিনিয়োগ করে চলেছে। ভারতের বিখ্যাত ব্যবসায়ী গ্রুপ আম্বানীদের "দি রিল্যায়েন্স গ্রুপ" -এর অর্থায়নে বাংলাদেশের একটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারত ও RAW প্রকাশ্যে ইসলাম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তি, দল ও সংস্থাসমূহের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে।

ঞ) বাংলাদেশের একটি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সূত্র থেকেই জানা যায় যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW) দেশের একটি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ ছাত্রাবাসের সকল গেইট ও দেয়াল কাঁটাতার দিয়ে কঠোরভাবে বন্ধ করে দিয়ে শুধু একটি গেটে (তা'ও বন্ধ রেখে) কঠোর পুলিশ প্রহরা বসিয়ে ভিতরের কয়েকটি গোপন কক্ষে জটিল আধুনিক গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি বসিয়ে একটি শক্তিশালী কম্যান্ডো গ্রুপ (নগর ক্র্যাক কম্যান্ডো বা Urban Crack Command বা UCC) গঠনে তৎপর রয়েছে। RAW দেশের ভারত বিরোধী বিভিন্ন দেশ প্রেমিক ইসলামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য নানা স্থানের সকল বড় বড়

বোমা হামলা ও হত্যাকান্ডের পেছনে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে চলেছে। যশোরের উদিচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, ঢাকার পল্টনের সিপিবির সভায় বোমা হামলা, রমনার ছায়ানট অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, গোপালগঞ্জে শেখ হাসিনার অনুষ্ঠানে কথিত বোমা বিস্ফোরণসহ সকল চক্রান্তের পেছনেই মূলত: ভারতীয় গোয়েন্দা চক্র জড়িত। 'র' জড়িত বলেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার এসব উৎঘাটনে ও বিচারে অগ্রসর হতে উৎসাহ দেখায়নি।

ট) ১৯৯২ সালের "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা" ৪২তম সংখ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং 'RAW' -এর বাংলাদেশ ডেস্ক্-এর প্রধান ড. জয়ন্ত রায় জনৈক বাংলাদেশী গবেষকের সঙ্গে মিলে এক অতীব ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধ লেখকদ্বয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এন.এস.আই. (N.S.I.) সম্পর্কে তীব্র ঘৃনা ও অসম্মানজনক কথা লেখেন। নিবন্ধটিতে ভারতীয় ঐ অধ্যাপক নামধারী গোয়েন্দা প্রবর-আরোও মন্তব্য করেন যে, "বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে বেসামরিক কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসা প্রয়োজন" (পৃঃ ৩৬)। নিবন্ধটিতে লেখকদ্বয় বলেন, "N.S.I. দেশের ডাকাতি, সন্ত্রাস ও অশান্তির ইন্ধনদাতা" (পৃঃ ৩২)। একজন ভারতীয় হয়েও শ্রী জয়ন্ত কিভাবে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সম্পর্কে এমন মন্তব্য করতে সাহস পায় তা সবাইকে অবাক করে। *(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৪২, ১৯৯২)*

ঠ) ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে ব্রাক্ষনবাড়ীয়া সীমান্ত অঞ্চলে (বাংলাদেশের সীমান্তের ৪/৫ কি.মি. ভিতরে) একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। ভারতীয় ঐ হেলিকপ্টারের নিহত ৮ জন আরোহী ও ক্রু-দেরকে খুব দ্রুতই তৎকালিন শেখ মুজিবের বাকশালী সরকার ভারতের কাছে হস্তান্ত-র করেন। ধারণা করা হয় ঐ বিমানটি উলফা (ULFA) বা নাগা-মিজোরা গুলি করে ভুপাতিত করেছিল। তৎকালিন আওয়ামী সরকার ঐ গুরুতর বিষয়ে কোনই অনুসন্ধান চালায়নি। এর পরে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রায় শতাধিক ভারতীয় সামরিক, গোয়েন্দা বিমান ও হেলিকপ্টার বাংলাদেশী আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। রৌমারী-পাদুয়া ঘটনার (১৮ এপ্রিল, ২০০১) পর ভারতীয় যুদ্ধ বিমান মোট ১০/১২ বার উত্তর বঙ্গের বাংলাদেশী আকাশসীমায় সম্পূর্ণ অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করলেও আওয়ামী সরকার কোন প্রতিবাদতো দূরের কথা - একটি টু শব্দও উচ্চারণে ব্যর্থ হয়। সবচেয়ে শঙ্কার কথা পাদুয়া-রৌমারী সংঘর্ষের মাত্র

কয়েক দিন পরেই চট্টগ্রাম আঃ হান্নান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের টার্মিনালের কাছে একটি ভারতীয় কোম্পানীর সার্ভে বিমান (Survey Aeroplane) দুর্ঘটনায় পড়ে বলে সকল জাতীয় সংবাদপত্রে খবর বের হয় (১৪মে ২০০১, ইত্তেফাক/ ইনকিলাব/ যুগান্তর/ প্রথম আলো/ সংগ্রাম/ জনকণ্ঠ)। আমাদের জানা মতে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিমানবন্দরে দেশের বৃহত্তর সামরিক বিমানবাহিনীর ঘাটি ও হ্যাঙ্কার রয়েছে। ঐ ভারতীয় দুর্ঘটনা কবলিত বিমানে আহত তিনজনের দু'জনই ভারতীয় নাগরিক ছিল। এরা হচ্ছে অনিল কুমার শান্নি ও জিএস ধীলন। উপরন্তু প্রকাশিত সংবাদভাষ্য মতে দুর্ঘটনা কবলিত বিমানটিতে জরীপ ও বিমান-চিত্র (Aerial photograph) সংগ্রহের জটিল ও সংবেদনশীল সকল সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ছিল। সুতরাং যৌক্তিকভাবেই ধারণা করা যায়, ভারতীয় ঐ জরীপ বিমানকে অথবা কোম্পানীকে বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সংশিষ্ট সংবেদনশীল স্থানসমূহের জরীপ কাজে নিয়োগ করায় অবশ্যই এদেশের নিরাপত্তা স্বার্থ ও গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হয়েছে। আমাদের অবাক হতে হয়, যে বৈরীভাবাপন্ন ভারত বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভূখন্ড দক্ষিণ তালপট্টি জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে; মুহুরীর চরের অর্ধেকটা গ্রাস করে নিয়েছে অবৈধভাবে; কাটা তার দিয়ে এদেশের মানুষকে যে ভারত গরু-ছাগলের মত ঘিরে দিচ্ছে এবং যে ভারত তিন-চারশ' সৈন্য (বি.এস.এফ.) পাঠিয়ে আমাদের সীমান্ত চৌকি দখলের অভিযান চালালো- সেই আগ্রাসী ভারতের একটি জরীপ কোম্পানীকে কোন যুক্তিতে বা কার স্বার্থে বাংলাদেশের চরম সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের (বিমানবন্দর সমূহের) জরীপ কাজে নিয়োগ দেয়া হল ? তারা তো (ঐ জরীপ) যৌক্তিকভাবেই ছদ্মবেশে ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার নিয়োজিত লোক অথবা সম্পর্কিত কোম্পানী হতে পারে। এ বিষয়ে দেশের দু' একটি চিহ্নিত ভারতপন্থী দৈনিক সংবাদপত্র কিছুটা যেচে পড়ে সাফাই ব্যাখ্যার রিপোর্ট প্রকাশ করলেও দেশের সরকার বা অত্র দেশ প্রেমিক সংবাদপত্রে এ বিষয়ে কোনই রিপোর্ট বা ফলোআপ রিপোর্ট বের হয়নি।

খবর : ভারতের তাঁবেদার আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ভারতের কাছে নুয়ে পড়ছে।

সৌজন্যে : দৈনিক দিনকাল

খবর : ভারতীয় হানাদারদের হামলায় দেশপ্রেমিক বিডিআর ও নিরীহ জনগণ শাহাদাতবরণ করলেও ভারতের খবরাখবর রেডিও-টিভিতে প্রচার করেনি আওয়ামী সরকার।

সৌজন্যে : দৈনিক দিনকাল

বর : ভারতীয় বাহিনীর হামলায় বাংলাদেশের বহু জনগণ হতাহত হলেও তার প্রতিবাদ
র্যন্ত করেনি মেরুদণ্ডহীন আওয়ামীলীগ সরকার।   সৌজন্যে : দৈনিক সংগ্রাম

বর : ভারতীয় আগ্রাসনে নিরব-নিথর 'স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি' ধ্বজাধারী আওয়ামী-
াকশালী বুদ্ধিজীবীরা।

সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন

সৌজন্যে : দৈনিক সংগ্রাম

শেখ মুজিবের শাসনামল
(১৯৭২-'৭৫)

ভূমিকা

শেখ মুজিবের ভাগিনা যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মনি বলেছিলেন, "আমরা আইনের শাসন চাইনা বঙ্গবন্ধুর শাসন চাই"। তার এই কথাটিই সত্য সে সময়কার (১৯৭২-৭৫) শাসনামলে। শেখ মুজিবের শাসনামলে দেশে কোন আইনের শাসন ছিলনা। ছিল শেখ মুজিবের জুলুম-নির্যাতন। প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের স্তব্ধ করার জন্যে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সশস্ত্র টপটেরর সন্ত্রাসীদের দিয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী করেনি এমন কোন কাজ পাওয়া কঠিন। চাঁদাবাজি, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, লুন্ঠন, দখল ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ।

বিরোধীদলকে নিশ্চিহ্ন করতে গঠন করা হয়েছিল বাকশাল। বিরোধী মতকে স্তব্ধ করতে ৪টি পত্রিকা বাদে দেশের সকল পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। সকল পেশার লোকজনকে একদলীয় বাকশালে যোগদানে বাধ্য করা হয়েছিল। প্রতিপক্ষ জাসদ নেতা সিরাজ সিকদার সহ ৪২ হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

শেখ মুজিবের পরিবারের লোকজনের বেপরোয়া আচরণ পুরা দেশবাসীকে নির্বাক করে ফেলেছিল। শেখ কামালের নেতৃত্বে রাজধানীতে ব্যাংক লুট, সুন্দরী গৃহবধু ধর্ষণ ও চাঁদাবাজি এক অসহনীয় মাত্রা অতিক্রম করেছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারী 'নিউজ উইক' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল "রক্ষীবাহিনী নামক একটি আধা-সামরিক বাহিনী দেশে পুনরায়, হত্যাকান্ড ও নির্যাতনে মেতে উঠেছে। বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আজো পাকিস্থানী আমলের মতোই জনগণ কেঁপে উঠে। -------- সম্প্রতি মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওকারী একটি মিছিলের উপর রক্ষীবাহিনীর মেশিনগান হামলায় কয়েকশত লোক নিহত হয়। সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সরকার ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে"। শুধু এই পত্রিকায় নয়, তখনকার সব দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় মুজিবী আমলের দুঃশাসনের খন্ড খন্ড চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল।

আমরা এখানে মুজিবী শাসনামলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হাজার হাজার দুষ্কর্মের কিছু অংশ তুলে ধরেছি। যার মাধ্যমে পাঠক বৃন্দ সেই আমলের (১৯৭২-৭৫) একটা সারসংক্ষেপ বুঝতে পারবেন বলে আশা করি।

সাংবাদিক নির্যাতন ও সংবাদপত্র বন্ধকরণ (১৯৭২-৭৫)

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের ৩টি স্তম্ভের পাশাপাশি আরো একটি স্তম্ভের কথা বলা হয়। সেটি হল সংবাদপত্র। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে সংবাদপত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংবাদপত্রবিহীন গণতন্ত্র কল্পনাতীত। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী সরকার তার নবনীতির কারণে বেছে নেয় সংবাদপত্র দমন দলনের পথ। নিউজপ্রিন্টের সরবরাহ কমিয়ে বিজ্ঞাপন না দিয়ে এবং বিরুদ্ধবাদী সংবাদপত্র অফিসে দলীয় মাস্তান ও পুলিশ পাঠিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এছাড়া বিশেষ ক্ষমতা আইন ও অন্যান্য আইনের মাধ্যমে পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা করা কোন নতুন ঘটনা ছিল না। ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন তৎকালীন বাকশাল সরকার তার স্বৈরশাসন কায়েমের অংশ হিসেবেই 'The Newspaper (Anouncement of Declaration) Act. 1975' জারি করে ৪টি দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়া বাকী সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়। ঐ ৪টি সংবাদপত্র বাংলাদেশ অবজারভার, বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক বাংলা এবং দৈনিক ইত্তেফাক সরকার অধিগ্রহণ করে। ১৭ জুন Act.টি কার্যকর হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশের পথ এভাবে রুদ্ধ করে দেয়ার ফলে শত শত সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সেবী রাতারাতি বেকার হয়ে পড়ে। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীন বিকাশ বিরোধী প্রতিবাদে ১৯৭৬ সাল থেকে সাংবাদিক সমাজ এবং গণতন্ত্রবাদী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ১৬ জুন পালন করে আসছে সংবাদপত্রের 'কালো দিবস' হিসাবে।

১। ২৯ মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৭৩ অপরাহ্নে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দৈনিক গণকণ্ঠ সম্পাদক জনাব আল মাহমুদ অভিযোগ করেন, "গণকণ্ঠ অত্যন্ত বেআইনীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে তথাকার পৌনে তিনশত সাংবাদিক ও কর্মচারী বেকার হইয়া পড়িয়াছেন। সাংবাদিক ও কর্মচারীদের মুহূর্তমাত্র সময় না দিয়া অফিস হইতে কাজ অসমাপ্ত রাখা অবস্থায় বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (*৩০ মার্চ ১৯৭৩, ইত্তেফাক*)

২। ১১ আগষ্ট '৭৩ গভীর রাত্রে চট্টগ্রাম হইতে টেলিযোগাযোগে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পুলিশ দৈনিক 'দেশবাংলা' পত্রিকা অফিসটি ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে এবং পত্রিকার সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক ও স্টাফ রিপোর্টারকে আটক করিয়াছে। (১২ *আগষ্ট '৭৩ ইত্তেফাক*)

৩। ভারতে কমদামে নিউজপ্রিন্ট রপ্তানী করে সরকার বছরে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা হারাতে বসেছে। বিশ্ববাজারে প্রতি টন ৩৫০ ডলার মূল্য হলেও ভারতে মাত্র ১৯৭ ডলার দরে রপ্তানী করা হচ্ছে।

৪। অননুমোদিত সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য পুলিশ ১৯৭৩ সনের মুদ্রণ ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও রেজিষ্টেশন) আইনের অধীনে ২৭ জানুয়ারী ('৭৫) তারিখে ঢাকার ৫৪ সি, টিপু সুলতান রোডস্থ দৈনিক সংবাদপত্র গণকণ্ঠের অফিস 'সীজ' করিয়াছে। (*২৯ জানুয়ারী ১৯৭৫, ইত্তেফাক*)

দুর্ভিক্ষ

আওয়ামী-বাকশালীদের ১৩৩৮ দিনের ভয়াবহ দুঃশাসনের সবচাইতে মারাত্মক অধ্যায় হচ্ছে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা এতদঞ্চলে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষকেই কেবল হার মানায়নি; বরং বিশ্বের তাবত এলাকায় আবির্ভূত দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে যায়। সঠিক হিসাব না থাকলেও আনুমানিক এবং ন্যূনতমপক্ষে ১০ লাখ লোক এই দুর্ভিক্ষে অকাল মৃত্যুবরণ করে। জাতীয় অর্থনীতিতে এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা যতটুকু আঘাত হানে তার চাইতে কয়েকশ' গুণ বেশী আঘাত হানে সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায়। ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের জন্যে সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধু কিংবা কুমারী মেয়েরা বাধ্য হয়ে পৃথিবীর সবচাইতে আদিম ও ঘৃণিত পেশা দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হয়। জঠর জ্বালা নিবারণের জন্যে জঘন্যতম নির্মমতায় নিমজ্জিত হয়ে পেটের সন্তানকে বিক্রি করা কিংবা গলা টিপে হত্যা করার মত মারাত্মক প্রবণতাও সমাজ জীবনে প্রচ্ছন্ন হয়ে দেখা দেয়। জমি-জমা, বাস্তু-ভিটা, সহায়-সম্বল ইত্যাদি পানির দরে বিক্রি করার মতো হাজারো লক্ষ বেদনাদায়ক ঘটনার সৃষ্টি হয়। ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচার জন্যে কোন কিছু বিনিময় করার সামর্থ কিংবা অবকাশ যাদের ছিল না তাদের অনিবার্য পরিণতি ছিল অকাল মৃত্যু কিংবা মৃত্যুর আগে ডাস্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট খাবারের সন্ধান করা অথবা কুকুরের খাবারে ভাগ বসানোর ন্যায় মর্মন্তুদ প্রয়াস। নিম্নে সে সময়ের পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু সংবাদ তুলে ধরা হলঃ

- খাদ্যের অগ্নিমূল্য কমাওঃ লজ্জা নিবারনের বস্ত্র দাও। (*২০ আগষ্ট ১৯৭২, ইত্তেফাক*)
- গ্রামে হাহাকারঃ চাল দাও। আটা কচু সিদ্ধ খেয়ে আর কদ্দিন ? (*২৩ আগষ্ট ১৯৭২, গনকণ্ঠ*)

- গরীব মানুষ খাদ্য পায় নাঃ টাউটরা মজা লুটছে। গুণবতীতে চাল আটা নিয়ে হরিলুটের কারবার। (*১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, গণকণ্ঠ*)
- কুড়িগ্রাম পৌরসভার সন্নিকটস্থ মন্ডলের হাট নিবাসী রোস্তম উল্লাহর স্ত্রী রাবেয়া খাতুন তার আদরের দুলালী ফাতেমা খাতুনকে (৭ বছর) পৌরসভার জনৈক পিয়ন জমির উদ্দিনের কাছে মাত্র ছ'টাকায় (৬ টাকা) বিক্রি করে দেয়। (*২১ অক্টোবর ১৯৭২, গণকণ্ঠ*)
- নাগরপুর থানার একটি ইউনিয়নের রেশনিং-এর কাপড় কালোবাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। (*১৮ মার্চ '৭৩, সোনার বাংলা*)
- এখানে ওখানে ডোবায় পুকুরে লাশ। (*১৫ এপ্রিল '৭৩, ইত্তেফাক*)
- চাউল আকাশচুম্বীঃ আটা উধাওঃ কেরোসিন ও ঔষধ নাই, শুধু আছে অনাহার আর আত্মহত্যা। (*২২ এপ্রিল ১৯৭৩, ইত্তেফাক*)
- চালের অভাবঃ পেটের জ্বালায় ছেলেমেয়ে বিক্রি। হবিগঞ্জে হাহাকারঃ অনাহারে এ পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু। (*৩ মে ১৯৭৩, গণকণ্ঠ*)
- কোন কোন এলাকায় মানুষ আটা গুলিয়া ও শাক-পাতা সিদ্ধ করিয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করিতেছে। (*৩ মে ১৯৭৩, ইত্তেফাক*)
- অনাহারে দশজনের মৃত্যুঃ বিভিন্ন স্থানে আর্ত মানবতার হাহাকারঃ শুধু একটি ধ্বনিঃ ভাত দাও। (*১০ মে ১৯৭৩, গণকণ্ঠ*)
- লতাপাতা, গাছের শিকড়, বাঁশ ও বেতের কঁচিডগা, শামুক, ব্যাংঙের ছাতা, কচু-ঘেচু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যে পরিণতঃ গ্রামাঞ্চলে লেংটা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি। (*১০ মে ১৯৭৩, ইত্তেফাক*)
- চাল ১৩০ টাকাঃ আটা ৯০ টাকাঃ লুঙ্গী ৩০ টাকাঃ শাড়ী ৭০ টাকাঃ রেশন ৭ মাস বন্ধঃ ক্ষুধাকাতর পাবনার পাঁচালীঃ অনাহারে মৃত্যু। আত্মহত্যা ও ইজ্জত বিক্রির করুণ কাহিনী। (*১ জুন ১৯৭৩, গণকণ্ঠ*)
- স্বাধীন বাংলার আরেক রূপঃ জামাই বেড়াতে এলে অর্ধ উলঙ্গ শ্বাশুড়ী দরজা বন্ধ করে দেয়। (*১৫ জুলাই ১৯৭৩, সোনার বাংলা*)
- জঠর জ্বালায় ঝিনাইদহে ৪৪১ জনের আত্মহত্যা। এর মধ্যে ৩৩৮ জনই মহিলা। (*৭ অক্টোবর ১৯৭৩, সোনার বাংলা*)

- ১০ দিনে জামালপুর ও ইশ্বরদিতে অনাহার ও অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ৭১ জনের মৃত্যু। (*২৭ আগষ্ট ১৯৭৪, গণকণ্ঠ*)
- একজন অসুস্থ ব্যক্তি গাইবান্ধার রেলওয়ে প্লাটফরমে প্রচুর পরিমাণে বমি করে। বমির মধ্যে ছিল ভাত ও গোশত। দু'জন ক্ষুধার্ত মানুষ জঠর জ্বালা সংবরন করতে না পেরে সেগুলো গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে। (*৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, সোনার বাংলা*)
- শীর্ণকায় কঙ্কালসার আদম সন্তান। মৃত না জীবিত বুঝিয়া উঠা দুস্কর। পড়িয়া আছে রাজধানী ঢাকা নগরীর গলি হইতে রাজপথের এখানে সেখানে। হাড় জিরজিরে বক্ষে হাত রাখিয়াই কেবল অনুভব করা যায় ইহারা জীবিত না মৃত। (*২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, ইত্তেফাক*)
- ডিবুয়াপুরা ইউনিয়নের বলগাছিয়া গ্রামের জনৈক মজিদ তার ১ বছরের একটি মেয়েকে ক্ষুধার তাড়নায় পুকুরে নিক্ষেপ করেছে। (*৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, গণকণ্ঠ*)
- ১ নভেম্বর ('৭৪) রাত্রে বিবিসির খবরে প্রকাশ ঃ বেসরকারী হিসাবে বাংলাদেশের দূর্ভিক্ষে এ পর্যন্ত লক্ষাধীক লোক প্রাণ হারাইয়াছে। (*২ নভেম্বর ১৯৭৪, ইত্তেফাক*)
- দুর্ভিক্ষ ঃ ৫ লাখ মরেছে ঃ ১০ লাখ মরবে। (*৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪, গণকণ্ঠ*)

১৯৭৪ সালে আওয়ামীলীগ আমলে খাদ্যাভাবজনিত কারণে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক যেভাবে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে, একাডেমিক বিশ্লেষণে তাকে কোন ভাবেই দুর্ভিক্ষ বলা যায় না। কারণ সে সময়েও রাজনীতি-অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণকারী একশ্রেণীর অসাধু লোক নিজেদের গুদামে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য মজুত রেখে দেশের অগণিত মানুষের মৃত্যু কিনে নিয়েছে, শতাব্দীর চরমতম বিভীষিকার উদাহরণ প্রদর্শন করে ক্ষুধায় জর্জরিত অনাহারে মৃত মানুষগুলোর গলিত শব নিয়ে ব্যবসা আর মানবতার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়াবেগ আর অনুভূতির ওপর করেছে বক্র ক্রুরবৃদ্ধাঙ্গুষ্টি প্রদর্শন।

রাজনৈতিক নিপীড়ন

- প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করে বলেন, ''আমার নির্বাচন দেয়ার উদ্দেশ্য আছে। এমনি এমনি নির্বাচন দেই নাই। ৭ই মার্চের পর আমি 'লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেবো'। (*১৮ ডিসেম্বর ১৯৭২, গণকণ্ঠ*)
- পল্টনে মুজিববাদী ছাত্র সংগঠনের সভায় ভাষণ, 'জাতির জনকের বিরুদ্ধে কুৎসাকারীকে বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন করা হবে'। (*৬ জানুয়ারী ১৯৭৩, গণকণ্ঠ*)
- গোপালগঞ্জে মোজাফ্‌ফর ন্যাপ প্রার্থীসহ বিরোধী দলীয় ৫ জন কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা। (*১১ মার্চ ১৯৭৩, গণকণ্ঠ*)
- 'রক্ষীবাহিনী' নামের যে আধাসামরিক বাহিনীটি সরকারকে আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে সহায়তা দান করছে, সেই বাহিনীটিকে নিয়ে চলছে নানা মহলে নানা প্রতিক্রিয়া। দেশের বিরোধী দলগুলোর প্রত্যেকটিই রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বিশেষ দলের লেজুড় বৃত্তি করার অভিযোগ এনেছে। সারাদেশে দুস্কৃতিকারী দমানোর নামে এই বাহিনীর লোকেরা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধীদেরকে শেষ করার কাজে নেমেছে বলে বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করে আসছে। (*৪ মে ১৯৭৩, গণকণ্ঠ*)
- ১৪ জানুয়ারী থেকে ৩ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা শহরের শহরতলী ও নারায়ণগঞ্জে জনসভা, গণজমায়েত পথসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ। (*১৪ জানুয়ারী ১৯৭৪, ইত্তেফাক*)
- রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার বিশেষ ক্ষমতা ও নিপীড়নমূলক আইন সম্পর্কে আতাউর রহমান খান, 'আমরা কেয়ামতের কাছাকাছি এসে পৌছেছি'। (*২০ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪, গণকণ্ঠ*)
- প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান এক আদেশবলে জাতীয় সংসদের সদস্যদের জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্যপদ গ্রহণের সময় সীমা ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত নির্ধারিত করিয়াছেন। (*১৮ এপ্রিল ১৯৭৫, ইত্তেফাক*)

সিরাজ সিকদার-এর উপর রাজনৈতিক নিপীড়নঃ সিরাজ সিকদার ছিলেন একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার পরে তিনি শেখ মুজিবের বাকশালী শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠন করেন। রক্ষীবাহিনী তার উপর যে বর্বরতম হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে তা যে কোন মানুষকে শিহরিত করে। নিম্নে ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলঃ-

'১৯৭৫ সালের ১লা জানুয়ারী দলের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য সিরাজ সিক্‌দার চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। এর আগেই তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।' ডিসেম্বরের ('৭৪) প্রথম থেকেই তাঁর দলের উপর ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসে। হরতাল আহ্বানের কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রেফতার হয়ে যায় দলের বহু কর্মী। অপরদিকে, ১৯৭২ সালে দল পরিচালনার জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে তার অবস্থা দাঁড়ায় ২ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি। সেপ্টেম্বর মাসে আর একজন সদস্য ব্যক্তিগত ব্যর্থতার কারণে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অব্যহতি নিলে অবশিষ্ট থাকেন শুধু সিরাজ সিক্‌দার।
সিরাজ সিক্‌দারের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ছাত্রাবস্থায়। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি জড়িত ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-এর সঙ্গে, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি হিসাবে। ১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারী কয়েকজন সমমতাবলম্বীকে নিয়ে সিরাজ সিক্‌দার গঠন করেন 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন' নামে একটি প্রস্তুতি সংগঠন। এ আন্দোলনকে তিনি পার্টিতে রুপান্তরিত করেন ১৯৭১-এর ৩ জুন বরিশাল জেলার পেয়ারা বাগানে। ১৯৭২-এর ১৪ জানুয়ারী এ পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে সাংগঠনিকভাবে এর বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন সময়ে কিছু ব্যক্তি এই সংগঠনে যোগদানে (লেঃ কর্ণেল (অবঃ) জিয়াউদ্দীন প্রমুখ) এবং সবশেষে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের হরতালের প্রতি মওলানা ভাসানীর সমর্থন সিরাজ সিক্‌দারের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে শক্তি জোগায় ১৯৭৪ সালে ব্যাপক বিকাশের সময় তার দলে ব্যাপক অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ ঘটে যা পরবর্তীতে তার গ্রেফতারের কারণ হয়। মুজিবের রক্ষী বাহিনীর হাতে গ্রেফতারের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে এবং বিভিন্ন সূত্রে সে সংবাদ পেয়ে সিরাজ সিকদার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ১৯৭৫-এর ১৫ জানুয়ারী আরো গোপন অবস্থানে সরে যাবেন। আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকে কাজকর্ম করবেন। তাঁর দলের অভিযোগ, ১৯৭৪ সালেই জনৈক উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার 'ভাগ্নে' এই দলে সদস্যপদ লাভ করে। তার মাধ্যমে সিরাজ সিকদারকে পাঠানো সবগুলো সতর্ককরণ চিঠিই পুলিশের হাতে পৌছে যায়। এভাবেই পুলিশ জানতে পারে, তাঁর চট্টগ্রাম বৈঠকের (১লা জানুয়ারী) কথা। চট্টগ্রাম (হালিশহর) বৈঠকে আমন্ত্রিত সবাই উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষ হওয়ার আগে, নিয়ম ভঙ্গ করে একজন সদস্য বাইরে চলে যায় ঘুরে আসার কথা বলে। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। নিরাপত্তার কারণে, সে বৈঠক নির্ধারিত হয়েছিল,

সকলের আগে 'কুরিয়ার'সহ বেরিয়ে যাবেন সিরাজ সিক্‌দার। সেই মোতাবেক মহসিনকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়েন সিরাজ সিকদার। কিছুদূর গিয়েই তাঁরা একটি বেবিচ্যাক্সী ভাড়া করেন। এসময়ে তাঁর পরনে ছিল ঘিয়া রংয়ের প্যান্ট, টেট্টনের সাদা ফুলশার্ট, চশমা এবং হাতে ছিল একটি ব্রীফকেস। হালিশহরে বৈঠকের শেষে যখন তাঁরা বেবীট্যাক্সীতে উঠছেন ঠিক সে সময় একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাদের কাছে 'লিফট' চায়। সিরাজ সিক্‌দার জানতে চান, আপনি কোথায় যাবেন ?

আমি সামনে গিয়েই নেমে যাব।
অন্য ট্যাক্সি দেখুন না।
আপনারা যদি আমাকে নিয়ে যান, তাহলে খুবই উপকার হয় (অনুনয়ের সঙ্গে)।
এরপরই সে ট্যাক্সিতে চড়ে বসে।
পুলিশ পূর্বের সংবাদ অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহর থেকে হালিশহর পর্যন্ত পুরো রাস্তার উপর কড়া নজর রেখেছিল। বেবীট্যাক্সী যখন নিউমার্কেটের (বিপনী বিতান) কাছে আসে তখনই সেই অনাহূত সহযাত্রী ট্যাক্সী থামাতে বলেন। এ পর্যায়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুন্তক লাফ দিয়ে বেবীট্যাক্সীর সামনে গিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে ড্রাইভারকে থামাতে বলে। ভয়ে ড্রাইভার রোধ করে গতি। আর সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে স্টেনগান হাতে সাদা পোশাকের পুলিশ ঘেরাও করে ফেলে বেবীট্যাক্সী। ঘটনার আকস্মিকতায় জমে যায় লোকজন। একজন ভদ্রলোকের এই পরিণতির কারণ জানতে চাইলে জবাব দেয়া হয় সে একজন পলাতক কালোবাজারী। তাই তাকে এভাবেই গ্রেফতার করা হচ্ছে। বেবীট্যাক্সী আটক করার পরপরই ছয় জন স্টেনগানধারীর এক জন এগিয়ে এসে তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয় এবং চোখ বেঁধে ফেলে। সঙ্গী মহসীনেরও ঘটে একই পরিণতি। গ্রেফতারের পর সিরাজ সিক্‌দারকে নিয়ে যাওয়া হয় ডবলমুরিং থানায়। এই থানা থেকেই খবর পাঠানো হয় দেশের সর্বত্র এবং জরুরী ভিত্তিতে সেদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম-ঢাকা বিমানে বন্দিদের জন্য আসন সংগ্রহ করা হয়।
৬টা ৪৫ মিঃ যে বিমানে তাদের ঢাকা নিয়ে আসা হয়, সে বিমানটি যাত্রী নিয়ে আসছিল কক্সবাজার থেকে। চট্টগ্রাম পৌঁছার পর, নিয়মভঙ্গ করে ঢাকাগামী যাত্রীদের নেমে যেতে বলা হয়। যাত্রীরা নেমে গেলে একটি বিশেষ গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয় বন্দিদের। ককপিটের পরেই, সামনের চারটি আসন সংরক্ষিত করা হয় তাদের জন্য। কিন্তু বিমান ছাড়ার সময় দেখা দেয় বিপত্তি। বিমানের পাইলট বন্দি অবস্থায় কোন যাত্রীকে বহন করতে অস্বীকার করেন। কিছুটা বাকবিতন্ডার পর ঢাকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় বাংলাদেশ বিমানের শেষ ফকার বিমানটি। ঢাকা পৌঁছানোর পরপরই তড়িঘড়ি করে নামিয়ে দেয়া হয় যাত্রীদের। তারপর বিমানটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় হ্যাঙ্গারের কাছে। আগে থেকেই পেছনের গেট দিয়ে আসা পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছিল সেখানে। বিমান থেকে অবতরণের সময় আকস্মিকভাবে পুলিশের জনৈক ইন্সপেক্টর দৌড়ে এসে তার বুকে লাথি মেরে চিৎকার করে ওঠে, 'হারামজাদা' তোর বিপ্লব কোথায়

গেল ? এ পর্যায়ে উপস্থিত পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা হস্তক্ষেপ করে নতুন আক্রমণের হাত থেকে সিরাজ সিক্দারকে রক্ষা করে। এবং মন্তব্য করে, 'এত অস্থির হচ্ছেন কেন .... ঘরে নিয়েই আমরা দেখে নেব।' বিমানবন্দর থেকে সিরাজ সিক্দারকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে। সেখানে 'পাগলা ঘন্টা' বাজিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয় সবাইকে। সর্বত্র একটা সাড়া পড়ে যায়। স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস ঘিরে ফেলে কয়েক শত পুলিশ। এ বক্তব্য-সে সময়ে আটক প্রত্যক্ষদর্শী এক রাজনৈতিক কর্মীর। সিরাজ সিকদারকে যখন গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয় তখন সামনে-পেছনে ছিল কড়া প্রহরা। জানা যায়, সাইরেন বাজিয়ে সরিয়ে দেয়া হয় রাস্তার লোকজন। স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয় 'কমিউনিস্ট টাস্ক ফোর্স' এবং রক্ষীবাহিনীর উপর। স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিয়ে আসার পর কর্তাব্যক্তিদের ভিড় বেড়ে যায়। সেখানে সবাই এই মূল্যবান বন্দিকে এক নজর দেখতে চায়। কিন্তু নিরাপত্তার কারণেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারী বা পুলিশের সুপারিনটেনডেন্টর পদমর্যাদার নিচে কাউকে দেখার অনুমতি দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন পুলিশের নিম্ন পর্যায়ের কর্মীরা। গ্রেফতার সত্ত্বেও, পুলিশের লোকজনও প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারেনি। স্পেশাল ব্রাঞ্চে আটক তাঁর দলীয় কয়েকজন কর্মীকেও এজন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রাথমিক হেফাজতেই তাঁর ওপর চালানো হয় অত্যাচার। অত্যাচারে কথা বের করতে ব্যর্থ হলে শুরু হয় কথোপকথন :

আপনি জানেন আপনার পরিণতি কি?

আমি জানি একজন দেশপ্রেমিকের পরিণতি কি হতে পারে তা ভালোভাবেই আমার জানা আছে।

: আমরা আপনাকে শেখ সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলব।

: জাতীয় বিশ্বাসঘাতকের কাছে একজন দেশপ্রেমিক ক্ষমা চাইতে পারে না।

: তাহলে আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

: সে মৃত্যুকেই আমি গ্রহণ করব। সে মৃত্যু দেশের জন্য, গৌরবের মৃত্যু।

(কথোপকথন রেকর্ডকৃত ভাষ্য নয়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য মহল যা জানিয়েছেন তার মর্মার্থ এই)। এ পর্যায়ে টেলিফোনে নির্দেশ আসে উপস্থিত পুলিশের জনৈক উর্ধ্বতন কর্তার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় যায় পাততাড়ি গুটানোর পালা। কোথায় যেতে হবে সবাই জানেন না। জানেন শুধু কয়েকজন। রাত দশটার দিকে প্রস্তুতি চলতে থাকে এক সাঁজোয়া বাহিনীর। এবারের গন্তব্যস্থল গণভবন। সেখানে অধীর আগ্রহে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অপেক্ষা করছেন বেশ কিছু লোক। রাত সাড়ে দশটায় পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় সিরাজ সিকদারকে হাজির করা হয় শেখ মুজিবের সামনে। তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তখন আলাপে ব্যস্ত ছিলেন তার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে। এসময় সিরাজ সিক্দার প্রশ্ন করেন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাউকে বসতে বলার সৌজন্যবোধ কি আপনার নেই ? সঙ্গে সঙ্গে পেছনে থেকে একজন পুলিশ সুপার এগিয়ে এসে পিস্তলের বাট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন। গণভবনে কথা কাটাকাটির

পর তাঁকে নিয়ে যেতে বলেন শেখ মুজিব। রাত তখন বারোটা। মধ্যরাতেই সোরগোল বেধে যায় শেরেবাংলা নগরের তৎকালীন রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টারে। তাড়াহুড়া করে সেখানে আটক অন্যান্য বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হয় অন্যত্র। সমগ্র এলাকা আলোকিত করে জ্বালিয়ে দেয়া হয় সার্চ লাইট। পুরো এলাকা কর্ডন করে ফেলে রক্ষীবাহিনী। সকলের মুখে গুঞ্জন, ফিস্‌ফিসানি। তখনও কেউ জানে না, কাকে নিয়ে আসা হচ্ছে! রাত সোয়া বারোটায় তৎকালীন রক্ষীবাহিনী প্রধান অপারেশন প্রধানসহ হেডকোয়ার্টারে আসেন। এসেই ব্যাটেলিয়ন কোয়ার্টার গার্ড থেকে সিরাজ সিকদারের দলের দু'জন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে হেড-কোয়ার্টার গার্ডে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন। রাত সাড়ে বারোটায় মহসিনসহ সিরাজ সিক্‌দারকে নিয়ে আসা হয় রক্ষীবাহিনী হেড-কোয়ার্টারে। তারপরই একজনকে আর একজনের কাছ থেকে আলাদা করে নেয়া হয়। রক্ষীবাহিনী হেড-কোয়ার্টারে দায়িত্ব দেয়া হয় পুলিশের বিশেষ টিম ও রক্ষীবাহিনীর ১১ ব্যাটেলিয়নের এসপি কোম্পানীর উপর। পরবর্তী প্রহরগুলোয় তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। ২রা জানুয়ারী ভোর পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় তাঁকে আটক রাখা হয় রক্ষীবাহিনী হেড-কোয়ার্টারে। ২রা জানুয়ারী '৭৫ সকালে সিরাজ সিকদারকে কড়া প্রহরাধীনে নিয়ে যাওয়া হয় সাভারে। চারটি ডজ গাড়ি ও একটি টয়োটা গাড়ি অনুসরণ করে তাঁকে। সাভারে তাঁকে সারাদিন রেখে দেয়া হয় তৎকালীন রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে। সন্ধ্যার পর পুলিশের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত হন সেখানে। রাত ন'টার দিকে তাকে আনা হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেকটু এদিকে। সেখানেই হাত বেঁধে রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে বিপ্লবী সিরাজ সিকদারকে গুলি করা হয় বলে অনুমান করা হয়। পার্শ্ববর্তী এলাকার বসবাসরত স্থানীয় বাসিন্দারা যারা গুলির শব্দ শুনেছেন, তারা কেই ভয়ে বের হননি। ভেবেছেন সে সময়ের নিত্যদিনের মতোই একটি ঘটনা। পরদিন, অনেকেই রাস্তার উপর দেখেছেন জমাট বাঁধা রক্তের দাগ। মৃত্যুর পর তার লাশ নিয়ে আসা হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চে। সেখান থেকে নেয়া হয় কন্ট্রোল রুমে। তারপর পাঠান হয় মর্গে। ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বীর এমনি মৃত্যু এদেশে বা বিদেশে নতুন কোন ঘটনা নয়। কিন্তু নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যু ঘটলে তা নিয়ে দেখা দেয় প্রশ্ন। তাই প্রশ্ন উঠেছিল চারু মজুমদারের মৃত্যুকে নিয়ে, চে-গুয়েভারার মৃত্যুকে নিয়ে, হাসান নাসিরের মৃত্যুকে নিয়ে। ১৯৭৮ সালে চে-গুয়েভারার মৃত্যু সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করতে হয়েছে বলিভিয়ার প্রাক্তন সরকার প্রধানকে। কিন্তু শেখ মুজিবকে এই হত্যাকান্ড নিয়ে কোন স্বীকারোক্তি দিতে হয়নি। বরং জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে হুংকার ছেড়ে শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?' বাংলদেশের পরবর্তী নির্বাচনে অন্যতম ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় সিরাজ সিকদারের মৃত্যু। প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতাকে সাংবাদিক সম্মেলনে জবাব দিতে হয় এ প্রশ্নের, জনসভায় ব্যাখ্যা করতে হয় পরিস্থিতি। এ প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট জিয়াও বলেছেন, 'আইন তাঁর নিজস্ব পথ বেছে নেবে।' সিরাজ সিকদারের পিতা দাবী করেছেন তদন্ত। জনগণ দাবী করেছেন তদন্ত। এখন প্রশ্ন-কখন এ ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশিত হবে শ্বেতপত্র?

রক্ষীবাহিনী

ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছিল যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শান্তি রক্ষার পথে বড় রকমের বিপর্যয় আসা মোটেই অপ্রত্যাশিত হবে না। এই সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে ভারতীয় উপদেষ্টাদের পরামর্শ অনুযায়ী 'রক্ষীবাহিনী' নামে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের মূল ধারণাটি কোলকাতা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মনেই রেখাপাত করেছিল। ধারনা করা হয়েছিল যে, এই বাহিনী হবে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত। দেশের অভ্যন্তরে আইন রক্ষার জন্য এই বাহিনী পুলিশকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে এবং প্রয়োজনবোধে সেনাবাহিনীকেও সাহায্য করবে । এরই ফলস্বরূপ গঠিত হয় রক্ষীবাহিনী। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরিচালিত করলেও এই বাহিনী সরকারের কোন নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল না। জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ অভিযোগ করতেন যে, রক্ষীবাহিনী ছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একটি সম্প্রসারিত অংশমাত্র। কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ নয়, তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত রসদও ভারত থেকে আসত। এদের পোশাকের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর পোশাকের সাদৃশ্য ছিল এবং জনগণ প্রায়ই ভারতীয় বাহিনীকে রক্ষীবাহিনীর নির্মাতা বলে দাবী করতো। যাইহোক, মুজিব সরকারের আসল উদ্দেশ্য ছিল বামপন্থীদের চিরতরে খতম করা এবং এ কাজের সহায়তায় রক্ষীবাহিনীকে কাজে লাগানো। যারা উগ্রজাতীয়তাবাদী হয়ে হিটলারের ইহুদী নির্মূলের পথ অনুসরন করে। পরবর্তীতে তারা উগ্রবাদীত্বের চরম সীমানা লংঘন করতে থাকে। শত শত নিরাপরাধ নারীদের তারা ধর্ষণ করে, উলঙ্গ করে হাটায়, নির্মম অমানুষিক অত্যাচার চালায়, মায়ের সামনে শিশুদের হত্যা করে, মা'কে শিশুর রক্তপানে বাধ্য করে, বৃদ্ধ -যুবকদের সারিবেঁধে গুলি করে হত্যা করে। এ জঘন্য কাজে তারা মেশিনগান, কামান পর্যন্ত ব্যবহার করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা আগুন দিয়ে হত্যা করে। নিম্নে সারাদেশ জুড়ে সংঘটিত নির্মম হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনার সামান্য কয়েকটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

১। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের এক রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প মুজিবের পতনের পর উঠে গেলে সেখানে এক গণকবর আবিষ্কার করা হয়। এখানে ৬০টি নর-কংকাল পাওয়া যায়।

২। রাজশাহীর তানোরে রক্ষীবাহিনী বিরোধী সাম্যবাদী দলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চালিয়েছিল সংগঠিত হত্যাকান্ড। জাসদ গঠনের পর পরই শাসক দলের সশস্ত্র গুন্ডাবাহিনী হত্যা করে জাসদ নেতা সিদ্দিক মাস্টারকে (১২ নভেম্বর, ১৯৭২)

৩। বাজিতপুর সাম্যবাদী দলের ১২৬ জন কর্মী, সমর্থক ও পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হন।

৪। শরিয়তপুরের বামপন্থী নেতা শান্তি সেনের স্ত্রী অরুণা সেনের উপর রক্ষীবাহিনী নারকীয় অত্যাচার চালায়। অরুণা সেন নিজেও অনেক হত্যার সাক্ষী। তাঁর কয়েকটি বিবৃতি হল:

- ১৯৭৩ সালের আগষ্ট মাস। উত্তর রামভদ্রপুর গ্রামে রক্ষীবাহিনী এলো। মুক্তিবাহিনীর ফজলু ও বামপন্থী দলের সমর্থক কৃষ্ণ ধরা পড়লো তাদের হাতে। প্রথমে তাদের খুব মারলো । কৃষ্ণ ছিল স্কুল শিক্ষক। রক্ষীবাহিনীর কাছে পানি খেতে চেয়েছিল কৃষ্ণ, রক্ষীরা তাকে প্রস্রাব খেতে দিয়েছিল। কাহিল ও বিধ্বস্ত কৃষ্ণ উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। একজন রক্ষীবাহিনী বললো, 'আমার সোনার বাংলা' গাইতে জান ? কৃষ্ণ বললো হ্যাঁ জানি। 'গাও তাহলে'। কৃষ্ণ কাঁদতে কাঁদতে গাইলো। কিছু খেতে দিলো না, ধরে নিয়ে যায় তাদের। আর ফিরে আসেনি তারা।
- ৬ ফেব্রুয়ারী ('৭৪) রাত্রি ভোর না হতেই রক্ষীবাহিনী অরুণা সেনকে ঘুম থেকে তুললো। অরুণা বাইরে এসে দেখলেন রীনাও রয়েছে। এদেরকে নিয়ে দুইমাইল দূরে ভোদরগঞ্জ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়। ক্যাম্পে গিয়ে দেখলেন স্থানীয় অনেক লোকও সেখানে রয়েছে। প্রত্যেককে অমানুষিক নির্যাতন করা হল। কিছুক্ষণ পর রানীকে দোতলায় নিয়ে অত্যাচার করা হল। প্রায় আধা ঘন্টা পর রীনার চিৎকার স্তিমিত হয়ে গেল।
- রক্ষীবাহিনী রীনাকে ধরার পর তার বোন সোনালীকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। সোনালী গ্রামের বিপ্লব নামক এক ছেলের সহায়তায় অনেক পথ হেটে ঢাকাগামী লঞ্চে চড়ে পালিয়ে যায়। রক্ষীবাহিনী এসে বিপ্লবকে ধরে খুব মারধর করে তার মা ও বাবাকে ডাকিয়ে আনে। তারপর বিপ্লবকে বলে 'কলেমা পড়'। বাধ্য হয়ে বিপ্লব হিন্দু হয়েও কলেমা পড়ে। এরপর বলে, 'সেজদা দাও পশ্চিম মুখী হয়ে'। ভয়ে বিপ্লব তাই করে। যখন সেজদা দিলো, পেছন থেকে বেয়োনেট চার্জ করে বাবা -মা ও অনেক

লোকের সামনে তাকে হত্যা করলো। বেয়োনেট চার্জ করার সময় রক্ষীদের একজন বললো, 'মুসলমান হয়েছো, এবার বেহেস্তে চলে যাও"।

- বর্ষাকালে ২১ জন মুক্তিযোদ্ধা ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এলে রক্ষীবাহিনী তাদের নদীতে হত্যা করে। ২১ জনের সেই ব্যাচটি ছিল বামপন্থী চিন্তার অনুসারী। এ সময় আঘাত এলো সিরাজ সরদারের উপর। তিনি পালিয়ে সিরাজ সিকদারের বাহিনীতে আশ্রয় নিলেন। সিরাজ সিকদার তাকে চারজন গার্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। একদিন রক্ষীবাহিনীর শওকত আলী দলবলসহ বিনোদপুর গ্রামে শরিয়তপুরের এক বৈঠকের নাম করে তাকে নিয়ে আসে। এরপর ঘেরাও করে প্রথমে তারা সিরাজ সিকদারের দেয়া চারজন গার্ডকে হত্যা করে। আর সিরাজ সরদারকে নিয়ে যায় নদীতে। নৌকার মাঝির বর্ণনা মতে, 'প্রথমে তারা সরদারের হাতের কব্জি কাটে, তারপর পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং শরীরের মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ফেলে দেয়'।

৫। কালিগঞ্জে রক্ষীবাহিনী যায় ১৯৭২ সালের আগষ্ট মাসে। নলডাঙ্গার গোপাল ছিল রক্ষীবাহিনীর ইনফরমার। গোপাল রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেয় কানাই, হাসিম ও হাকিমকে। তারা এদের উপর নারকীয় অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করে। যশোর রোডের সাত মাইল নামক স্থানে তাদের লাশ পাওয়া যায়।

৬। ১৯৭৩ সালের ১১ই অক্টোবর রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন ওয়াজেদ আলী ও কামরুজ্জামান। হেমন্ত সরকারও তাদের সঙ্গে ছিলেন, তবে তিনি পালাতে পেরেছিলেন। ধরা পড়ার পর তাদের খোঁজ বা লাশ কিছুই পাওয়া যায়নি। ঢাকায় এনে তাদের হত্যা করা হয়েছিল।

৭। কালিগঞ্জ থেকে সাত মাইল দূরে কানাবাজারের কাছে রক্ষীবাহিনীর যে ক্যাম্প ছিল সেখান থেকে শেখ মুজিবুরের মৃত্যুর পর গণকবর আবিস্কৃত হয়। বহু ছেলেকে ধরে এনে এখানে হত্যা করা হত। বামপন্থীদের হত্যা করার জন্য রক্ষীবাহিনী এখানে চাতুরীর আশ্রয় নিতো। তারা লোক মারফত বামপন্থী ছেলেদের বল খেলার জন্য আহ্বান জানাতো। খেলা শেষে চায়ের নিমন্ত্রণ করতো। এরপর চোখ বেঁধে নিয়ে যেতো বধ্যভূমিতে। হত্যা করে মাটি চাপা

দিয়ে রাখতো। কামাবাইলের গহর মালেক, ঝিনাইদহের বেইনবুর ওয়ালিউর রহমান (মতিয়ার), কোটচাঁদপুরের রুদ্রপুর এলাকার বঙ্কিয়া গ্রামের মহিউদ্দীন, তার বোন পাঁচ মাসের গর্ভবতী রাশিদা, রাশিদার স্বামী আমজাদ, গহর আলী, রফিকুল ইসলাম, হাসান আলী (জসিম), নূর মোহাম্মদ প্রমুখকে পিটিয়ে হত্যা করে কালিগঞ্জের রক্ষীবাহিনী।

৮। কালিগঞ্জের পাইক পাড়ার শাখাওয়াত হোসেনের বিবৃতি অনুসারে - রক্ষীবাহিনী গ্রামে কার্ফু দিয়ে লোকজনদের ধরে পেটাতো। আব্দুল আজিজের স্ত্রীকে এতো বেশী মারতে শুরু করে যে, সহ্য করতে না পেরে পরনের কাপড় ফেলে উলঙ্গ হয়ে দৌড়াতে শুরু করে।

৯। চুয়াডাঙ্গার মতিউর রহমান বাবু ছিলেন একজন জনপ্রিয় ও ত্যাগী বামপন্থী কর্মী। পরিবহণ ইউনিয়নসহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। তাকে হত্যার পর রক্ষীবাহিনী তার পনের বছরের আরেক ছোট ভাইকেও হত্যা করেছিল।

১০। ঘোড়াশালে জাসদ করার অভিযোগে বাপ রইসুদ্দিন প্রধান ও বড় ভাই আহসান উদ্দিনকে রক্ষীবাহিনী এমন নির্মমভাবে অত্যাচার করে যে, অত্যাচারের জের হিসেবেই তারা মৃত্যুবরণ করেন।

১১। মুজিব সরকারের আমলে ঈশ্বরগঞ্জ থানা সদরে একটি মাত্র কলেজ ছিল। এই কলেজের ৩৩ জন শিক্ষার্থী রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হয়। এই আমলে এই থানায় বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া ১টি উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অভাবে প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল। অনেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছে এধরনের নির্বিচারে গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানান। তাদের অভিযোগ ছিল যে, ছেলেরা স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। অভিভাবকরা জানান, ভয়ে তাদের ছেলেদের বইপত্র মাটির নীচে গর্ত করে লুকিয়ে রেখে ছাত্র পরিচয় গোপন করা হতো।

১২। সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উল্টোভাবে পা বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে ঈশ্বরগঞ্জ থানায়। মুগাটোলা ইউনিয়নের তাকাটিয়া গ্রামের হাশেমকে আটরা হাইস্কুলের পাশের জামগাছে ঝুলিয়ে হত্যা করে তার লাশ কয়েকদিন সেখানেই লটকে রাখা হয়েছিল। অনেক জায়গায় রক্ষীবাহিনী লাশ ফেলে সাদা কাগজে স্বাক্ষর বিহীন আদেশ নামা লাশের পাশে রেখে আসতো।

ইসলামপুর মাদ্রাসার কাছে এক জায়গায় তিনটা লাশের পাশে এ রকম স্বাক্ষরবিহীন আদেশ নামা পাওয়া যায়। এই আদেশ নামায় স্থানীয় জনগণের উদ্দেশ্যে লাশগুলো পুঁতে ফেলার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিল। এতে লেখাছিল 'অবশ্যই যেন লাশগুলো তিনদিন পরে মাটি চাপা দেয়া হয়'।

১৩। রক্ষীবাহিনী রাজীবপুরের হাশেমকে মারার দিন মধুপুর বাজারের আশে পাশের গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে তাকে ঘুরিয়েছে। প্রতিটি বাড়ীর সামনে হাশেমকে দিয়ে বলিয়েছে "আমাকে মধুপুর স্কুলের মাঠে আজ বিকেল পাঁচটায় গুলি করে মারা হবে আপনারা সবাই আসবেন"। নিজের মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে হতভাগ্য হাশেম। তবুও সে রক্ষীবাহিনীর বেয়োনটের খোঁচা সহ্য করতে না পেরে তাদের শেখানো বুলি তোতা পাখির মতো আউড়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী, এইদিন পাঁচটায় মধুপুর স্কুলের মাঠে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল হাশেমকে।

১৪। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে রক্ষীবাহিনী পেট্রল নামক একজন জাসদ কর্মীকে জামালপুর স্কুলের মাঠে প্রকাশ্যে প্রহার করতে করতে হত্যা করে। তাকে হত্যার পূর্বে রক্ষীবাহিনী স্কুলের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মাঠে আসতে নির্দেশ দেয় এই হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করার জন্য।

মুজিববাহিনী

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভারতীয় মেজর জেনারেল ওবালের পরিচালনায় দেরাদুনে ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মী, বিশেষ করে তোফায়েল গ্রুপের ছেলেদের নিয়ে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' (বিএলএফ) নামে অপর একটি বাহিনী বা মুজিববাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর কাজ ছিল মুক্তিবাহিনীতে কর্মরত কমিউনিস্ট বা প্রগতিশীল কর্মীদের হত্যা করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বজায় রাখা। স্বাধীন হবার পরে বাংলাদেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবুর রহমান এই বাহিনীকে ত্রাস সৃষ্টিকারী রক্ষীবাহিনীর সহযোগী হিসেবে কাজ করায়। তবে এরাও সময়ে অসময়ে দেশের সর্বত্র নিরীহ মানুষের উপর নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে।

১। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পরই বাজিতপুর এলাকায় হিন্দুদের বাড়ী দখল, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, ডাকাতিসহ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হয়। জনগণ প্রতিবাদ করলে তাদের উপর নেমে আসে চরম নির্যাতন।

২। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম শ্রেণীর নেতা ছিলেন প্রফেসর ইয়াকুব আলী। ১৯৭৩ সালে আগষ্টের মাঝামাঝি সময়ে অধ্যাপক ইয়াকুব কলেজে যাবার পথে মুজিববাহিনী তাকে গ্রেফতার করে। প্রতিবাদ করেন বি.এ. পড়ুয়া ছাত্র মুজিবুর রহমান। মা বাবার একমাত্র ছেলে মুজিবুরকে পরবর্তী কালে মুজিববাদীরা গ্রেফতার করে ও নির্মমভাবে হত্যা করে। এর কয়েকদিন পরে তারা কমিউনিস্ট পার্টির এক কর্মী আতাউর রহমানকে হত্যা করে।

৩। ইকোরটিয়ার রশিদকে তার বাপের সামনে গুলি করে হত্যা করে। বাপ আব্দুল আলীর হাতে কুঠার দিয়ে মুজিববাহিনী বলেছিল, তার ছেলের মাথা কেটে দিতে। নির্যাতনের এক পর্যায়ে আব্দুল আলী বাধ্য হয়েছে ছেলের মাথা কেটে দিতে। সেই মাথা নিয়ে ফুটবল খেলেছে মুজিববাদীরা। একই এলাকায় ইউসুফকে হত্যা করার পর তার লাশ গাছে টানিয়ে রেখেছে তিনদিন।

৪। জাসদ কর্মী ফারুক ধরা পড়েছিল খাগড়ায়। সেখানকার মুজিববাদীরা তাকে বাজিতপুর মুজিববাদীদের হাতে তুলে দেয়। আওয়ামী লীগ অফিসে তাকে নির্মমভাবে পেটাতে পেটাতে হত্যা করা হয়।

৫। বাজিতপুরের অন্য এক কমিউনিস্ট কর্মী মাহবুবকে হত্যা করা হয় থানা থেকে নিয়ে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা থানায় চিঠি দিয়েছিল মুজিববাদীদের হাতে মাহবুবকে তুলে দিতে। বাজিতপুর থানার দারোগা তাকে মুজিববাদীদের হাতেই তুলে দেয়। সীমার মুজিববাহিনী মাহবুবের একটি একটি করে অঙ্গ কেটে লবন-মরিচ মাখিয়ে ধীরে ধীরে নারকীয় কায়দায় হত্যা করে। তার কাটা হাত-পা ও মাথা তার আত্মীয়-স্বজনকে দেখিয়ে বলেছে, 'মুজিববাদীদের বিরুদ্ধে রাজনীতি করলে এই অবস্থা হবে'।

৬। হোমায়পুরের নূরুল ইসলাম বাজিতপুর এসেছিল বিয়ের বাজার করতে। তাকে ধরে বুকে মই দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে নারকীয়ভাবে হত্যা করেছে মুজিববাদীরা।

৭। চুয়াত্তরের প্রথম থেকে পচাঁত্তরের আগষ্ট পর্যন্ত ছয়ছিড়া, দিঘিরগাঁও, বালিয়াগাঁও, দুলালপুর, গুরুই প্রভৃতি এলাকা ছিল বিরানভূমি। দল বেঁধে মুজিববাদীরা গ্রামে

এসে লোকজনকে দাড় করিয়ে অকথ্য নির্যাতন করতো। লাঠি-বুটের আঘাত ছাড়াও হাত-পা বেঁধে উল্টো করে নাকে গরম পানি ঢেলেছে বহু লোককে। মহিলাদেরও রেহাই দেয়নি। কমিউনিস্ট কর্মীদের শেল্টার দিতো বলে সন্দেহ করে পিরোজপুর আমিনার সারাগায়ে কম্বল জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুণ লাগিয়ে দেয়। ঝলসানো শরীর নিয়ে এখনো ধুঁকছে আমিনা।

৮। তৎকালীন পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা জনাব আয়ুব রেজা চৌধুরীর কিশোরগঞ্জের দু'জন কর্মী শাহজাহান ও রায় মোহনকে মুজিববাদীরা হত্যা করে। এদের মধ্যে রায়মোহন ছিলেন বি.এস-সি শিক্ষক। মুজিববাদীরা তাকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে মেরে নদীতে ফেলে দেয়। তার লাশের কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

৯। ভেড়ামারার কমলপুরের ফজিলাতুন্নেসাকে হত্যা করেছিল মুজিববাদীরা। তার হত্যাকান্ড সম্পর্কে তার ভাই ফিরোজ আহমেদ বলেন, 'একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার বোন আওয়ামী লীগের যেসব ছেলেদের শেল্টার দিয়েছেন, খাইয়েছেন, ১৯৭৩ সালের ১১ জুন আমার বোনকে তারাই হত্যা করল। তিনি পূর্ব-বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিলেন এবং কিছু বামপন্থী নেতা আমাদের আত্মীয় এই অপরাধেই তাকে হত্যা করা হয়'।

১০। গাইবান্ধায় রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদীদের চরম নির্যাতন নেমে আসে শেখ মুজিবের এক দলীয় শাসন প্রবর্তনের পূর্ব মুহূর্তে। এর আগে '৭৩ এর প্রথম দিকে গাইবান্ধার জাসদ সভাপতি সুজাকে (বীর বিক্রম) মুজিববাদীরা হত্যা করে। তার অপরাধ ছিল জাসদ করা। কালীবাড়ী নামক স্থানে দিনের বেলায় তাকে গুলি করে হত্যা করে। সুজা সাহেবের সঙ্গী ফিরোজ ঘটনাচক্রে বেঁচে যায়।

১১। মুজিববাদীরা আলমডাঙ্গা থেকে চারজন মুজিববাদ বিরোধী ছেলেকে ধরে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রোডের তিনদন্তের ব্রীজের নীচে (আমজুনের কাদে) জবাই করে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে একজনের গলা পুরোটা কাটেনি। মুজিববাদীরা চলে যাবার পর সে গলা ধরে ধরে হেটে কালাতির বাজারে আসে এবং একজন ডাক্তারের নিকট যায়। পরবর্তীতে সেই মুজিববাদীরা মটর সাইকেলে করে সেখানে যায় এবং বেঁচে যাওয়া লোকটিকে মটর সাইকেলের পেছনে বেঁধে

হেচড়িয়ে আবার সেই ব্রীজের কাছে নিয়ে যায়। রাস্তার মাঝেই অবশ্য সে মৃত্যুবরণ করে।

১২। মুজিববাদীরা প্রথম ধাক্কায় হত্যা করে শ্রমিকনেতা মোকাদ্দেস, তোয়াহা গ্রুপের মনিরুজ্জামন তারা এবং জাসদের নজরুল ও বদরুলকে। কওমী জুটমিলের ক্যাম্পে জবাই করে হত্যা করা হতো। মোকাদ্দেস ছিলেন নামকরা মুক্তিযোদ্ধা, ১৯৭৩ সালের মার্চ তাকে রায়পুরের কাছে প্রকাশ্য দিনের আলোয় হত্যা করা হয়। তিনি জাসদ সমর্থিত শ্রমিক লীগ করতেন। খুনিদের কিছুই হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা সেলিম ও সালামকে পাবনায় নিয়ে এসিড দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে। শাহজাদপুরে হেলাল, কুরবান, ছগির দীলিপসহ অনেককে হত্যা করা হয় গুলি করে। ছলিম উদ্দিন ও মতিনকে একইভাবে হত্যা করা হয়েছে।

১৩। সিরাজগঞ্জে ১৯৭৩ সালেই শ'পাচেক বামপন্থী ও জাসদ কর্মী মুজিববাদীদের হাতে নিহত হয়েছিল বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিল। পুরো মুজিব আমলে এখানে নিহতদের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। শাহজাদপুর, কাজিরপুর, বেলকুচি, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার মানুষ এক ভয়ানক দুঃস্বপ্নময় সময় অতিবাহিত করেছেন তখন। এক প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার আপন ভাই নিজে একটি ক্যাম্প চালাতো। সেখানে মানুষ হত্যা ছাড়াও যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে ফুর্তি করতো। কোন সুন্দরী মেয়ে তাদের চোখে পড়লে তার বাপকে নির্দেশ দেয়া হতো মেয়েকে রাতে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতে। নির্দেশ অমান্য করলে মৃত্যু ছিলো অবধারিত। তাই সে সময় বিশেষ করে শাহজাদপুর এলাকায় যুবক ও যুবতীরা পালিয়ে গিয়েছিল অন্য এলাকায়। কারন, যুবকরা ছিলো তাদের বন্দুকের খোরাক এবং যুবতীরা লালসার।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

একনজরে

শেখ হাসিনার দুঃশাসনের খতিয়ান

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ, আপনারা এতক্ষণ কাপালিক, রক্তলোলুপ, ফ্যাসিষ্ট বাকশালীদের যোগ্য উত্তরসূরী শেখ হাসিনার কর্মীদের দুঃশাসন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, লুটতরাজ, খুন, চাঁদাবাজি, লাশ বিকৃত করনের উন্মত্ততা, ইসলামদলন, নিপীড়ন, বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে জেলে ঢুকানো, মামলা-হামলা, সভা-সমাবেশে বাধাদান ও পন্ডকরণ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হলেন। এ নতুন অধ্যায়ে গবেষক ও বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের জন্য পূর্বে বিধৃত বিষয়াবলীর একটি সার-সংক্ষেপ তৈরী করা হল। উদ্দেশ্য এই যে, বিশেষ ও বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত কলেবরকে সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকের নিকট পৌছানো এবং আওয়ামী লীগ ও তার দোসরদের অপশাসন ও পৈশাচিকতা সাধারণ পাঠকের নিকট সহজভাবে উপস্থাপন - ***সম্পাদকমন্ডলী***

নির্বাচনী ওয়াদা ভঙ্গে আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগের ইতিহাসই ওয়াদাভঙ্গের ইতিহাস। তারা যা' বলেছে -করেছে তার ঠিক উল্টোটা। তাদের '৯৬-র নির্বাচনী ইশতেহার-এ যা যা বলেছে তার কোনটিই পালন করেনি। আর যা করেছে তার কোনটিই ইশতেহারে ছিল না। মিথ্যাচার, প্রতিশ্রুতির খেলাফ আর কথার ফুলঝুরিতে তারা জাতিকে বোকা বানাতে ওস্তাদ।

● **স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার:** আওয়ামী লীগ '৯৬ এর নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছিল তারা ক্ষমতায় এলে 'রাষ্টীয় জীবনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে' (নির্বাচনী ইশতেহারের ধারা ১/ক) এবং 'রাষ্ট্র পরিচালনায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে' (ধারা ১/খ)। আওয়ামীলীগের ৫ বছরের শাসনামলে আইনের শাাসন পরিণত হলো **'হাসিনার শাসনে'**। বিরোধী দলকে দমন করার জন্য প্রনয়ন করা হলো তথাকথিত 'জননিরাপত্তা আইন'। ঐ আইনে ঠুন্‌কো অজুহাতে হাজার হাজার বিরোধীদলীয় কর্মীকে গ্রেফতার, নির্যাতন করা হলেও শাসকদলের ক্ষেত্রে ঐ আইনের প্রয়োগ দেখা যায়নি। দেশের আইনের রক্ষক পবিত্র আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ কয়েকজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে লাঠি মিছিল, চাপাতি-রামদা মিছিল ও সশস্ত্র মহড়া এবং খোদ প্রধানমন্ত্রীর **'এক লাশের বদলায় দশ লাশ ফেলে দেওয়ার হুমকি'** রাষ্ট্রীয় জীবনে আওয়ামী লীগের 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের' কবর রচনা করল। 'জাতীয় সংসদ হবে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণী ও আইন প্রনয়নকেন্দ্র' (ধারা ১/খ)। কিন্তু বাস্তবে জাতীয় সংসদে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আলোচনার চেয়ে অশ্লীল বাক্য চর্চার 'খোয়াড়ে' পরিণত করা হল। বিরোধী দলের সদস্যদের আলোচনার কোন সুযোগ না দিয়ে সরকার দলীয়

সদস্যরা ঘন্টার পর ঘন্টা **বাপ-বেটি বন্দনা** আর বিরোধী দলকে ঘায়েল করতে ব্যস্ত থাকলেন। ৩০ বছরের পানি চুক্তি, পার্বত্য-চুক্তি, সীমান্ত সমস্যাসহ কোন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুই আওয়ামী সরকার জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেনি।

● **আইন শৃংখলা রক্ষার অঙ্গীকার** ঃ আওয়ামীলীগ 'সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ও নিরাপদ জীবন' এর অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় এসেছিল। সন্ত্রাস মুক্ত নিরাপদ জীবনতো দূরে থাক, দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলই পরিণত হল এক-একটি **'আওয়ামী কসাইখানা'**। জন্ম নিল শত শত গড ফাদার, মাফিয়া ডন। ফেনীর জয়নাল হাজারী, লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মী ছেলে (?) আবু তাহের, ছাতকের আওয়ামী এমপি বোমা মানিক, নারায়নগঞ্জের শামীম ওসমান, ঢাকার হাজী সেলিম, হাজী মকবুল, কামাল মজুমদার, আলতাফ গোলন্দাজ, হাসনাত আব্দুল্লাহ, লিয়াকত হোসেন, হান্নান, খুলনার এরশাদ শিকদার, চট্রগ্রামের মামুন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এসব সন্ত্রাসীদের হাজার হাজার সন্ত্রাসী তৎপরতা, দখল, খুন, হত্যা, ধর্ষণ, নারী-নির্যাতন আর লুণ্ঠনে লীগের 'সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ও নিরাপদ জীবন' এর অঙ্গীকারকে উলঙ্গভাবে উপস্থাপন করেছে জাতির কাছে। আওয়ামী শাসনামলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলঃ

:

- রাজাধানীতে ২৪ ঘন্টায় ৬ জন খুন। ১০ ঘন্টায় ৩ জন খুন। *(১৪ অক্টোবর ২০০০, জনকণ্ঠ; ১২ অক্টোবর ২০০০, আজকের কাগজ)*
- আওয়ামী লীগ সরকারের চার বছরের সারাদেশে ১৫ হাজার মানুষ খুন। এদের মধ্যে ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, নারী প্রভৃতি। *(১৯ জুলাই ২০০০, আজকের কাগজ)*
- বাংলাদেশ মানবাধিকার লংঘনকারীদের অভয়ারণ্যঃ এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল। *(১৫ জুন ২০০০, ইত্তেফাক)*
- চার বছরে সাড়ে ১৩ হাজার খুন। বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার ১৩ হাজার। *(২৩ জুন ২০০০, মুক্তকণ্ঠ)*
- মানবধিকার ব্যুরোর মতে শুধু অক্টোবর (২০০০) মাসে সারাদেশে ২৮০ জন খুন, ৮৫ ধর্ষণ, ১১ এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। *(২ নভেম্বর ২০০০, ইনকিলাব)*
- প্রতিদিন গড়ে ৯ জন খুন ও ১২ জন ধর্ষণের শিকার শুধু নগরীতেই। নয় মাসে ৩ শতাধিক হত্যাকান্ডঃ পুলিশের ভাষ্য। *(১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০, প্রথম আলো)*
- চার বছরে চার মহানগরীতে ১২৬৭ টি খুন। সাজা হয়নি কারও। *(৭ নভেম্বর ২০০০, যুগান্তর)*

- শুধু মে (২০০০) মাসেই সারাদেশে ৩৮৬ জন খুন । ডেমোক্রেটিক রাইটস ইনষ্টিটিউটের তথ্য। *(৪ জুন ২০০০, বাংলার বাণী/ ইনকিলাব)*
- আগষ্ট (২০০০) মাসে দেশে খুন ও ধর্ষণ ৩২০ জন। *(৩ সেপ্টেম্বর ২০০০, বাংলার বাণী)*
- প্রতিদিন ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হচ্ছে গড়ে চার জন। *(৫ সেপ্টেম্বর ২০০০, জনকণ্ঠ)*
- ২৪ ঘন্টায় ঢাকায় ৭ জন খুন। *(২৫ মে ২০০১, ভোরের কাগজ/ ইনকিলাব)*

● **সরকারী প্রচার মাধ্যম ও সংবাদপত্র ঃ** ১৯৯৬-র জাতীয় নির্বাচনের ইশতেহারে আওয়ামী লীগ সুস্পষ্টভাবে ঘোষনা করেছিল দেশে 'অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে রেডিও, টিভি ও সরকারী সংবাদ সংস্থাকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করবেন এবং ওসবের স্বায়ত্বশাসন বাস্তবায়িত করবেন' (ধারা ৭)। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো পাঁচ বছরের শাসনামলে দেশের রেডিও, টিভি পরিণত হলে **'বাপ-বেটির বাক্সে'**। সত্য প্রকাশের 'অপরাধে'(?) প্রাণ দিতে হ'ল দেশের প্রায় দশজন প্রখ্যাত সাংবাদিককে (যশোরের শামছুর রহমান, দৈনিক সাপ্তাহিক রানার সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুল, খুলনার নহর আলী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য)। আওয়ামী মাফিয়াদের হাতে বিকলঙ্গ হয়ে গেল ফেনীর ইউএনবি প্রতিনিধি টিপু সুলতান, মানবজমিনের ইমরান, জনকণ্ঠের প্রবীর শিকদার সহ প্রায় অর্ধশত সাংবাদিক। রাজনৈতিক মতানৈক্যের কারণে বোমা হামলা ও মামলা চালানো হল *ইনকিলাব, সংগ্রাম, দিনকাল, সাপ্তাহিক এভিডেন্স, জনতার ডাক, পূর্বকোণ, লোক সমাজ* প্রভৃতি সংবাদ পত্রের উপর।

● **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ** আওয়ামীলীগ ১৯৯৬-র নির্বাচনী ইশতেহারের ৮ নং ধারায় অঙ্গীকার করেছিল 'দেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদান ও সংবিধানের মৌলনীতি অনুসারে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করন'। কিন্তু, বাস্তবে বিগত পাঁচ বছরের আওয়ামী স্বৈরশাসনে দেখা গেলো ঠিক উল্টো অবস্থা। দেশের বিচার বিভাগের উপর নেমে এলো নগ্ন দলীয়করনের ও প্রভাবিকরণের নির্লজ্জ খড়গ। খোদ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী নেত্রী শেখ হাসিনা বিচারপতিদের তার দলের মনের মতো রায় না হওয়ায় হুমকি দিলেন "ঠিকঠাকমত বিচার চালাতে না পারলে বিচারকের পদ ছেড়ে দেন" বলে। বিচারকদের রায়ের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ প্রায় অর্ধ ডজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে লাঠি ও কিরিচ মিছিল বের হল ঢাকার রাজপথে। শেষ কথা হলো বিচার বিভাগেকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার কোনই উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

● **পররাষ্ট্রনীতি ঃ** ৯৬' র নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ পররাষ্ট্র নীতির ধারায় (২০নং ধারা) যা' অঙ্গীকার করেছিল বাস্তবে তা'র কিছুই বাস্তবায়িত করেনি। যা করেছে তা' হচ্ছে নির্লজ্জ ভারত তোষণ ও ভারত-নির্ভর এক গোলামীর

মানসিকতা সম্পন্ন খোঁড়া-পররাষ্টনীতির অনুসরণ ও বাস্তবায়ন। তাদের ভারতপন্থী পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়িত করতে দেশের প্রকৃত বন্ধু রাষ্ট্র সমূহের সাথে গড়ে তুলেছে বৈরী ও শীতল সম্পর্ক। ভারত তোষণের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখাতে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে তার সাথে গড়ে তুলেছে নানা অসম্মানজনক ও আত্মঘাতি সম্পর্ক ও জোট। '৩০ সালা পানি চুক্তি', 'উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন', তথাকথিত 'পার্বত্য-শান্তিচুক্তি'-সহ সব ক'টি চুক্তির অন্ত রালেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নির্লজ্জ নগ্ন 'ভারত তোষণনীতি'-র প্রতি ফলন দেখা যায়।

● **পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস ঃ** '৯৬ এর নির্বাচনী ইশতেহারের ২৫ নং ধারায় আওয়ামী লীগ পানি সম্পদ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের জন্য স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা বলে। এছাড়া আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশকে বিদ্যুতায়িতকরণ, তেল, গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানে নিজস্ব উদ্যোগে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহনের কথা উল্লেখ করলেও প্রহসনমূলক গঙ্গা পানি চুক্তি করে পানি সমস্যা সমাধানের সকল দ্বার বন্ধ করে দেয়। ফলে সমগ্র বাংলাদেশকে এক চরম শুষ্ক অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। লোনা-পানির প্রবেশের ফলে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট 'সুন্দরবন' ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জে রুরাল পাওয়ার কোম্পানী ফ্রান্সের আলসটন থেকে ১ শত ১০ কোটি টাকার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২ শত কোটি টাকা দিয়ে ক্রয় করে আলোকিত করার নামে দেশকে মূলত: অন্ধকারে দিকেই নিয়ে গেছে এ সরকার। দেশের অমূল্য প্রাকৃতিক গ্যাস রাক্ষুসী ভারতের নিকট রপ্তানীর নামে পাচার করার এক জঘন্য অপতৎপরতায় লিপ্ত আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের ইসলাম দলন ও ধর্মদ্রোহীতা

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামী লীগের প্রথম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে ধ্বংশ করে দিয়ে এদেশে ভারতের মত একটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সরকার ও সমাজ কায়েম করা। ইসলাম, মুসলিম, মসজিদ, মাদ্রাসা, ইমাম, মাওলানা, আজান, কোরআন, ফতোয়া, হাদিস নবী-রাসূল প্রভৃতি পবিত্র শব্দগুলি এজন্য আওয়ামী লীগারদের মনে চরম জ্বালা ধরায়। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় এনজিও-দের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ ইসলামের মূল্যেৎপাটনে ও উচ্ছেদে সদা তৎপর।

- **পবিত্র কোরআন পোড়ানো ও ডাস্টবিনে নিক্ষেপঃ** হিন্দুস্তানের গোলাম আওয়ামী সরকারের পোষ্য ছাত্রলীগের গুন্ডারা পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়িয়েছে মানিকগঞ্জে; ডাষ্টবিনে ফেলেছে মীরপুর, রাজশাহী ও কটিয়াদিতে। *(২৩ জুলাই ২০০০, সংগ্রাম)*
- **২৬০টি মূর্তি স্থাপনঃ** ইসলাম নির্মূলের পদক্ষেপ হিসেবে আ'লীগ সরকার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা "মসজিদের নগরী" ঢাকাকে আজ পরিণত করেছে "মূর্তির নগরী"-তে। ৩৬০টি মূর্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই তারা ২৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছে।

অথচ আমাদের মহানবী (দ:) ৩৬০টি মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন। *(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ম্যাগাজিন-২০০১)*

- **মসজিদ ভাঙ্গা ও ধ্বংস সাধন:** ভারতের বিজেপির দোসর চরম ইসলাম বিদ্বেষী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা আল্লাহর ঘর পবিত্র মসজিদ ভেঙ্গে ফেলেছে ঢাকার সেগুন বাগিচায় ও রাতের আঁধারে পুরো মসজিদ তুলে নিয়ে গেছে ফেনীতে। *(২১ সেপ্টেম্বর ২০০০, ডেইলী ষ্টার, ১৫ মার্চ ২০০১, মানবজমিন)*
- **বুট-জুতা পায়ে মসজিদে ঢুকে মুসল্লীদের পেটানো:** আওয়ামী লীগের লেলিয়ে দেয়া পুলিশবাহিনী (হিন্দু, চাকমা সহ) বুটজুতা পায়ে **জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম** ও চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লার শাহী মসজিদের ভিতরে ঢুকে নামাজরত মুসল্লিদের নির্মমভাবে পিটিয়েছে ও গণহারে বন্দী করে নিয়ে গেছে। *(৭ মে ২০০১, ইত্তেফাক)*
- **ফতোয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংস করার উদ্যোগ গ্রহণ:** চরম ইসলাম বিদ্বেষী এনজিও-দের দোসর আওয়ামী লীগ ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ ফতোয়াকে বেআইনীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ও ধর্মীয় শিক্ষার শিকড় মাদ্রাসাশিক্ষা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে দেশের প্রায় ৩০০ মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে, বরেণ্য আলেম বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হককে অব্যহতি দিয়েছে (পরে আদালতের রায়ে তিনি নিজ পদে ফিরে আসেন) এবং ত্রিশ হাজারের বেশী আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ও মামলা দায়ের করেছে। *(১ জানুয়ারী ২০০১, প্রথম আলো, ২৫ মার্চ ২০০১, দিনকাল)*
- **হাফেজ-আলেমদের হত্যা ও তাঁদের উপর জুলুম নির্যাতন:** ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মদদপুষ্ট এনজিও-চক্রের নির্দেশে আওয়ামী পুলিশ, বিডিআর ও আওয়ামী-ছাত্রলীগের গুন্ডারা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি ও হামলা চালিয়ে ৯ জন হাফেজ ও আলেমকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। *(৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১, মানব জমিন ও ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০১)*
- **মুরতাদ নাস্তিকদের সমর্থন প্রদান ও পুরস্কৃতকরণ:** আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ ও তার ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী সরকার ইসলামের দুশমন মুরতাদ তসলিমা নাসরীন, পবিত্র আজানকে **'বেশ্যার দালালের আওয়াজ'** হিসাবে আখ্যায়িতকারী গণধিকৃত কবি শামসুর রাহমান, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (দ:) কে অপবাদ ও গালিদানকারী ভারতীয় মুরতাদ সালমান রুশদীসহ ইসলাম বিরোধী সকল মুরতাদ-নাস্তিককেই আশ্রয়-প্রশ্রয় ও সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য-বিবৃতি দিয়েছে। এমনকি, মুরতাদ অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে হাসিনা-সরকার জাতীয় অধ্যাপক বানিয়ে সম্মানিত করেছে ।
- **শেখ হাসিনার পর-পুরুষের সাথে করমর্দন, হস্তচুম্বন ও কপালে চন্দন-তিলক গ্রহণ:** শতকরা ৯০% মুসলমানের দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ-হাসিনা, যিনি তসবি-হিজাব পরে ভোট ভিক্ষা করে নির্বাচনে জয়ী হন, তিনিই বিদেশে গিয়ে পর-পুরুষের সঙ্গে করমর্দন করে ইসলাম ধর্মের চরম অবমাননা করেন (জাপানে, ইটালিতে ও

ভারতে)। তা'ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তি নিকেতনে 'মুখ্যমন্ত্রী' খেতাব লাভের সময় হিন্দু পরপুরুষের হাতে নিজ কপালে চন্দন-তিলকও ধারণ করেন হাসিমুখে। সব কিছুকে পরাভূত করে অবশেষে গত মাসে ২৩ মে ২০০১ তারখে শেখ হাসিনা ঢাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে জন সমক্ষেই কলম্বিয়ার পুরুষ রাষ্ট্রপতি মি. হুগো শাভেজ কর্তৃক স্বীয় হাতে চুম্বন পর অভিযুক্ত। *(২৯ জানুয়ারী '৯৯, জনকণ্ঠ/ ৫ ডিসেম্বর ২০০০, যুগান্তর/ ২৪ মে ২০০১, ইনকিলাব)*

আওয়ামী লীগের দলীয়করণ ও আত্মীয়করণ

- রাষ্ট্র পরিচালিত **'সাপ্তাহিক বিচিত্রাকে'** বন্ধ করে পরবর্তীতে **শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানাকে** সেটি দিয়ে দেওয়া হয় এবং পত্রিকাটি একই নামে ও **শেখ রেহানার** সম্পাদনায় বর্তমানে বাজারে চালু আছে। *(সংবাদভাষ্য)*
- **শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই** চীফ হুইপ **আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর** বড় ছেলে সাদিক আব্দুল্লাহ ঢাকার কলাবাগানের একটি বাড়ী দখল, মেঝ ছেলে মঈন আব্দুল্লাহ শুক্রাবাদের একটি হোটেল দখল ও ছোট ছেলে আশিক আব্দুল্লাহ একজন ছাত্রকে অপহরণ করে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করে। *(৯ নভেম্বর ২০০০, ২৩ জুন ২০০০, ১৫ নভেম্বর ২০০০, জনকণ্ঠ/ সংবাদ/ প্রথম আলো)*
- **শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলালের** লেলিয়ে দেওয়া ছাত্রলীগ ও যুবলীগের গুণ্ডারা এডভোকেট কালিদাস বড়ালকে বাগেরহাটে খুন করে। *(২১ আগষ্ট ২০০০, বাংলার বাণী)*
- আওয়ামী নেতা ও কেন্দ্রীয় অর্থসম্পাদক **আখতারুজ্জামান বাবু** ওরফে ***ব্যাংক বাবু*** পুলিশ ও দলীয় মাস্তান দিয়ে ইউসিবিএল ব্যাংক দখল করে নেয়। তদীয় পুত্র **সাইফুজ্জামান** চৌধূরী **জাভেদ** অবৈধভাবে চট্রগ্রাম চেম্বারও দখল করে নেয়। *(১১ অক্টোবর ১৯৯৯, প্রথম আলো/ ইনকিলাব)*
- বিগত ২০তম **বিসিএস** সহ বিভিন্ন সরকারী চাকরীতে যোগ্যতার ভিত্তিতে মেধাবী ছাত্রদের নিয়োগদানের পরিবর্তে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের গণহারে নিয়োগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকরী 'বিসিএস' (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) কে আওয়ামী সরকার **বঙ্গবন্ধু ক্যাডার সার্ভিসে** পরিণত করেছে। *(১১ জুলাই ১৯৯৯, প্রথম আলো/ জনকণ্ঠ)*
- ক্ষমতায় আসার পরপরই পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বহু প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে **শেখ মুজিব, বেগম মুজিব, শেখ হাসিনা, শেখ রেহেনা, শেখ রাসেল, সুলতানা কামালসহ** শেখ পরিবারের সবার নামেই করা হয়েছে। এর মধ্যে যমুনা সেতু, পিজি হাসপাতাল, জাতীয় ষ্টেডিয়াম, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। আওয়ামী লীগের নামকরণ থেকে এখন হয়ত বাদ আছে গোরস্থান। *(সংবাদভাষ্য)*
- ঢাকার নিকুঞ্জ, উত্তরা, রূপনগর ও চট্টগ্রামের সরকারী প্লট বরাদ্ধে প্রচলিত রীতিনীতি ভঙ্গ করে প্রাপ্য ব্যক্তিদের নামে বরাদ্ধকৃত প্লট না দিয়ে প্রায় সবগুলো

প্লটই আওয়ামীলীগের মন্ত্রী, এমপি অথবা তাদের আত্মীয়স্বজনদের দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি সরকারী আবাসিক এলাকাকে পরিনত করা হয় এক-একটি **আওয়ামী পল্লীতে**। *(১১ জুলাই '৯৯, বাংলাবাজার/ ইত্তেফাক)*

- **শেখ হাসিনার বান্ধবী**, ঢাকা মহানগর আওয়ামীলীগ নেত্রী ও ওয়ার্ড কমিশনার নসিবুন আহমদের পুত্র রাকিব হাসান সুমন ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে গেন্ডারিয়া রাইফেল্স ক্লাবে মহসীন ও সায়েম নামের দু'জন যুবককে হত্যা করে। এমনকি লাশ দু'টি ১২ টুকরা করা হয়। সুমনের নেতৃত্বে শুধু গেন্ডারিয়াই গত ৫ বছরে ১০ জন খুন হয়েছে। *(১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০, আজকের কাগজ/ দিনকাল/ বাংলার বাণী)*
- সাবেক সেনাপ্রধান লে. জে. মুস্তাফিজুর রহমান -যিনি **শেখ হাসিনার ফুফা**- তাকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে সেনাকোড (চাকরী) অমান্য করে বেশী বয়স সত্ত্বেও যোগ্যদের বাদ-দিয়ে দু'বছরের জন্য পুন:নিয়োগ দিয়ে সেনাপ্রধান বানানো হয় ১৯৯৮ সনে। এমনকি চামচাগিরির পুরস্কার হিসেবে লে.জে. মুস্তাফিজকে অবসর গ্রহণের আগে চার তারকার জেনারেল করা হয়। *(সংবাদভাষ্য)*
- **শেখ হাসিনার ফুফাতো বোন শেফালী** বর্তমানে স্পেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই অর্ধশিক্ষিত মহিলাকে সেখানে রাষ্ট্রদূত করা হয়। *(১৮ মে, ২০০১ প্রথম আলো)*
- **শেখ হাসিনার ফুফাতো বোনের স্বামী** ও '৭৩ সালের তোফায়েল ক্যাডার **রশিদুল আলমকে** জৈষ্টতা ভঙ্গ করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব করা হয়েছে। **শেখ হাসিনার** আরেক **ভগ্নিপতি সৈয়দ ইউসুফ হোসেন** হঠাৎ করে অতিরিক্ত সচিব থেকে পূর্ণ সচিব হন। বর্তমানে এক বছরের এক্সটেনশনে আছেন। *(৮ মে ২০০১, যায়যায়দিন)*

শীর্ষ আওয়ামী নেতৃবৃন্দের চরম অগণতান্ত্রিক উক্তি

হুমকি-ধমকি, অশ্লীল গালি-গালাজ আর খিস্তি-খেউড় আওয়ামী লীগের মজ্জাগত চারিত্রিক দোষ। হাসিনার পিতা শেখ মুজিবও প্রকাশ্য জনসভায় 'লাল ঘোড়া' দাবড়ায়ে দেবার অশালীন হুমকি দিয়ে ছিলেন। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন "কোথায় আজ সিরাজ সিকদার"। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অসংখ্য অশালীন বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হল ঃ

- "চট্টগ্রাম আওয়ামী নেতা কর্মীরা কি শাড়ি-চুড়ি পরেন? আর যদি একটা **লাশ পড়ে তবে ভবিষ্যতে দশটা লাশ পড়বে"**, প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের সময় সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের চলে যেতে বলা হয়।
  -চট্টগ্রামে আলোচিত এইট মার্ডারের পর আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে ***শেখ হাসিনা****। (২০ জুলাই ২০০০, প্রথম আলো)*
- "আওয়ামী লীগকে যারা চিনে না, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। লাঠি কোথায় মারতে হয় আ'লীগ তা দেখিয়ে দিবে"

- "চট্টগ্রাম আওয়ামী নেতা কর্মীরা কি শাড়ি-চুড়ি পরেন? আর যদি একটা **লাশ পড়ে তবে ভবিষ্যতে দশটা লাশ পড়বে"**, প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের সময় সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের চলে যেতে বলা হয়।

  *-চট্টগ্রামে আলোচিত এইট মার্ডারের পর আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে **শেখ হাসিনা**। (২০ জুলাই ২০০০, প্রথম আলো)*

- "আওয়ামী লীগকে যারা চিনে না, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। লাঠি কোথায় মারতে হয় আ'লীগ তা দেখিয়ে দিবে"

  *-১৮ এপ্রিল আদালতের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিলে সমবেত লাঠিধারী দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে **স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম**। (১৯ এপ্রিল ২০০০, যুগান্তর/ দিনকাল)*

- 'মুক্তিযোদ্ধারা চুক্তিযোদ্ধা এবং জারজ'

  *-মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী **ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন**। (৪ ডিসেম্বর ২০০০, জনকণ্ঠ)*

- "আমার কথা শুনবা না, আবার বিরোধীতা করবা? হ্যাগো ঠ্যাং আমি ভাইঙ্গা ফ্যালামু, আমার টাহা আছে, লাঠিয়াল বাহিনী আছে। কোর্টে যাইব? তার আগেইতো কাম শেষ"

  *-প্রথম আলোর সাথে সাক্ষাৎকারে বিরোধীতাকারীদের পরিণাম সম্পর্কে **মুন্সিগঞ্জের আওয়ামী নেতা** ও পৌর চেয়ারম্যান মতিন সরকার। (১৩ মার্চ ২০০১, প্রথম আলো)*

- "প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেয়া হলে **রাজাকারের বাচ্চারা** ভোটার হয়ে বিদেশ থেকে ভোট দেবে। ভোট দিতে চাইলে প্রবাসীদের দেশে আসতে হবে"

  *-প্রবাসীদের ভোটার হওয়ার দাবি প্রসঙ্গে **শেখ হাসিনা** । (১ মার্চ ২০০১, মানবজমিন)*

- "জনগণ ঐকবদ্ধ হয়ে যদি বিরোধী দলীয় নেতাদের গাড়ী বাড়ী শিল্প প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগায়, ভাংচুর করে তাহলে কি করবেন?"

  *-জাতীয় সংসদে **শেখ হাসিনা**। (১৪ এপ্রিল ২০০১, ইনকিলাব/প্রথম আলো)*

- "বিরোধীদল আগাম নির্বাচন চাইলে **নাকে খত** দিয়ে বলতে হবে আর কোন দিন হরতাল করবে না। **শকুনের দোয়ায় গরু মরে না।**"

  *-৩০ মার্চ প্যারেড গ্রাউন্ডে দলীয় মহাসমাবেশে বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে **শেখ হাসিনা**। (৩১ মার্চ ২০০১, মানবজমিন/ যুগান্তর)*

আওয়ামী পুত্রধনদের অপকীর্তির উপাখ্যান

শেখ মুজিব তনয় শেখ কামালের ব্যাংক লুট, পরস্ত্রীর প্রতি অশালীন আচরণ(জনৈক সেনাবাহিনীর তৎকালিন কর্মকর্তার স্ত্রী) সহ প্রায় সকল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সন্তানরা বহু অপকীর্তির রেকর্ড স্থাপন করেছে। তারই কয়েকটি নিচে প্রকাশ করা হল ঃ

ক্ষমতার অপব্যবহার

- সম্পূর্ণ অবৈধভাবে **প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় প্রদান করে।

এমনকি বাংলাদেশ এ্যাম্বেসিতে প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের জন্য অফিসও করা হয়। *(১০ নভেম্বর ২০০০, সাপ্তাহিক হলিডে)*

- আওয়ামী **ভূমি প্রতিমন্ত্রী রাশেদ মোশার্‌রফের** দু'পুত্র সাজেদ মোশাররফ সেবক ও জাভেদ মোশাররফ রূপক। জামালপুরের ইসলামপুর পৌরসভার সব ঠিকাদারী জাভেদ রূপকের হাতে। ইসলামপুরে বাধঁ নির্মাণ ও হার্ড পয়েন্টের কাজ থেকে (১৮ কোটি টাকার কাজ) জাভেদ কমিশন নিয়েছে ১ কোটি। সাজেদ মোশাররফ সেবক ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান। পৌরসভার সব ঠিকাদারী কাজে তার ১০% কমিশন। *(১৫ মে, ২০০১, মানবজমিন)*

খুনঃ

- ৮ ফেব্রুয়ারী মৎস্য **প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার** পুত্র দিপু চৌধুরী উত্তরায় তরাজ উদ্দীন নামে এক সমাজ সেবককে হত্যা করে। উত্তরায় দক্ষিণখানস্থ ৪৭ কাঠার একটি জমি নিয়ে তরাজ উদ্দীনের সাথে তার খালাতো বোন আলেয়ার বিরোধ দেখা দেয়। দীপু চৌধুরী আলেয়ার পক্ষ নিয়ে জমিটি দখল করার নিমিত্তে তরাজ উদ্দীনকে হত্যা করে। *(৯ ফেব্রুয়ারী ২০০১, সংবাদ/ মানবজমিন)*
- ২৫ মে আওয়ামী লীগের **সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদারের** পুত্র জুয়েল বনানীতে একটি সেলুলার ফোন দোকানের মালিক ইফতেখার আহমেদ শিপুকে গুলি করে হত্যা করে। শিপু আওয়ামী ক্যাডারকে বিনা মূল্যে একটি সেলুলার ফোন দিতে অস্বীকার করায় তাকে গুলি করা হয়। *(২৬ মে ২০০০, প্রথম আলো/ ইনকিলাব)*

দখলঃ

- ২৫ এপ্রিল ২০০০ **শেখ হাসিনার ফুফাত ভাই** চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্‌দুল্লাহর পুত্র সাদিক আব্‌দুল্লাহ্‌ কলাবাগান ডলফিন গলির ৯০ নম্বরের ৭ তলা বাড়িটি দখল করে নেয়। সাদিক আব্দুল্লাহ ১০ মার্চ ক্যান্টনমেন্ট গেইটে গাড়ীতে গুলি করে নুরুল হক শিকদারের স্ত্রী ও ২ মেয়েকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। *(২৬ এপ্রিল ২০০০,সংবাদ, ১১ মার্চ ২০০১,মানবজমিন)*
- আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা **'ব্যাংক বাবু'** খ্যাত আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর গুণধর পুত্র সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ চট্টগ্রাম চেম্বারের নির্বাচিত সভাপতি জাফরুল ইসলাম চৌধুরীকে সরিয়ে অন্যায়ভাবে চেম্বার দখল করেন এবং স্বঘোষিতভাবে চেম্বার সভাপতি হন। *(নভেম্বর '৯৯, প্রথম আলো)*
- **শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী এম এ মান্নানের** পুত্র আব্দুল লতিফ টিপুকে আসামী করে ১৭ সেপ্টেম্বর একটি মামলা করা হয়। মন্ত্রীপুত্র টিপু তার ২/৩'শ সন্ত্রাসী নিয়ে চট্টগ্রামের দক্ষিণ পাহাড়তলী মৌজার ০.৫ একর জমি দখল করে নেয়। এছাড়াও টিপুর বিরুদ্ধে ঠিকাদারি ব্যবসায় আধিপত্য বিস্তার, আদম ব্যবসায় প্রতারণা, মূল্যবান কাঠ পাচারের অভিযোগ আছে। *(২০ অক্টোবর ২০০০, যুগান্তর)*

- **ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের পুত্র** মোহাম্মাদ সাঈদ খোকনের বিরুদ্ধে গুলশান লেক দখল করে বাড়ি তৈরী করার অভিযোগ বহুদিনের। *(২৬ ডিসেম্বর ২০০০, যায়যায়দিন)*

সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি

- **ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের** ছেলে তার দলবল নিয়ে ধানমন্ডি থানায় ঢুকে হাজতবন্দী তার প্রতিপক্ষকে মারধর করে। পরবর্তীকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েও এ বিষয়ে মোহাম্মদ নাসিম কোন পদক্ষেপ নেয়নি। *(৩০ অক্টোবর ২০০০, যায়যায়দিন)*
- লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীছেলে (?) ও **আওয়ামী নেতা আবু-তাহের** এ্যাডভোকেট নুরুল ইসলামসহ বহু বিরোধী নেতাকর্মী ও নিরীহ জনগণের হত্যাকারী। ধর্ষণ, চাঁদাবাজি প্রভৃতি অপকর্মের সাথে জড়িত "তাহের বাহিনী"। "তাহের বাহিনীর" নেতৃত্বে আছে তার বড় ছেলে বিপ্লব। *(৮ অক্টোবর ২০০০, প্রথম আলো)*
- **শেখ হাসিনার ভাইপো** চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর তৃতীয় পুত্র আশিক আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে অপহরণ, মারধর, মুক্তিপণ আদায়, ব্লাক মেইলিং-এর অভিযোগে গত ১৮ জুন ২০০০ তারিখে ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলাকারি সেন্টার ফর বিজনেস স্টাডিজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইয়াছিন। মামলায় মি. ইয়াছিন বলেন, তার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'ও' লেভেলের ছাত্রকে চীপ হুইপ পুত্র আশিক আব্দুল্লাহ তার সহযোগীদের সহায়তায় অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং ১৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। *(২৩ জুন ২০০০, জনকণ্ঠ)*

সাংবাদিক ও সংবাদপত্র দলন

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব বাকশাল প্রতিষ্ঠার পর মাত্র চারটি দৈনিক ছাড়া বাকী সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক নিগ্রহের যে কালো অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন তার ধারাবাহিকতা ফ্যাসিষ্ট জালিম আওয়ামী লীগ এখনো চালিয়ে যাচ্ছে নতুন রূপ আর নবতর আঙ্গিকে। শেখ হাসিনার বর্তমানের আওয়ামী লীগের অসংখ্য জঘন্য অপরাধের কয়েকটি হচ্ছেঃ

- **সাংবাদিক হত্যা** ঃ যশোরের শামছুর রহমান, আব্দুল গাফফার, সাইফুল আলম মুকুল, ফারুক হোসেন, ঝিনাইদহের মীর ইলিয়াস, খুলনার নহর আলী প্রমুখসহ মোট ৯ জন সাংবাদিক আওয়ামী সরকারের পাঁচ বছরে তাদের ক্যাডারবাহিনীর হত্যার শিকার হয়েছে। এর কোন একটিরও বিচার সম্পন্ন করতে দেয়া হয়নি। *(৭ মে ২০০১, জনকণ্ঠ)*

● **সাংবাদিক নির্যাতনঃ** আওয়ামী মন্ত্রী, এমপি, নেতা, পাতি নেতারা বহু সাংবাদিকের হাত পা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। খোদ **সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন** কর্মীদের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, **"সাংবাদিকদের হাত-পা ভেঙ্গে দিন, থানায় কোন মামলা হবে না"**। তার এই নির্দেশেই চিরতরে পঙ্গু হয়ে আছে ফেনীর টিপু সুলতান, প্রবীর সিকদার, শহীদুল আলম ইমরানসহ বহু সাংবাদিক। আওয়ামী সরকারের পাঁচ বৎসরের শাসনামলে প্রায় চার শতাধিক সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হয় প্রখ্যাত সাংবাদিক গিয়াসকামাল চৌধুরী, রুহুল আমীন গাজী, আব্দুল হাই সিকদার প্রমূখের উপর। *(২৬ অক্টোবর ২০০০, ২৭ জানুয়ারী ২০০১, প্রথম আলো/যুগান্তর)*

●**সংবাদপত্র বন্ধকরণঃ** বাকশালের প্রেতাত্মা আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই *দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমস, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, আনন্দবিচিত্রা* বন্ধ করে দেয়। ডিক্লারেশান বাতিল করে *সাপ্তাহিক ইভিডেন্স, মাসিক জাগো মুজাহিদের*। আর্থিকভাবে বিরোধী সংবাদপত্র গুলোকে পঙ্গু করার জন্য সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়া হয়। বিরোধী দলের সংবাদ গুরুত্বের সাথে প্রচারের কারণে প্রথম বেসরকারী চ্যানেল *একুশে টিভি* বন্ধ করে দেয়া হয়। (১২ *অক্টোবর ১৯৯৯, ইনকিলাব/ইত্তেফাক ; ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯, নিউনেশন)*

● **সংবাদপত্র অফিসে হামলা ঃ** সত্য প্রকাশের কারণে এই সরকারের আমলে সংবাদপত্র অফিসগুলো বারবার আওয়ামী ক্যাডারদের হামলার শিকার হয়। এর মধ্যে *দৈনিক ইনকিলাব, সংগ্রাম, দিনকাল, সাপ্তাহিক ইভিডেন্স, জনতার ডাক, মাসিক জাগো মুজাহিদ, চট্টগ্রামস্থ দৈনিক কর্ণফুলি, পূর্বকোণ,সাতক্ষীরা চিত্র, অনির্বান* উল্লেখযোগ্য। (*৯ মার্চ ২০০০ ডেইলী স্টার, ২০ এপ্রিল ২০০১, যুগান্তর/ইনকিলাব)*

● **মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ ঃ** স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের কারণে বহু সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীকে চাকরীচ্যুতি, নির্যাতন, হুমকি-ধমকির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ডঃ আফতাব আহমাদ, সাংবাদিক গিয়াসকামাল চৌধুরী, দৈনিক বাংলা সম্পাদক আহমেদ হুমায়ুন, হাসিনার এককালের সহযোগী মতিউর রহমান রেন্টু, বিবিসির বাংলা বিভাগের প্রধান মাহমুদ আলী অন্যতম। *(১৪ ডিসেম্বর ২০০০, ১৩ এপ্রিল ২০০১, মানবজমিন/ যুগান্তর)*

আওয়ামী লীগের সংখ্যালঘু দলন

সংখ্যালঘু ভোট লাভের জন্য আওয়ামী লীগ সব সময় হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের পক্ষে কিছু কথা বললেও মূল হিন্দু সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘুদের উপর উৎপীড়ন ও নিপীড়নে আওয়ামী লীগের জুড়ি পাওয়া ভার। হিন্দুদের জমি জবর দখল হিন্দু অবলা মহিলাদের ধর্ষণ ও সম্ভ্রমহানি আর হিন্দুদের সম্পদ লুণ্ঠনের রেকর্ড গড়েছে আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী, ক্যাডার ও ছাত্রলীগের গুন্ডাপান্ডারা। সাম্প্রতিক গবেষণায়ও প্রকাশ, শত্রুসম্পত্তি বা 'অর্পিত সম্পত্তি' দখলকারীদের শতকরা ৮৫ ভাগই আওয়ামী লোক ও নেতৃবর্গ।

তাই সাম্প্রতিক কালে অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন পাশ হলেও ১ জন হিন্দুও তার বেদখলকৃত সম্পত্তি ফেরৎ পায়নি। আওয়ামী লীগের হিন্দু দলনের কিছু খন্ড চিত্র নিচে দেওয়া হলঃ

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যহতি পরেই শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী সরকার বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে চরমভাবে আহত করে ঢাকা রমনা রেসকোর্সের ঐতিহাসিক কালিমন্দিরটির অবশিষ্টাংশও বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেন ও স্থানটি থেকে মন্দিরের সকল চিহ্ন চিরতরে মুছে ফেলেন।

- বাগেরহাট হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা কালিদাস বড়াল সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হন ২০ আগষ্ট (২০০০)। এ হত্যাকন্ডের পিছনে **প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল** জড়িত বলে স্থানীয় লোকদের ধারণা। এই হত্যাকান্ডের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক জনসভায় মঞ্চে উপবিষ্ট শেখ হেলালের উদ্দেশ্যে জনগণ জুতা-স্যান্ডেল নিক্ষেপ করে। *(২১ আগষ্ট ২০০০, সংবাদ/ বাংলার বাণী)*

- "নিজেদের বাংলাদেশের মানুষ মনে করেন না আপনারা। এক পা রাখেন ভারতে আর এক পা বাংলাদেশে। দু'নৌকায় পা রাখবেন না। বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করুন" *-হিন্দুসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে **শেখ হাসিনা** (সংবাদ ভাষ্য)*

- চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানায় শিলপাড়া গ্রামের একটি হিন্দু বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ স্থানীয় যুবলীগের ৫ জন নেতাকে গ্রেফতার করে। *(৯ জানুয়ারী '৯৭, সংগ্রাম)*

- নেত্রকোনার আটপাড়া থানার কামারগাড়ি গ্রামের ৬টি হিন্দু পরিবারের ২৬ জন নারী-পুরুষ ও শিশু আওয়ামী সন্ত্রাসীদের শিকার। এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী, নারী নির্যাতনকারী ও অস্ত্রধারী, চাঁদাবাজ, আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন সভাপতি জাহেদ তালুকদার ও তার দলবল দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত হিন্দু পরিবারের উপর জুলুম নির্যাতন করে আসছে। আ. লীগ সন্ত্রাসীদের বাধার মুখে থানায় মামলা করতে না পেরে প্রাণে বাচাঁর জন্য তারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে ঢাকা চলে আসে। *(৭ মে ২০০১, দিনকাল)*

আওয়ামী 'সোনার ছেলেদের' অপকর্ম

গুন্ডামী, মাস্তানী, বদমায়েশী আর চাঁদাবাজিতে ছাত্রলীগ কর্মীদের জুড়ি পাওয়া ভার। এহেন অপকর্ম নেই সামান্য যা পাওয়া যাবে না ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের-যাদেরকে শেখ হাসিনা 'সোনার ছেলেরা' উল্লেখ করে থাকেন। এখানে সে ছেলেদের দুষ্কর্মের চিত্র নিচে তুলে ধরা হলঃ

- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের **ছাত্রলীগ সেক্রেটারী জসিম উদ্দীন মানিক** ককটেল পার্টি দিয়ে **ধর্ষণের সেঞ্চুরী** উৎযাপন করে। ধর্ষক লীগ-ক্যাডারদের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললেও সরকার তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। *(আগষ্ট '৯৮, ডেইলী ষ্টার/ মানবজমিন; ৪ সেপ্টেম্বর '৯৮, ইত্তেফাক)*
- **ছাত্রলীগ ক্যাডার রাসেল** ও মামুন তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে **বাঁধন** নামের এক তরুণীর বস্ত্রহরণের নির্লজ্জ মহড়া প্রদর্শন করে গত ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ দিবাগত রাতে। উল্লেখ্য ঐ ছাত্রলীগ ক্যাডাদের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। *(২ জানুয়ারী ২০০০, মানবজমিন/সংগ্রাম)*
- লালবাগ (ঢাকা) অঞ্চলের **আওয়ামী লীগ এমপি হাজী সেলিমের** প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছাত্রলীগের গুন্ডারা ইডেন মহিলা কলেজে ঢুকে ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করে। এতে বহু ছাত্রীর সম্ভ্রমহানি ঘটে। *(৩১ সেপ্টেম্বর '৯৬, দিনকাল)*
- ছাত্রলীগ-যুবলীগের ক্যাডাররা শুধ্ বিরোধী নেতাকর্মীদের হত্যা-নির্যাতনে পরম পারঙ্গমতার পরিচয় দেয়নি। বরং নিজেদের মধ্যে হল দখল, জমি দখল, ভাগবাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্বে প্রায় ৪ শতাধিক খুন হয়েছে গত পাঁচ বছরে। শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলেই অভ্যন্তরীণ কোন্দলে খুন হয় ১২০ জন । *(৭ মে ২০০১, মানবজমিন/ যুগান্তর; ১৫ মে ২০০১, ইনকিলাব)*
- আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পরই ছাত্রলীগ ক্যাডাররা চর দখলের মতো একটার পর একটা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করে এবং বিরোধী ছাত্রদের হল থেকে বের করে দেয়। তাদের পৈশাচিক খুনের নেশায় ছাত্রদলের ২০০ জন ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৩০ জন সহ প্রায় ৪ শতাধিক বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী খুন হয়। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্রলীগের হাতে গত ৫ বছরে খুন হয়েছে ১০ জন। *(২৯ এপ্রিল ২০০১, দিনকাল)*

আওয়ামী দূর্নীতি

দূর্নীতির অপর নামই আওয়ামী লীগ। ঘুষ খাওয়া, চাঁদা নেওয়া, জোরপূর্বক বেআইনী বদলী আত্মীয়দের চাকুরীতে নিয়োগ, দলীয়কাজ চাকুরীদান, পরের বাড়ী দখল, সরকারী সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ, টেন্ডারবাজীসহ এহেন অপকর্ম নাই - যা আওয়ামী লীগের মন্ত্রী থেকে নিয়ে সামান্য কর্মী পর্যন্ত করেনি। তাদের দূর্নীতির কিছু খন্ড চিত্র নিচে প্রকাশ করা হলঃ

প্লট-দূর্নীতি

আওয়ামী সরকার প্লট বরাদ্দ ও জমি দখলে দূর্নীতিতে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। গুলশান, বনানী ও উত্তরা মডেল শহরে মোট ৩০১টি আবাসিক প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে

'বরাদ্দ নীতি' লংঘন করে মন্ত্রী, এমপি, দলীয় নেতা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বন্টন করে দেওয়া হয়। শেখ হাসিনা পরিবারের ৩৮ জন সদস্যই এ প্লট বরাদ্দ পায়। চট্টগ্রামের "চন্দ্রিমা" আবাসিক এলাকায় প্লট বরাদ্দ হয় ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম-৪) থেকে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত এমপি আনোয়ার ও তার নিকট আত্মীয়দের মাঝে। এছাড়াও একই মহানগরীর নাসিরাবাদ এবং হালিশহরে গৃহসংস্থান বিভাগের ২৬ কাঠা জায়গা বিনা টেন্ডারে নাম মাত্র মূল্যে **গণপূর্ত ও গৃহায়ন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের** আত্মীয় ও ঘনিষ্টজনের মধ্যে বন্টন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর বোন **শেখ রেহনার শ্বশুর এম এ সিদ্দিক** গুলশান লেকের ৩ বিঘা জমি এবং **উপমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী** পুলিশের সহায়তায় মাস্তান দিয়ে খিলগাঁও-এর .৬৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত শিশু পার্কটি দখল করে নেয়।
(১১ জুলাই '৯৯ প্রথম আলো/ বাংলাবাজার;১৯ ডিসেম্বর '৯৯, ভোরের কাগজ; ৪ এপ্রিল দিনকাল; ৮ অক্টোবর ২০০০, যুগান্তর)

বই-দূর্নীতি

লীগ সরকারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করার জন্য পাঁচ বছরের শাসনামলের কোন বছরই পাঠ্যপুস্তক ঠিক সময় ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌছায়নি। চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয় ২০০১ সালের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিলির ক্ষেত্রে। **শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ এসকে সাদেক** ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান 'কমিশন' নিয়ে অনভিজ্ঞ ও দূর্নীতি পরায়ন আওয়ামী ঘরানার প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো গ্রুপকে বই ছাপানো ও বণ্টনের দায়িত্ব দেয়। বেক্সিমকো বাণিজ্যিক স্বার্থে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর সাব-কন্ট্রাক্ট (Sub-Contract) ভারতের 'পুস্তকা' নামক প্রকাশনা সংস্থার কাছে দেয় এবং ঐ ভারতীয় সংস্থা যথাসময়ে পুস্তক ছাপাতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। পাঠ্য বইয়ের অভাবে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে হাজিরা নেই। ছেলেমেয়েরা কয়েক মাস যাবত ক্লাশে আড্ডা মেরে যখন খুশি চলে যায়। ২৩ জানুয়ারী বই প্রকাশের প্রতারণার অভিযোগে পুস্তক প্রকাশক সমিতি জাতীয় টেক্স বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান তপন কান্তি চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে
(১৯-২০ জানুয়ারি, ২০০১, প্রথম আলো/ইত্তেফাক)

চোরাচালান

আওয়ামী নেতা **উপমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর** দুটি শিপিং কোম্পানিই নজিরবিহীন জালিয়াতির মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ৩ লাখ গজ শুল্কমুক্ত কাপড় অবৈধভাবে আমদানি করে এবং ভূয়া গার্মেন্টস-এর নামে খালাসের অপচেষ্টা চালায়। এলসি বিহীন এ কাপড় কালোবাজারে বিক্রয় করে সরকারকে প্রায় ১১ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকি দেয়া হয়। এ সময়ে উপমন্ত্রী সাবের হোসেন ছিলেন অভিযুক্ত কোম্পানি দু'টির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং পিআইএল

ও গোল্ডভিউ-এর ৩৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক। চোরাচালানের দায়ে মন্ত্রী সাবের চৌধুরীর কোম্পানিকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। *(৯ মার্চ ২০০০, বাংলাবাজার পত্রিকা)*

আদম ব্যবসায় দুর্নীতি

মোটা বেতন, বিনামূল্যে থাকা ও খাওয়া, কাজের উন্নত পরিবেশ ও নিশ্চিত কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে **সরকারী দলের সংসদ সদস্য**, জনশক্তি রপ্তানী ব্যবসায়ী **ডা. এইচ বি এম ইকবালের** রিক্রুটিং এজেন্সি প্রায় ২০০ বাংলাদেশীকে সৌদি আরব পাঠায়। ডা. ইকবাল ভিসা বাবদ প্রত্যেককে মাথাপিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পরিশোধ করতে বলেন। কিন্তু এদের প্রত্যেকেই উক্ত টাকা পরিশোধের পর সৌদি আরব গিয়ে প্রতারিত হয়েছেন। সেখানে তারা দেখেন ডা. ইকবাল যা বলেছেন বাস্তব পরিস্থিতি তার পুরো উল্টো এবং দেয়া প্রতিশ্রুতির সবই বানোয়াট। জেদ্দার একটি বাড়ীতে কয়েকটি অন্ধকার কক্ষে ঠাসাঠাসি করে বাস করছেন এবং নিজেদের অর্থে একটি লঙ্গরখানা বানিয়ে খাওয়া দাওয়া করেন। আওয়ামী লীগ সমর্থক দৈনিক প্রথম আলো ছবিসহ এদের একটি করুন প্রতিবেদন প্রকাশ করে ২ ফেব্রুয়ারী। *(২ ফেব্রুয়ারি ২০০০, প্রথম আলো)*

গম কেলেঙ্কারী

এলজিইডির গম কেলেংকারীতে আওয়ামী সরকার বহুবার জড়িয়ে পড়ে। ব্যাপক অনিয়মের মাধ্যমে ১ লক্ষ টন গম সরকারী দলের এমপি এবং তদবির পার্টিকে বরাদ্দ দেয়া হয়। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের গম বেঁচে কেনা হচ্ছে ক্লাব-সমিতির টেলিভিশন ও অন্যান্য আসবাবপত্র। রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে ঐ গম বিতরণ করা হয়েছে। গম বরাদ্দের ক্ষেত্রে যারা বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন তাদের মধ্যে জাতীয় সংসদের চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর জন্য ১ হাজার টন, প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ৭৫০ টন, ড. মিজানুল হক এমপি ৬১৪ টন, শেখ হেলাল উদ্দীন এমপি ৬০০ টন, আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান ৫৬০ টন, আব্দুল লতিফ মির্জা এমপি ৪০০ টন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। *(৫ এপ্রিল, ১০ এপ্রিল ২০০০, প্রথম আলো/ জনকণ্ঠ)*

নির্লজ্জ ভারত-তোষণ ও ভারত প্রীতি

আওয়ামী লীগ সব সময়ই ভারতকেই তার প্রভু বলে মনে করে। ভারতের কথায় ওঠে বসে ভারতের ইঙ্গিতে ইশারায় সকল কর্ম সম্পাদিত করে। প্রভু রাষ্ট্র ভারতকে সন্তুষ্ট রাখাই আওয়ামী লীগদের ক্ষমতায় থাকার গ্যারান্টি হিসেবে মনে করে। তাই ভারতের বিরুদ্ধে কেউ একটি টু শব্দ করলেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী সবাই তেড়ে আসেন।

ভারতের লেখক নীরদ সি চৌধুরী 'দেশ' পত্রিকায় বাংলাদেশ 'তথাকথিত বাংলাদেশ' বললেন আর ভারতীয় নর্তকী শর্মা মিত্র ঢাকার এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশীদের 'বাষ্টার্ড জাতি' বললেও আওয়ামী লীগ রইল সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। আওয়ামী লীগের এমনি হাজারোটি ভারত তোষণের উদাহারন কয়েকটি মাত্র চিত্র নিচে দেয়া হলোঃ

- ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরই ভারতীয় বাহিনী সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশে চরম লুটপাট শুরু করে। পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া প্রায় ৮০০০ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র ভারতে নিয়ে যাওয়ার সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডর মেজর এম. এ. জলিল ভারতীয়দের নগ্ন লুণ্ঠনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করে। এই অপরাধে (?) আওয়ামী সরকার স্বাধীনতার বীরসিপাহী মেজর জলিলকে ভারতীয়দের নির্দেশে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। *(লিগাসী অব ব্লাড, এ্যান্থী ম্যাস কারান হাস, ১৯৮০)*
- ১৮ এপ্রিল (২০০১) কুড়িগ্রামের বড়ইবাড়ী সীমান্তে বিডিআর প্রাণের বিনিময়ে ভারতীয়দের নগ্ন আগ্রাসনকে রুখে দিয়ে দেশের পবিত্র ভূমিকে রক্ষা করে। কিন্তু পরম দু:খের বিষয়, ভারতপন্থী আওয়ামী সরকার ভারতকে খুশী করার জন্য বীর বিডিআর জওয়ানদের পরম আত্মত্যাগকে কোন সম্মান দেখানো তো দূরের কথা বরং বিডিয়ার প্রধান মেজর জেনারেল ফজলুর রহমানসহ অন্যান্য বীর বিডিআর সদস্যদের কোর্ট মার্শালে শাস্তিদানের তোড়জোড় শুরু করে এবং শেখ হাসিনা ভারতের নিকট করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। *(২২, ২৩, ২৪ এপ্রিল ২০০১, মুক্তকণ্ঠ/ ইনকিলাব, ৯ মে ২০০১, আজকের কাগজ)*
- দেশের সর্বস্তরের জনগণের মতামতকে পদদলিত করে ক্ষমতায় এসেই ভারতের সেবাদাস হাসিনার সরকার একের পর এক ভারতের স্বার্থে '৩০ সালা গঙ্গার পানি চুক্তি', 'পার্বত্য-চুক্তি', 'ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি' স্বাক্ষরসহ ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্টের ছদ্মবেশে 'করিডোর', চট্টগ্রাম-বন্দর লীজ এবং ভারত প্রভাবিত' উপ-আঞ্চলিক জোট' গঠনের আয়োজন করতে থাকে। এ সকল চুক্তি ও সহযোগীতা সব ক'টিই বাংলাদেশের স্বার্থের চরম পরিপন্থী বলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।
- ভারত তাদের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের ন্যায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকেও (Prime Minister) 'মূখ্যমন্ত্রী' (Chief Minister) বলে সম্বোধন করেছে বারবার । অথচ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে এর প্রতিবাদ করতেও ব্যর্থতার পরিচয় দেয় আওয়ামী সরকার। *(২২ নভেম্বর ২০০০, মানবজমিন)*
- আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরপরই ঝাকে ঝাকে ভারতীয় গায়ক, বাদক, নর্তকী আসা শুরু হল। নানা ছলছুতোয় আয়োজন করা হল 'ভারতীয় উৎসব', 'চলচ্চিত্র উৎসব', 'ভারতীয় নাট্য উৎসব', 'কবিতা উৎসব' প্রভৃতি। এভাবে

আওয়ামী সরকারের ৫ বছরের শাসনামলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প সবই ভারতীয়করন করা হল। *(২৫ জানুয়ারী-১ফেব্রুয়ারী ২০০১, যুগান্তর/সংগ্রাম)*

- লীগ সরকারের শাসনামলে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW) এর অপতৎপরতায় শুরু হল দেশের সবক্ষেত্রে। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী, বিডিআর, রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে শুরু হল 'র' ও তাদের চ্যালাদের নিরবিচ্ছিন্ন অপপ্রচার। এমনকি ঢাকাস্থ 'র' এর ষ্টেশন চীফ মি. মথুর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জনৈক নেতার সাথে সাক্ষাতের মত দু:সাহসিক কাজ করল এই সরকারের আমলে। *(১৮ মার্চ ২০০১, প্রথম আলো/ আজকের কাগজ)*
- ' ৫ সেপ্টেম্বর (২০০০) সিএনএন-এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রীকে ভারতীয় এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, "কবে বাংলাদেশ ভারতের সাথে এক হয়ে যাবে? এবং ভারত-বাংলাদেশ অভিন্ন মুদ্রা কবে চালু হবে?" ভারতীয় সাংবাদিকের এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে শুধুমাত্র মৃদু হেসে শেখ হাসিনা প্রায় মৌন সম্মতিরই আভাস দেন। যা বাংলাদেশের জনগণকে দারুনভাবে বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ করে। *(৮ সেপ্টেম্বর ২০০০, মানবজমিন/ বাংলার বাণী)*

রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বাধাদান

- **বিরোধী নেতৃবৃন্দকে জেলহাজতে প্রেরণ :** গণতন্ত্র চর্চার নামে দেশের গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করতে, নিজেদের ক্ষমতাকে জিইয়ে রাখতে, সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে আওয়ামী সরকার সদা তৎপর। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এগুলির কোন প্রতিবাদ বা মিছিল মিটিং যাতে না হয় সেজন্য অধিকাংশ বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি নেতা কর্মীকে কমপক্ষে ৬ থেকে ৮টি মামলা ঠুকে দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য 'বিশেষ ক্ষমতা আইন', 'জননিরাপত্তা আইন', -এর মতো জঘণ্য আইন তৈরী করা হয়েছে। শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক, মুফতি ফজলুল হক আমিনী, আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ প্রমুখ নেতাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট আর সাজানো মামলার আসামী করে দিনের পর দিন শুধু অবৈধভাবে আটকেই রাখা হয়নি, তাদের উপর করা হয়েছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও জুলুম। বিশেষ ক্ষমতা ও জননিরাপত্তা আইনে সমগ্র দেশ জুড়ে ২০ হাজারেরও বেশী বিরোধী কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। *(২৩ জুন ২০০০, মুক্তকণ্ঠ, ৬,৭ এপ্রিল ২০০১, প্রথম আলো/ সংগ্রাম)*
- **বিরোধী নেতা কর্মীদের খুন :** আওয়ামী সরকার সম্পূর্ণভাবে খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। রাজনীতির ময়দানে নিজেদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতাকে ঢাকতে প্রতিপক্ষকে হত্যা করেছে। মুজিব শাসনামলে সিরাজ সিক্‌দার থেকে

শুরু করে হাসিনা শাসনামলে কুষ্টিয়ার জাসদ নেতা কাজী আরিফ, ঢাকার বিএনপি নেতা এডভোকেট হাবিবুর রহমান মন্ডল, লক্ষ্মীপুর বিএনপির জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট নুরুল ইসলাম, শিবির নেতা এফ এম মহসীন, ফেনীর জেলা যুবদল যুগ্ন আহ্বায়ক নাছির উদ্দীন সহ হাজার হাজার নেতা কর্মী খুন করা হয়েছে। বর্বর ও নৃশংসভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যা করার জন্য এ সরকার পরিকল্পিতভাবে অধিকাংশ জেলাগুলিতে গড়ে তুলেছে 'কিলিং স্কোয়াড' সম্মিলিত গড ফাদার বাহিনী। শুধু মাত্র ফেনীর গড ফাদার জয়নাল হাজারীর কিলিং স্কোয়াডবাহিনীর হাতেই খুন হয়েছে ৪০ জন বিরোধী কর্মী। নিজেরাই বোমা ফাটিয়ে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়েছে বহুবার। এর মধ্যে, চট্টগ্রামের 'এইট মার্ডার', 'উদিচি'র অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় ৮ জন খুন, ঢাকায় কমিউনিষ্ট পার্টির সমাবেশে বোমা হামলায় ৫ জন খুন, রমনার বটমূলে 'ছায়ানট অনুষ্ঠানে' বোমা হামলায় ১০ জন খুন, ঢাকায় আওয়ামী এমপি ডাঃ ইকবালের গুলিতে ৪ জন খুন, খুলনার কাদিয়ানী উপাসনালয়ে হামলায় ৮ জন খুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। *(১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১, ১৪ এপ্রিল ২০০১, যুগান্তর/ ইনকিলাব)*

- **সভা-সমাবেশে বাধাদান :** হরতাল, অবরোধ আর সভাসমাবেশের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়ে ক্ষমতায় আসলেও ক্ষমতাকে চিরতরে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলকে নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন সভা-সমাবেশে পন্ড করতে ১৪৪ ধারা জারি, সমাবেশে আসতে বাধাদান, আওয়ামী লীগ গত পাঁচ বৎসর রুটিন ওয়ার্কে পরিণত করে।

➢ ১২ নভেম্বর ('৯৭)চট্টগ্রামে বিরোধী দলের সমাবেশে আওয়ামী গুন্ডারা গুলি করে ৭ জন বিরোধী কর্মীকে খুন করে। *(সূত্র:১৩ নভেম্বর'৯৭, ইত্তেফাক/ ইনকিলাব)*

➢ ৯ জুন ('৯৮) তথাকথিত পার্বত্য **শান্তি চুক্তির** বিরুদ্ধে বিরোধী দলের লংমার্চে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বাধা প্রদান করে দীর্ঘ ৫ ঘন্টা আটকে রাখে। তবে বিরোধী নেতৃবৃন্দের দৃঢ়তার কারনে তাদের এই উদ্যোগ ভন্ডুল হয়ে যায়। *(১০ জুন ১৯৯৮, সংগ্রাম/ ডেইলী ষ্টার)*

➢ ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৯৮) বিএনপির পল্টন সমাবেশে পুলিশ ও আওয়ামী গুন্ডাদের যৌথ হামলায় পণ্ড হয়ে যায়। *(১৮ সেপ্টেম্বর '৯৮, ইনকিলাব/ ইত্তেফাক)*

➢ ৭ নভেম্বর (২০০০) পল্টন ময়দানে বিরোধী দল কর্তৃক আহুত সমাবেশে বাধা প্রদান করা হয়। *(৮ নভেম্বর ২০০০, সংগ্রাম/ যুগান্তর)*

➢ বিরোধীদল কর্তৃক আহত বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যোগদানেচ্ছু দূরবর্তী কর্মীদের পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে বাধা দিয়েছে আওয়ামী লীগ নির্লজ্জভাবে বহুবার। *(২২ মার্চ, ২০০১, সংবাদ/ সংগ্রাম)*

- বিরোধী সভা-সমাবেশ পন্ড করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা আওয়ামী লীগের অন্যতম এজেন্ডায় পরিণত হয়। *(সংবাদ ভাষ্য)*
- বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী নতুন দলের কনভেনশান আহ্বান করে ২৪ ডিসেম্বর (১৯৯৯) ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে। ছাত্রলীগের ক্যাডাররা প্রকাশ্যে দিবালোকে শত শত রাউন্ড গুলি করে উক্ত সমাবেশ পন্ড করে দেয়। *(২৫ ডিসেম্বর '৯৯ প্রথম আলো)*

পররাষ্ট্রনীতিতে আওয়ামী ব্যর্থতা

- আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতার কারনে বাংলাদেশ ২০০০ সালে ওআইসি ও কমনওয়েলথ এর প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সদস্য দেশের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে লজ্জাজনকভাবে প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে নেয়।
- ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক সাহায্য দাতা জাপানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী পদে ভোট দেয়া হয়। এবং সর্বগ্রাসী ভারতকে সমর্থন/ভোট দেয়া হয়।
- বাংলাদেশের সংবিধান ও আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী "মুসলিম দেশসমূহের প্রতি বিশেষ সম্পর্ক বৃদ্ধি করা" পররাষ্ট্রনীতির এই ধারাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ এই নীতি থেকে সরে এসে বন্ধু মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষুদ্ধ করে। ফলশ্রুতিতে সৌদি আরব, কুয়েত, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও অন্যান্য মুসলিম দেশের সঙ্গে বাণিজ্য, অর্থনীতি, জনশক্তি রপ্তানী প্রভৃতি ক্ষেত্রে টান পোড়ন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।
- বিভিন্ন পশ্চিমা তেল ও গ্যাস উত্তোলন কোম্পানীর সঙ্গে গ্যাস চুক্তির ক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ কিছু কোম্পানীর সুবিধার্থে আওয়ামী লীগ দেশের স্বার্থ নির্লজ্জ ভাবে বিলিয়ে দিয়েছে এবং এক সময়ে কিছু বন্ধু সুলভ উন্নত দেশের কোম্পানীর বিরোধীতা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থকে বড় করে দেখা হয়েছে।
- আওয়ামী শাসনামলের বিভিন্ন পর্যায়ে দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে অনেক দেশের কূটনীতিকগণ নাক গলিয়েছেন এবং বিভিন্ন নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে উপদেশ দিয়েছে। যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত, ভারতীয় হাইকমিশনার প্রমূখ। *(১৮ মার্চ ২০০১, প্রথম আলো; ১৫ মে ২০০১, যুগান্তর/ সংগ্রাম)*
- স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভারতকে খুশী করার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার নেপাল, ভূটান, এবং সমগ্র ভারতের পরিবর্তে তাদের

কিছু অনুন্নত রাজ্য নিয়ে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন করে। এছাড়াও উন্নয়ন চতুর্ভুজ, এশীয়ান হাইওয়ে সবই ছিল ভারতীয় স্বার্থে।

দেশ বিনাশী চুক্তি

১৯৯৬ সনে ক্ষমতারোহনের পর আওয়ামী লীগ ভারতের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী **মৈত্রী চুক্তি** মেয়াদোত্তীর্ণ বলে বাতিল ঘোষনা করে নানা ছদ্মাবরণে আবার তার সাথে অসংখ্য গোপন ও প্রকাশ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। যা ঐ ২৫ বছর মৈত্রী চুক্তির চেয়েও বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য বেশী ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকর। নব্য পর্যায়ে স্বাক্ষরিত ঐ সব চুক্তির মধ্যে রয়েছে-

- **ভারত-বাংলাদেশ ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানিচুক্তি (১৯৯৬)ঃ** এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরও চুক্তির মেয়াদ কালে বাংলাদেশ গঙ্গা-পদ্মায় নির্দিষ্ট পরিমান পানি পায়নি। বরং ভারতপন্থী পত্র-পত্রিকায়ই দেখা গিয়েছে যে, ঐ সময় অর্থাৎ শুকনো মৌসুমে পদ্মার হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নীচ দিয়ে ট্রাক-গরুর গাড়ীর চলছে, ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে।
- **ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমন চুক্তি (১৯৯৮)ঃ** এ চুক্তির ধারা অনুযায়ী ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্যের স্বাধীনতাকামীদের তৎপরতা দমনে (যেমন-উল্ফা -ULFA) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকতে পারবে।
- **ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি (১৯৯৯)ঃ** এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারত থেকে শত শত পণ্য আমদানী করলেও ভারত বাংলাদেশের মাত্র ২৫টি পণ্যের উপর থেকে টারিফ তুলে নিতেও অস্বীকার করে।
- **ভারত নেতৃত্বাধীন আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক জোট ও উপ-জোট গঠনের বিভিন্ন চুক্তি** (যেমন-বিস্‌টেক, বিমস্‌টেক, গ্রোথ-কোয়াড্রাঙ্গল চুক্তি ইত্যাদি)।
- **ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ও বিনিময় চুক্তি।**
- **পার্বত্য-চট্টগ্রাম 'শান্তি চুক্তি' (১৯৯৭)ঃ** এ চুক্তিটিতে ভারত সরাসরি জড়িত না থাকলেও এর ধারাগুলো বাংলাদেশে ভারতের মদদপুষ্ট পার্বত্য-চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী চাকমা শান্তিবাহিনীর ইচ্ছানুসারে ও ভারতের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্যই হয়েছে বলে অনুধাবন করা যায়। চুক্তিটি পুরোপুরিই দেশের স্বার্থ, অখন্ডতা ও সংবিধানের (৩৬, ৪২ নং ধারা, তৃতীয় অনুচ্ছেদ) পরিপন্থী।
- বিদেশী কোম্পানীগুলোর সাথে **আত্মঘাতি ও অলাভজনক তেল গ্যাস চুক্তি।**

➢ বিভিন্ন যোগাযোগ চুক্তি যা ভারতের সাথে করতে চেয়েছিল- ট্রানজিটের নামে করিডোর চুক্তি, পরিবর্তিত এশিয়ান হাইওয়ে চুক্তি, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহার চুক্তি, রেল ও সড়ক যোগাযোগ চুক্তি প্রভৃতি।

আওয়ামী গডফাদারদের অপকর্ম

- **জয়নাল হাজারী ঃ** ফেনীর *ত্রাস* জয়নাল হাজারী গড়ে তুলেছে নিজস্ব প্রশাসন *স্ক্রাস কমিটি।* এর মাধ্যমে সে ফেনীতে চালায় বিকল্প প্রশাসন। শত শত খুনের নায়ক হাজারী এখনো অবিবাহিত। এলাকার সুন্দরী তরুণী ও যুবতীদের দিয়ে তিনি যৌনতৃষ্ণা মেটান। এই নরপশুর লালসা মেটাতে গিয়ে শত শত মা-বোনকে যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। সীমান্তবর্তী জেলা ফেনীর চোরাচালান ব্যবসার পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে এই হাজারী। চাঁদাবাজি, লুটপাট, দখল, টেন্ডারবাজির মাধ্যমেও আয় করেন কোটি কোটি টাকা। তার এসব কুকর্মের খবর প্রকাশ করায় ২৭ জানুয়ারী (২০০১) ফেনীর সাংবাদিক টিপু সুলতানকে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের হাজারীর নির্দেশ মত প্রশাসন চালাতে বাধ্য করা হয়। শত শত অবৈধ অত্যাধুনিক অস্ত্রের মাধ্যমে হাজারী পুরো জেলায় এক বিভীষিকাময় অবস্থা সৃষ্টি করেছে। *(অক্টোবর ২০০০, যুগান্তর/ মানবজমিন)*

- **আবু তাহেরঃ** লক্ষ্মীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্ত্রাসী আবু তাহেরের হাতে জেলায় গত ৪ বছরে শতাধিক মানুষ খুন ও অর্ধশতাধিক তরুণী ধর্ষিত হয়েছে। বেশ কয়েকজন সাংবাদিককেও তার নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। *'তাহের বাহিনীর'* ক্যাডারদের তান্ডবে সাধারণ মানুষ সব সময় ভয়ে তটস্থ থাকে। প্রশাসনের সকলকে তাহের ও তার বাহিনীকে সমীহ করে চলতে হয়। এলাকার ব্যবসায়ীদেরকে মোটা অংকের চাঁদা দিতে হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জায়গা-জমি দখল করে তাহের সে সব স্থানে নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। *(অক্টোবর ২০০০,প্রথম আলো/ ইনকিলাব)*

- **এরশাদ সিকদার ঃ** দক্ষিণাঞ্চলের চোরাচালান সিন্ডিকেট নেতা ও আওয়ামী ওয়ার্ড কমিশনার এরশাদ শিকদার । এই গডফাদারের হাতে খুন হয়েছে ৬০ জন নিরীহ মানুষ। জেলায় মাদক দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা, পুরোকীর্তি পাচার, রেলওয়ের জমি দখলসহ বিভিন্নভাবে এরশাদ সিকদার জিরো থেকে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়ে যান। হত্যাসহ খুনের মামলা আছে তার বিরুদ্ধে ৪০টি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর এরশাদ সিকদারের হাতে খুলনা প্রশাসন পুরো জিম্মি হয়ে পড়ে। দুর্ধর্ষ এরশাদ

সিকদারের নৃশংসতা এত ভয়াবহ ছিল যে, এক খুনের স্বাক্ষ্য প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার জন্যে অপরজনকে খুন করা হয়। খুন করার পর তাদের লাশ সিমেন্টের বস্তা বেধে ভৈরব নদীতে ফেলে দেয়া হত। এই সন্ত্রাসীদের হাতে বহু নারী সম্ভ্রম হারিয়েছে। *(ডিসেম্বর '৯৮, ইত্তেফাক/জনকণ্ঠ)*

- **মামুনুর রশীদ মামুন ঃ** চট্টগ্রামের দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও আওয়ামী যুবলীগ নেতা মামুন আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাতারাতি পরিনত হয়েছে কোটিপতিতে। নগরীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদাবাজি, টেন্ডার দখল, ছিনতাই, ডাকাতি করে মামুন এ টাকা কামিয়েছে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী চট্টগ্রামের চোরাচালান কারবারির সাথে সে ওতেপ্রোতভাবে জড়িত । অস্ত্র ব্যবসার সাথেও তার যোগাযোগ আছে। সরকারী রেলওয়ের জমি দখল করে মামুন গড়ে তুলেছে বিশাল বস্তি- যেখানে মাদক দ্রব্যের রমরমা ব্যবসা চলে। আওয়ামী মেয়র মহিউদ্দীন চৌধুরীর সহযোগীতায় সে চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায়। ১৮ এপ্রিল, ২০০১ মামুন বাহিনী স্থানীয় *দৈনিক পূর্বকোণ* অফিসে হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে জখম করে। *(১৮-৩০ এপ্রিল ২০০১, ইত্তেফাক/ যুগান্তর/ সংগ্রাম)*

- **শামীম ওসমান ঃ** বন্দরনগরী নারায়ণগঞ্জ এক সময় পাটশিল্পের জন্য বিখ্যাত থাকলেও বর্তমানে আওয়ামী সন্ত্রাসী শামীম ওসমানের *সন্ত্রাস শিল্প* পুরো নগরীকে গ্রাস করে ফেলেছে। ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মাসোহারা আদায়, বন্দর এলাকার লঞ্চঘাট দখল, টেন্ডার দখল করে শামীম ওসমান এখন কোটিপতি । আওয়ামী সরকারের *পার্বত্য কালো চুক্তির* বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহের লংমার্চে শামীম ও তার বাহিনী বাধাঁ দেয়। এই সময় সন্ত্রাসীরা কাঁচপুর ব্রীজের কাছে ১ জন গৃহবধুসহ ২০ জন তরুণীকে ধর্ষণ করে। কিছুদিন আগে এই সন্ত্রাসী নারায়ণগঞ্জে তথাকথিত জনতার আদালতের (!) মাধ্যমে শীর্ষ বিরোধী নেতৃবৃন্দের ফাঁসীর আদেশ (!) দেন। এর আগে বেগম খালেদা জিয়া, অধ্যাপক গোলাম আযমকে নারায়ণগঞ্জ প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এলাকায় তার সন্ত্রাসী বাহিনী কোন বিরোধী দল ও জোটকে কোন রকমের রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালাতে দেয়না। *(২৪, ২৬ অক্টোবর ২০০০, মানবজমিন)*

আওয়ামী শাসনামলে অর্থনীতির চালচিত্র

আওয়ামী লীগ সরকার দেশের অর্থনীতিকে একটি প্রবৃদ্ধশীল এবং অবস্থাসম্পন্ন দেখানের চেষ্টা করলেও খোদ সরকারী হিসেবেই দেশের অর্থনীতির ক্রমাবনতিশীল চিত্র

ফুটে উঠে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের ১৯৯৯ সালে (জুন) প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, আওয়ামীলীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে দেশের GDP (Gross Domestic Product) বা গড় জাতীয় উৎপাদন শুধুই নিম্নমুখী হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে জিডিপি ছিল ৫.৯%। ১৯৯৭-৯৮ সালে তা ৫.৭% -এ দাড়ায় এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে মাত্র ৪.৪% -এ নেমে আসে। একই চিত্র দেশের মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রেও। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল মাত্র ৩.৯%, সেখানে ১৯৯৮-৯৯ -এ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৮% -এ এসে দাড়ায়। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জিডিপির সাথে সাথে দেশের মানুষের গড় আয়ও উল্লে-খযোগ্যভাবে অবনতির দিকে। ১৯৯৭ সালে যেখানে মাথাপিছু আয় ছিল ৩৩০ মার্কিন ডলার- সেখানে ১৯৯৮ সালে তা ৩১০ এবং ১৯৯৯ ও ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে এসে তা ২৯৯ ডলারে নেমে যায়।

আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে দেশের ছোট -বড়-কলকারখানা ও শিল্প স্থাপনাসহ হাজার হাজার মিল বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি গার্মেন্টস শিল্পও প্রচন্ড চাপ ও হুমকির মুখে। সরকারের ভারতমুখী শিল্প ও বাণিজ্যনীতির ফলে আমাদের গার্মেন্টস শিল্প বৈদেশিক রপ্তানী কোটা হারিয়েছে। ১৯৯৯ সালে অর্থনীতিক সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৯৯৫-৯৬ সালে দেশের গড় শিল্প উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৩%, ১৯৯৬-৯৭ সালে তা ৩.৫% -এ নেমে আসে এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে তা দাড়ায় মাত্র ২.২% এ।

লীগ সরকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ফাঁকা বুলি আওড়ালেও খাদ্য দ্রব্যের ক্রম-উর্ধগতি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অগ্নিমূল্য এবং ভোজ্য তেল, দুধ, ডিমসহ অন্যান্য খাদ্য পণ্যের দুর্লভ্যতা তাদের তথাকথিত স্বয়ংসম্পূর্ণতার অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রকট করে তুলেছে। সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৯৯৬-৯৭ সালে যেখানে দেশে সর্বসাকুল্যে ৯৬৭ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য আমদানী করতে হয়েছিল - সেখানে ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে তা কয়েকগুণ বেড়ে যথাক্রমে ১৯৫১ হাজার এবং ৫৪০৬ হাজার মেট্রিক টনে এসে দাড়ায়।

দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি বিদ্যুৎ এবং জ্বালানী খাতও আওয়ামী সরকারের অদূরদর্শিতা, অপরিপক্কতা ও সর্বগ্রাসী দূনীতির ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দারপ্রান্তে। পরিহাসের বিষয় যে, আমাদের নিজেদের সম্পদই (গ্যাস ফিল্ড) নামমাত্র মূল্যে কিনে বিদেশী বহুজাতিক বেনিয়া কোম্পানীগুলো তা দ্বিগুণের বেশী মূল্যে আবার আমাদের

কাছে বিক্রি করছে। বাংলাদেশকে বিদেশীরা বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানালেও আওয়ামী সরকার প্রতিবেশী ভারতের স্বার্থরক্ষার উপযোগী "ভারত উপযোগী পরিবেশ" সৃষ্টি করেছে। আমদানী উদারীকরণের পদক্ষেপে বাংলাদেশের বাজার ভারতের জন্যে উম্মুক্ত করে দেয়া হলেও সে দেশের বাজার বাংলাদেশী পণ্যের জন্যে উম্মুক্ত হয়নি। অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্রচার্যের লেখা থেকে জানা যায়, ১৯৯৭-৯৮ সালে যেখানে বাংলাদেশে ৩২০.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশী নীট ইনভেষ্টমেন্ট হয়, সেখানে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে তা ২৬২.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে যায়। চলতি অর্থ বছরে তা আরো কমে গেছে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে দেশের অর্থনীতির যে ভঙ্গুর দশা, তার থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে রপ্তানী বৃদ্ধির নামে ১৮ বার টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, অবমূল্যায়নের জন্যে ঘোষিত উদ্দেশ্যের কোনটাই পুরণ হয়নি। যেমন, রপ্তানী খাতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে শেষ ৬ মাসে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৫ শতাংশ কিন্তু ৫.৮৮ শতাংশ অবমূল্যায়নের পরও চলতি অর্থবছরের (২০০০-২০০১) ৩ মাসে মাত্র ১ শতাংশের মত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্মরণাতীত কালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে, ১৯৯৪-৯৫ সালে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩৬০ কোটি মার্কিন ডলার - সেখানে চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসে এসে তা ১০৬ কোটি মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে।

শুধু তাই নয়, আওয়ামী সরকারের সময় উন্মুক্ত ও শর্তহীন বিদেশী বিনিয়োগের ভয়াবহ পরিণামও লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৯৬ সালে ঢাকার শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগের নামে ভারতীয় মাড়োয়ারীরা কয়েকশত কোটি টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। এরপর থেকে শেয়ার বাজারের প্রতি মানুষের আস্থা আর ফিরে আসেনি।

সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষণ করলে দেখা যায়, আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সঠিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক নীতির অভাব, ভারতীয় স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ লুটপাট ও অপচয়ের মাধ্যমে দেশের পুরো অর্থনীতিকে বিদেশী নির্ভরতানির্ভর ও ধ্বংস করে ফেলেছে।

এক নজরে

আওয়ামী শাসনামলে **বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি**

(১৯৯৬-২০০১)

মোট খুন	...	২০ হাজার
মোট নারী নির্যাতন	...	১৮,৭৮০
মোট শিশু নির্যাতন	...	১,৭৯৩
ধর্ষণ	...	৬,৪১৪
মোট অপরাধ	...	৫,৬৯,৩৭১
মোট ডাকাতি	...	৮,০০০
খুনের মামলা	...	১৫,০০০
স্বাধীনতা উত্তর ২৮ বছরে মোট খুন	...	৭৫ হাজার
রাজনৈতিক কারণে খুন	...	৩২ হাজার
আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা নিরাপত্তা প্রহরীদের নির্যাতনে মৃত্যু	...	৩৫৯
মোট সাংবাদিক খুন	...	৯
মোট সাংবাদিক নির্যাতন	...	৪০০
ভারতীয় বি.এস.এফ কর্তৃক সীমান্তে হামলা	...	৩১২ বার
মে ২০০১ পর্যন্ত আ'লীগ আমলে গ্রেফতার	...	২,৫৫,০০০

উৎস: মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, অধিকার, বিআরসিটি, মানবজমিন, যুগান্তর, সংগ্রাম, ইনকিলাব, জনকণ্ঠ ।
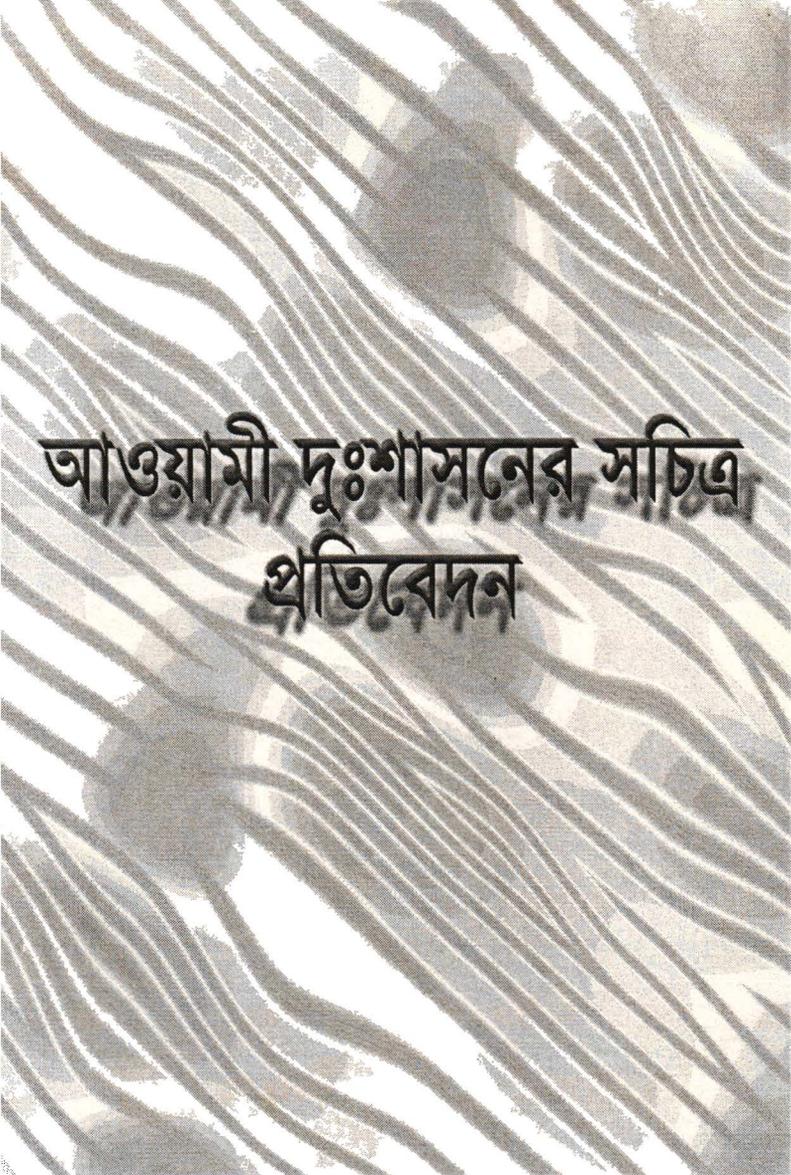
আওয়ামী দুঃশাসনের সচিত্র
প্রতিবেদন

ঢাকার গেন্ডারিয়া ক্লাবে শেখ হাসিনার বান্ধবীর ছেলে সুমন ও তার সহযোগীরা নৃশংসভাবে দুই তরুণকে খুন করে তাদের লাশ টুকরো টুকরো করে ফেলে — দৈনিক মানবজমিন॥১৬.৯.২০০০

ঢাকার খিলগাঁওয়ে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা এই হতভাগ্য তরুণকে খুন করে তার লাশ ১২ টুকরা করে ফেলে
— দৈনিক ইনকিলাব : ০২.০৩.২০০১

াসিষ্ট সরকারের লেলিয়ে দেয়া বাহিনীর গুলিতে শহীদ হলেন হাফিজে কুরআন

অবমাননার প্রতিবাদ করায় জীবন দিতে হয়েছে ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবী হমান মন্ডলকে - দৈনিক ইনকিলাব॥২১.০৮.২০০০
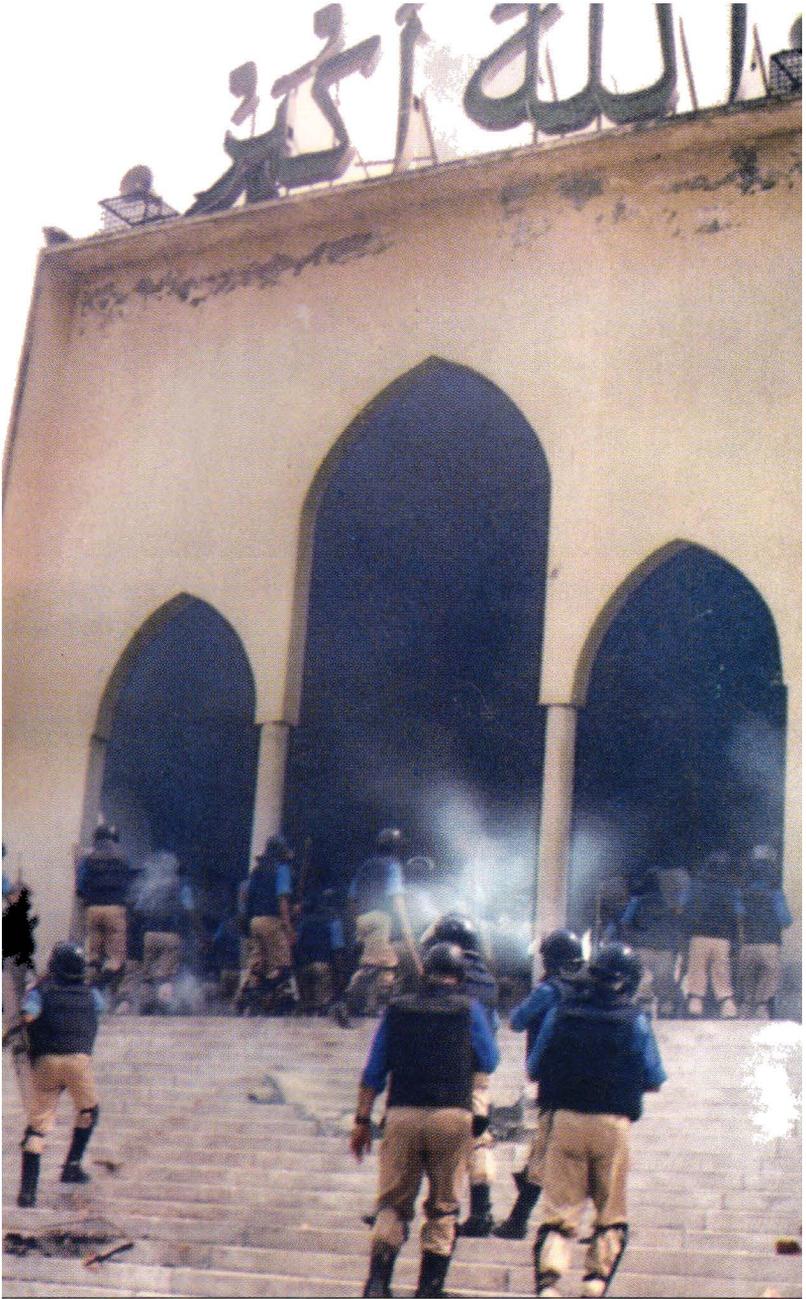
নঃ একটি প্রামাণ্য দলিল

ীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের ভিতরে বুট জুতা পায়ে ঢুকে আওয়ামী-পুলিশের হামলা

- দৈনিক ইনকিলাব॥ ০৭.০৪.২০০

াকার রাজপথে ইসলামপন্থীদের উপর নির্মম নির্যাতন ও পাইকারী ধরপাকড় চালায় ফ্যাসিস্ট আওয়ামী ্লিশ
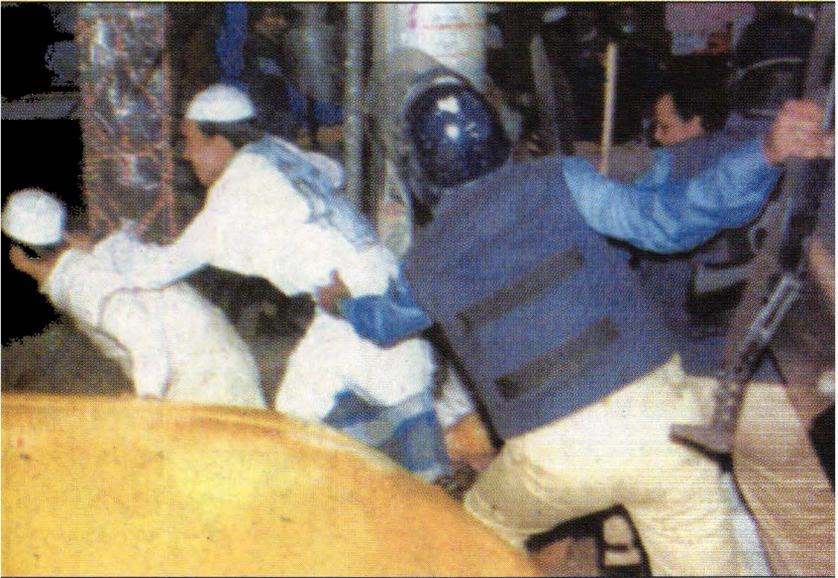
- দৈনিক ইনকিলাব॥০৫.০২.২০০১

াকার রাজপথে ইসলামপন্থীদের উপর নির্মম নির্যাতন ও পাইকারী ধরপাকড় চালায় ফ্যাসিস্ট আওয়ামী ্লিশ

- দৈনিক ইনকিলাব॥০৫.০২.২০০১

বিরোধীদের উপর নির্যাতন নিয়মিত ঘটনা
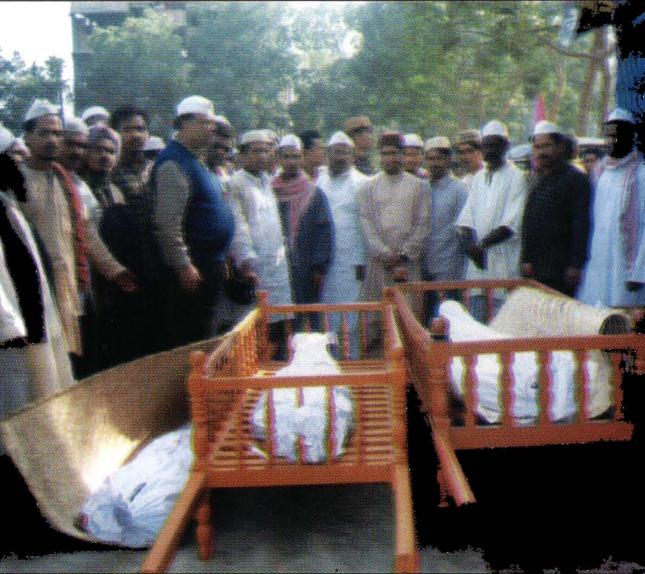
বি.বাড়ীয়ায় এনজিও এডাবের ষড়যন্ত্র আর আওয়ামী সরকারের লেলিয়ে দেয়া শহীদ ৯ জন হাফেজ-ওলামার লাশের ছবি

শুধু লাঠিপেটা নয়, প্রকাশ্যে রাস্তায় আলেম-ওলামাদের এরকম উলঙ্গও করা হয়

- দি ডেইলী ষ্টার॥০৪.০২.২০০১

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের একজন কেন্দ্রীয় নেতাকে পাকড়াও করে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী পুলিশ

:থে ইসলামপন্থীদের উপর নির্মম নির্যাতনের একটি বিভৎস দৃশ্য

- দৈনিক ইনকিলাব॥০৪.০২.২০০১

আওয়ামীলীগের পেটোয়া বাহিনী কর্তৃক ইসলামপন্থীদের নির্যাতনের একটি বর্বর দৃশ্য

- দৈনিক ইনকিলাব॥০৫.০২.২০০১

ঢাকার রাজপথে ইসলামপন্থীদের উপর নির্মম নির্যাতন ও পাইকারী ধরপাকড় চালানোর একটি দৃশ্য।
- দৈনিক ইনকিলাব ০৪.০২.২০০১

সিপিবি'র সমাবেশে বোমা হামলা করে হত্যা করে সেটাকে বিরোধী দলের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে সিপিবি হরতাল আহ্বান করলে পিকেটারদের উপর আওয়ামী গুন্ডা ও পুলিশ চড়াও হয়।
- দৈনিক ইত্তেফাক॥০২.০২.২০০১

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের ভিতরে বুট জুতা পায়ে ঢুকে আওয়ামী-পুলিশের হামলা
– দৈনিক সংগ্রাম॥ ০৭.০৪.২০০১
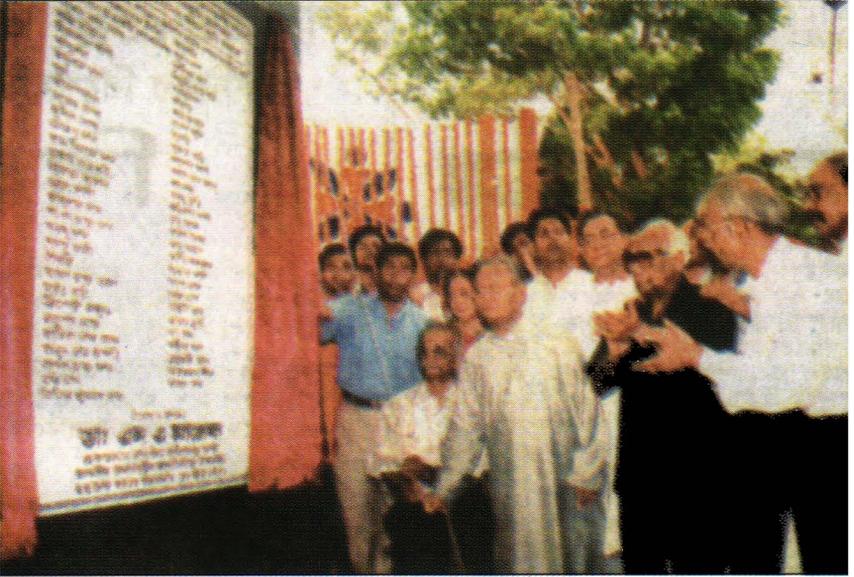
শেখ হাসিনার উপদেষ্টা ডা. এস.এ মালেক মন্ত্রপাঠ ও উলু ধ্বনির মাধ্যমে রমনায় কালি মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছে পরম ভক্তি ভরে। এই অনুষ্ঠান থেকেই আওয়ামী নেতা শুধাংশু শেখর হালদার 'ফতোয়াবাজদের নিশ্চিহ্ন না করলে কালীমাতা জাগবে না' বলে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়
- দৈনিক ইনকিলাব॥২৮.০৩.২০০১

ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের দালাল তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামী সরকার বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ধারাবাহিকতায় ভেঙ্গে ফেলেছে সেগুনবাগিচা মসজিদটি — ডেইলি স্টার॥২১.০৮.২০০০

জুময়ার নামাজ পড়তে আসাই তাদের অপরাধ। জাতীয় মসজিদ থেকে কোন রকম বাছবিচার ছাড়াই মুসল্লীদের ধড়পাকড়

— দৈনিক সংগ্রাম॥ ০৭.০৪.২০০১

াতুল মুকাররম মসজিদের ভেতরে হকিস্টিক দিয়ে মুসল্লিদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে হিটলারের তাত্মা আওয়ামী পুলিশ — দৈনিক মানবজমিন॥০৭.০৪.২০০১
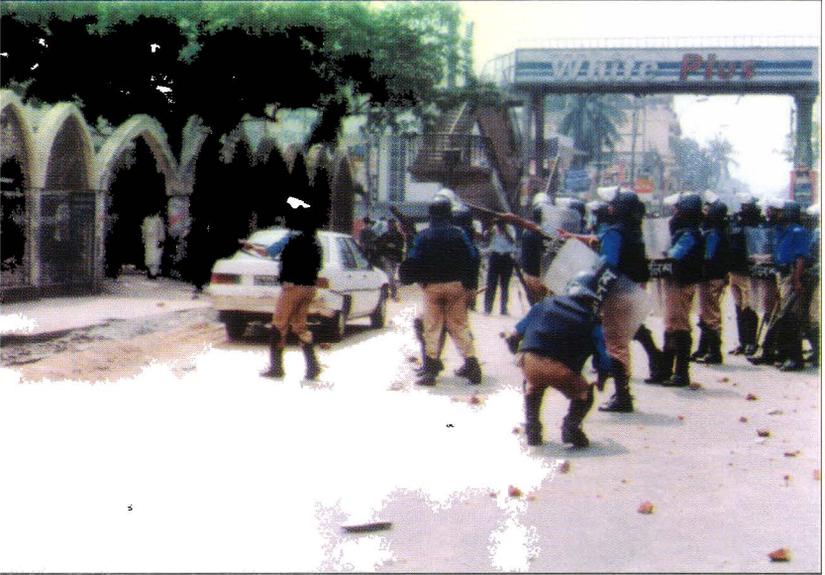
আওয়ামী পুলিশের আক্রমণের লক্ষ্যই বায়তুল মুকাররম

০৭.০৪.২০০১
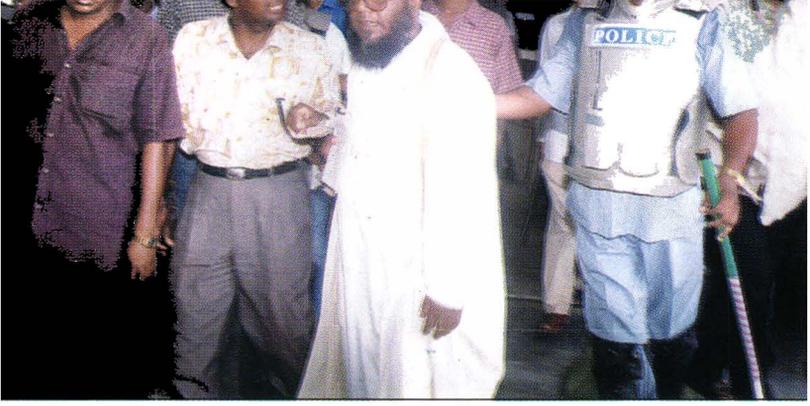
স্টিক হাতে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের একজন মুয়াজ্জিনকে মসজিদের ভেতরেই হেনস্তা হ আওয়ামী পুলিশ।

- দৈনিক সংগ্রাম॥০৭.০৪.২০০১

তুল মুকাররম মসজিদের ভেতরেই এক মুসল্লীকে পুলিশ এবং আওয়ামী সন্ত্রাসীদের যৌথ লাঠিপেটার দু:খজনক স্মৃতি

◆ আওয়ামী দু:শাসনঃ একটি প্রামাণ্য দলিল
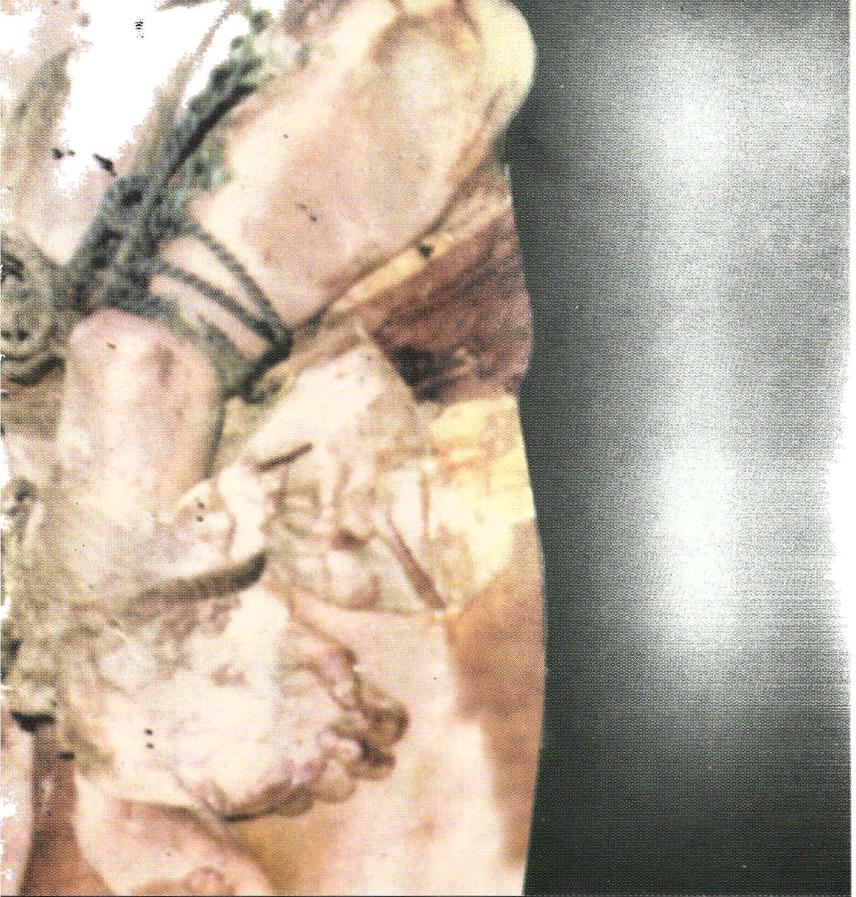
ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে বিপন্ন মানবতা। হাত-পা বেধে পৈশাচিকভাবে খুন করা হয় ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী নওমুসলিম খাইরুল ইসলামকে

২২.০২.২০০০

৫ আগস্ট ২০০০ মাগরিবের নামাজ পড়ে বের হলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা চাঁদপুরে শিবিরের সাবেক জেলা সভাপতি শাহজাহান মিয়াকে নৃশংসভাবে মেরে রক্তাক্ত করে রাস্তার পাশে ফেলে রাখে

বর আওয়ামী গডফাদার আবু তাহেরের সন্ত্রাসীরা শিবিরের সাবেক কর্মপরিষদ সদস্য এ.এফ.এম ক লক্ষ্মীপুরের একটি ব্যবসায়ী মিটিং হতে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে

০৫.০৯.২০০০

লিশের হাতে আহত দৈনিক জনতার ফটোগ্রাফার মিন্টু

নিক দিনকালের বয়োজ্যেষ্ঠ আলোকচিত্রী কামরুজ্জামানকে পুলিশ ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে

দৈনিক দিনকালের আরেক আলোকচিত্রী বাবুলের উপর পুলিশের এ্যাকশন

ডেইলি ইনডিপেনডেন্ট এর ফটোগ্রাফার বুলবুল আহমেদও পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন

–উইকলি এভিডেন্স

আওয়ামী পুলিশের হাতে জাতির বিবেক বলে খ্যাত সাংবাদিকরা নিগৃহীত হয়েছে বার বার। ডেইলি স্টারের আলোকচিত্রী আনিস পুলিশের হাতে আহত হয়
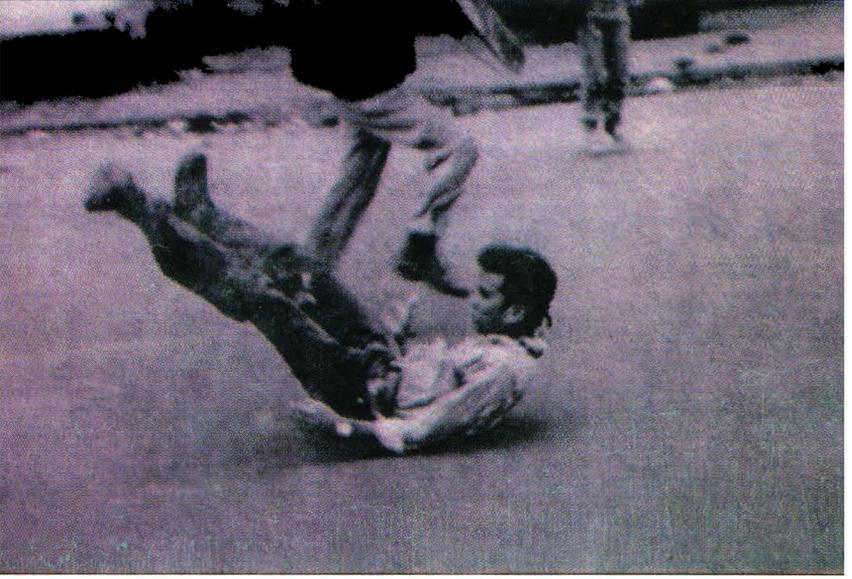
দৈনিক বাংলা বাজারের আলোকচিত্রী জয়কে পুলিশ রাস্তায় ফেলে দেয় এভাবে —উইকলি এভিডেন্স

একটা মুসলিম দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি হুগো শাভেজ প্রকাশ্যে চুম্বন করছেন আর হাসিনা তা সহাস্যবদনে উপভোগ করছেন

- দৈনিক মানবজমিন॥ ২৪.০৫.২০০১

একটা মুসলিম দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও শেখ হাসিনা ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট রোমানো প্রোদির সাথে হাসিমুখে করমর্দন করছেন

- রয়টার্স॥১৪.০৫.২০০১

২৭ জানুয়ারী ১৯৯৯ শেখ হাসিনা কলকাতার শান্তিনিকেতনের বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে দেয়া 'দেশিকোত্তম' ডিগ্রী গ্রহণ করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি দিলীপ সিনহা তার সিঁথিতে ও কপালে সিঁদুর ও চন্দনের তিলক এঁকে দেন।
-দৈনিক দিনকাল/বিটিভি

শুধু তাই নয়, দিলীপ সিনহা শেখ হাসিনার গলায় মালাও পরিয়ে দেন। তার গায়ে চাদর জড়িয়ে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইকে গুজরাল।

-দৈনিক দিনকাল/বিটিভি

ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতাহীন সব সময়েই শেখ হাসিনা পরপুরুষের সাথে করমর্দনে দারুন আগ্রহী। ০৩.০৮.২০০১ তারিখে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সাথে হোটেল স্যুটে দেখা করতে এসেও তিনি করমর্দন করেন - দৈনিক ইনকিলাব॥০৪.০৮.২০০১

ছাত্রলীগের গুন্ডারা মানিকগঞ্জে পবিত্র কুরআন পুড়িয়ে দেয় – দৈনিক সংগ্রাম॥২৩.০৭.২০০০

আওয়ামীলীগের ক্যাডারদের প্রকাশ্য রাজপথে এ্যাকশানের একটি দৃশ্য

- দৈনিক যুগান্তর॥১৫.০২.২০০১

আওয়ামী এম.পি. ইকবালের নেতৃত্বে দলীয় ক্যাডাররা পিস্তল উঁচিয়ে গুলি ছুড়ছে বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ মিছিলকে ছত্র-ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে। এ হামলায় ঝরে পড়ে ৪টি তাজা প্রাণ

১৫.০২.২০০১

আওয়ামী কাপালিকদের কাণ্ড : ২২ মার্চ ২০০১ ঢাকায় সন্ত্রাসীরা কমলাপুরের এই কিশোরীকে ধর্ষণ, হত্যা ও তার শরীর কেটে টুকরা টুকরা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার মাথা ও শরীরের চামড়া পর্যন্ত ছাড়িয়ে দেয়।

সত্য কথা লেখার অপরাধে ফেনীর সাংবাদিক টিপুকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মেরে পঙ্গু করে দিয়েছে আওয়ামী সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারীর গুন্ডা-পান্ডারা – দৈনিক প্রথম আলো॥৩০.০১.২০০১

প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকার নীলক্ষেতে ছাত্রলীগ ক্যাডার হেমায়েত পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করছে। এ ঘটনায় টেম্পুচালক লিটন নিহত হয় (ইনসেটে) - দৈনিক ইত্তেফাক॥১৫.১২.২০০০

ফিলিস্তিন নয়, কাশ্মীর নয়, নয় বসনিয়া-চেচনিয়া। অমানবিকতার জঘন্যতম একটি চিত্র। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্র্যাজেডির এই দৃশ্যে মাদ্রাসাছাত্র শহীদ সুজনকে খুন করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সরকারী পেটোয়া বাহিনী - দৈনিক মানবজমিন॥৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১

া রাজপথে দিনে-দুপুরে আওয়ামী পুলিশ কর্তৃক জনৈকা ভদ্রমহিলার বস্ত্রহরণের বর্বর দৃশ্য
- দৈনিক দিনকাল॥১২.০৫.১৯৯৯

বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় ছাত্রলীগ নেতা রাসেল ও তার সহযোগীদের হাতে 'থার্টিফার্স্ট
ট' যুবতী বাঁধনের বস্ত্র হরণের নির্লজ্জ দৃশ্য - দৈনিক মানবজমিন॥০২.০১.২০০০

শৃংখলার অভিভাবক ও রক্ষক আওয়ামী মন্ত্রীরা (সাজেদা চৌধুরী, মোফাজ্জল মায়া, নাসিম) আদালতের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিলের নেতৃত্ব দেন - দৈনিক দিনকাল॥১৯.০৪.২০০০

ণর নিরাপত্তার রক্ষক পুলিশ, অথচ গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান দপ্তরের পানির ট্যাংকেই ˙গেল একজন হতভাগার লাশ - ২৫.৩.১৯৯৯
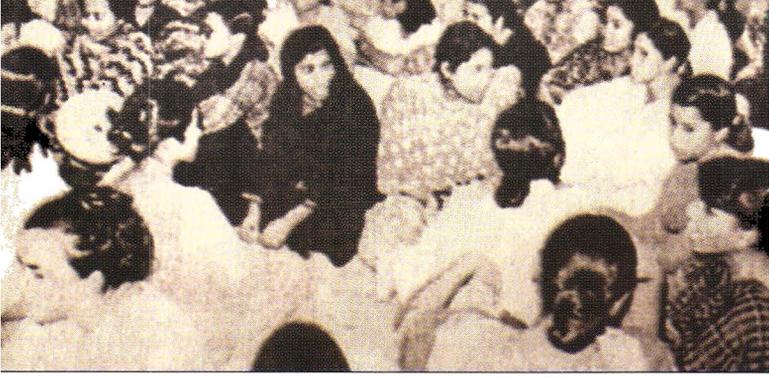
গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ ক্যাম্পাসে আওয়ামী ছাত্রলীগের ধর্ষক মা
র বিচারের দাবীতে অনশন ধর্মঘট পালন করে

য় তরাজউদ্দিনকে খুনসহ বহু খুন, সন্ত্রাস, বাড়ী দখল, মার্কেট দখলসহ অনেক অপকর্মের ন
ামী মন্ত্রী মায়ার পুত্র দিপুকে অবশেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পুলিশ গ্রেফতার করে

মহান ব্যক্তিরা বেঁচে থাকবেন তাঁদের কর্মের মাঝে, একটি উন্নয়নশীল দেশে তাদেরকে স্মরণীয় করার জন্য কোটি টাকা খরচ করে মূর্তি গড়ার কোন প্রয়োজন আছে কি?
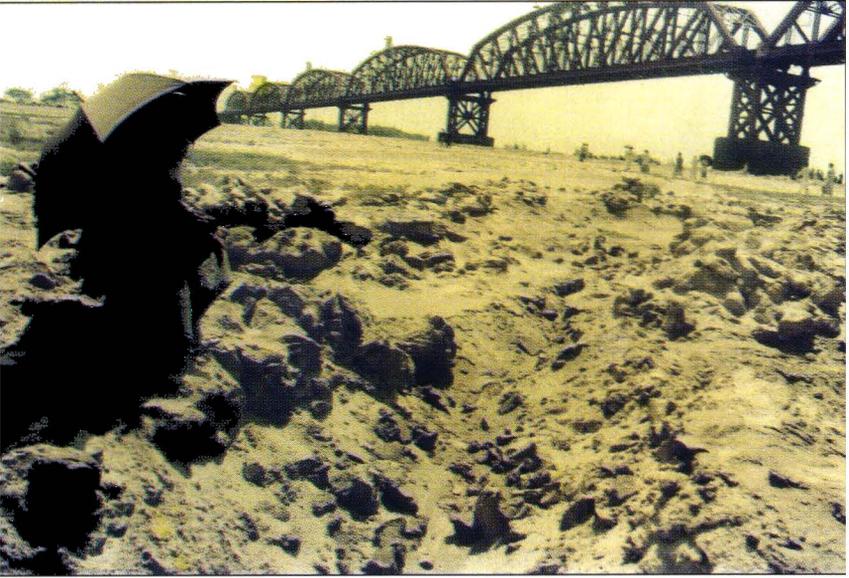
'পানি সমস্যার সমাধান-শেখ হাসিনার অবদান'। আওয়ামী লীগাররা এই শ্লোগান হরদম দিয়ে বেড়াচ্ছে। ক্ষমতায় আসার পরপরই তারা ভারতের সাথে তথাকথিত ৩০ বছরের পানি চুক্তি করে বাংলাদেশের নদী সমুহের পানি শুকিয়ে ফেলার স্থায়ী বন্দোবস্ত করে। হার্ডিঞ্জব্রীজের নীচে শুকনো নদীবক্ষ তারই প্রমাণ।

চার দলীয় জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর উপর নিক্ষিপ্ত টিয়ার গ্যাস থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন। ফ্যাসিষ্ট আওয়ামীলীগ দেশের অন্যতম বৃহৎ দলের প্রধানকেও তাদের উৎপীড়ন থেকে রেহাই দিলনা

- উইকলি এভিডেন্স॥১৭.৯.১৯৯৯
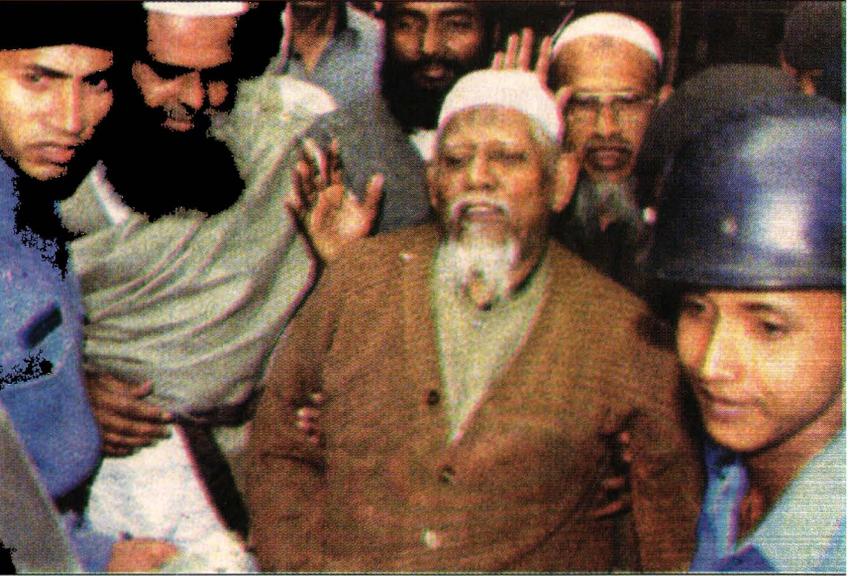
৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১ গভীর রাতে ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান বয়োঃজ্যেষ্ঠ আলেমেদ্বীন শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, মুফতী ইজহারুল ইসলাম এবং এ.আর.এম আবদুল মতিনকে আওয়ামী সরকারের নির্দেশে গ্রেফতার করা হয়

বাংলাদেশের রৌমারী সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বি.এস.এফ এর আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে গিয়ে ৩ বিডিআর শাহাদাত করেন। ছবিতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে উক্ত শহীদ পরিবারগুলোর একটিকে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে দেখা যাচ্ছে।
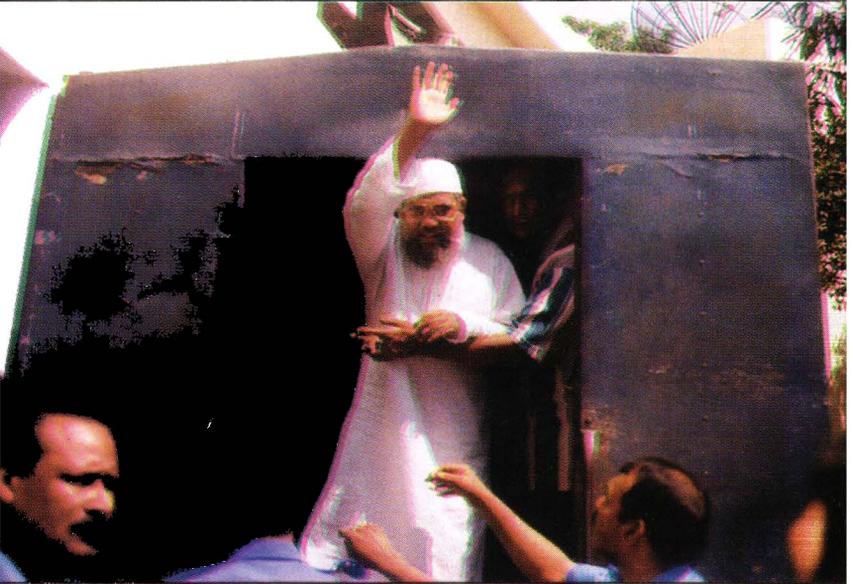
চারদলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শীর্ষনেতা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল জননেতা আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ-কে আওয়ামী পুলিশ বিনাকারণেই বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে

- দৈনিক সংগ্রাম॥০৫.০৪.২০০১

পল্টন ময়দানে চার দলীয় ঐক্যজোট আয়োজিত জনসমুদ্রে শীর্ষ নেতৃবৃন্দ জনতার উদ্দেশ্যে হাত তুলে অভিনন্দনের জবাব দিচ্ছেন - ডেইলি অবজারভার॥১০.০৭.২০০১
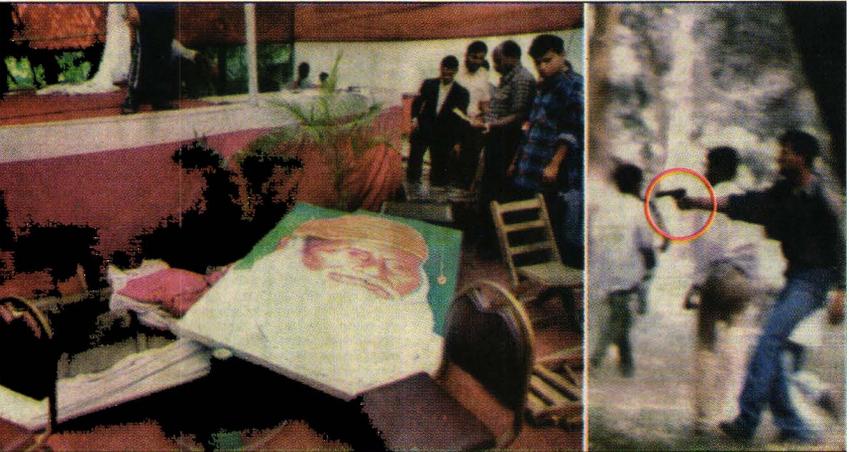
বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর কনভেনশনে হামলা করে তছনছ করে দেয় আওয়ামী-ছাত্রলীগ, দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজনীতিক মওলানা ভাসানীর ছবি ছুঁড়ে ফেলা হয়। ডানে জনৈক ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী পিস্তলের গুলি ছুঁড়ছে - দৈনিক প্রথম আলো॥২৫.১২.১৯৯৯

আওয়ামী সরকারের পদত্যাগের দাবীতে ঢাকার মুক্তাঙ্গণে স্মরণকালের বৃহত্তম ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য - দৈনিক সংগ্রাম॥২৫.০৩.২০০১

অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারনে আওয়ামী লীগের নারায়ণগঞ্জ অফিসে বোমাবাজিতে ২১ জন মারা যায়। নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পড়ে আছে সারি সারি লাশ। এই হত্যাকাণ্ড বিরোধী দলের উপর চাপানোর চেষ্টা করা হয়েছে, অথচ এর তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি

- দৈনিক প্রথম আলো॥১৭.৬.২০০১

১৭ জুন ২০০১ চারদলীয় ঐক্যজোটের প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ির বহর বেশকয়েকটি স্থানে আটকে দেয় আওয়ামী গুন্ডারা। তারা খালেদা জিয়ার গাড়িতে গুলিও করে। ছবিতে ঐদিন সাংগঠনিক সফরে যাওয়ার পথে আমিনবাজারে অবরুদ্ধ খালেদা জিয়া। —দৈনিক যুগান্তর : ১৮.০৬.২০০০১

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতেও সরকারী পুলিশ এতো সহজে কোন প্রকার ধর্মীয় উপসনালয়ে প্রবেশ করে না। অথচ আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশের পুলিশ বুট-জুতা পায়েই মসজিদে ঢুকে বার বার এর পবিত্রতা নষ্ট করেছে। ছবিতে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে পুলিশ আক্রমণাত্মক এ্যাকশনে ঢুকছে এবং নিরীহ মুসল্লিদেরকে সারেভারের ভঙ্গিতে বের করে দিচ্ছে। —দৈনিক ইত্তেফাক : ১১.১১.২০০০

হাই কোর্টের রায় পছন্দ হয়নি, তাই 'ভাঙ গাড়ী'। ১৪ ডিসেম্বর ২০০০ হাইকোর্টের রায়ে সন্তুষ্ট না হতে পেরে রাস্তায় গণহারে আওয়ামী-ছাত্রলীগ কর্মীরা প্রায় দুইশত গাড়ি ভাঙচুর করে। এক অসহায় মহিলা করজোড়ে তার গাড়ী না ভাঙার জন্য ছাত্রলীগ গুন্ডাদের কাছে মিনতি করছে

—দৈনিক প্রথম আলো : ১৫.১২.২০০০

উপসংহার

বাংলাদেশ আজ এক চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। দেশের সীমান্তে বার বার হানা দিচ্ছে তার বৃহত্তর প্রতিবেশী রাষ্ট্র পররাষ্ট্রলোভী আগ্রাসী ভারত; অভ্যন্তরে সক্রিয় জাতিদ্রোহী পঞ্চমবাহিনী ও বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তির বেতনভুক্ত নানা কিসিমের এজেন্ট নিয়োগীর দল। বিদেশী শক্তির মদদপুষ্ট এসব দেশদ্রোহী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী কখনো রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীর ছদ্মাবরণে- কখনো এন.জি.ও (NGO) বা সমাজকর্মীর আবরণে, আবার কখনো খ্রীষ্টান মিশনারী সংস্থার বেশে দেশের আনাচে-কানাচে - নগরে-বন্দরে আর গ্রামে-গঞ্জে তাদের বিধ্বংসী অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ যে দলটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার বলে দাবীদার - বাংলাদেশে তাদের এবারকার নব পর্যায়ের শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) ঠিক তাদের প্রথম পর্বের (১৯৭২-১৯৭৫) নৃশংস নৈরাজ্যকর ফ্যাসিষ্ট কায়দায় দেশে এক বিভৎস স্বৈরশাসনের আরেক কালো অধ্যায়ের ইতিহাস রচনা করে গেল। তারা তাদের এবারকার পাঁচ বছরের ঘনকৃষ্ণ মসীলিপ্ত অপশাসনে বাংলাদেশে হত্যা, ধর্ষণ, গুম, অপহরণ, নারী-নির্যাতন, ইসলাম দলন, ওলামা ও দাড়ী-টুপি ওয়ালাদের উপর নিপীড়ন, লুটপাট, জবর দখল, সন্ত্রাস-চাদাঁবাজি, ঘুষ-মুনাফাখুরী, ক্যাম্পাস দখলসহ এহেন কুকর্ম-অপকর্ম নেই - যা তারা করতে ছাড়েনি। এক কথায়, আওয়ামী লীগের এ নব পর্যায়ের শাসনামল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস "আওয়ামী-জাহিলিয়াত"-এর ইতিহাস হিসেবেই কুখ্যাতি নিয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এদের এবারকার শাসনামলে জাতি দেখেছে - কিভাবে আওয়ামী 'ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা' পবিত্র ইসলাম ধর্মকে ৯০% মুসলমানদের দেশ থেকে উৎখাত করার হীন উদ্দেশ্যে ভেঙ্গে ফেলেছে মসজিদ; বন্ধ করে দিয়েছে শত শত মাদ্রাসা; নিহত ও আহত করেছে শত শত আলেম-ওলামা ও দ্বীনদার মুসল্লীদের; পুড়িয়ে দিয়েছে এবং ডাসবিনে নিক্ষেপ করেছে আল্লাহর কিতাব মুসলমানদের কলিজার ধন পবিত্র কোরআন শরীফ। জাতি অবাক বিস্ময়ে দেখেছে - কিভাবে আওয়ামী ছাত্রলীগের বড় নেতা পালন করেছে তার "ধর্ষণের সেঞ্চুরী-র রজত জয়ন্তী"। জাতি অসহায়ের মত আরো অবলোকন করেছে কিভাবে দেশের আইন-শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বেই লাঠি ও কিরিচ-চাপাতি নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট-হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ মিছিল বের করার জঘন্য মহড়া হল। এদেশে যেন এখন, "প্রতিকার বিহীন শক্তির অপরাধে, বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে"। দেশের নির্বাচিত সরকার প্রধান আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে এদেশে পাদুয়া-বিজয়ী দেশের সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী বীর বি.ডি.আর. (B.D.R) বাহিনীকে সরে আসতে হলো নিজেদের সার্বভৌম সীমান্ত অঞ্চল পাদুয়া ছেড়ে। উপরন্তু, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা বি.ডি.আর. বাহিনীকে দেশপ্রেমের খেসারত হিসেবেই শুনতে হল "রাজাকার" আর আই.এস.আই. (I.S.I) -এর এজেন্ট হিসেবে গালি ও ভর্ৎসনা। শুধু তাই নয়, নিছক ক্ষমতায় টিকে থাকার মানসে প্রভুরাষ্ট্র ভারতকে খুশী করা ও পক্ষে রাখার জন্য ক্ষমতায় এসেই ভারতের তাবেদার আওয়ামী লীগ জাতির সাথে

চরম গাদ্দারী করে দেশের "এক দশমাংশ" সার্বভৌমাঞ্চল পার্বত্য-চট্টগ্রামকে তুলে দিয়েছে ত্রিশহাজার নিরীহ বাংলাভাষাভাষী মুসলমানদের হত্যাকারী খুনি সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন ভারতীয়দের চর চাকমাদের হাতে। আওয়ামী লীগের এবারকার পাঁচ বছরের দুঃশাসনের আমলে আমরা এমনি আরো হাজারো দেশদ্রোহীতা মূলক অধিনতাধর্মী দেশ বিকানো চুক্তি, সমঝোতা, মতৈক্য ইত্যাদির সাক্ষাত পাই। এক কথায় বলা যায়, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গত পাঁচ বছরে তার পিতার স্বৈরশাসনকে হার মানিয়েছেন। দেশের অর্থনীতি এখন ঝাঁঝরা; নিরাপত্তা সার্বভৌমত্ব শকুন আর হায়েনার করাল গ্রাসের নিচে আর জাতির অস্তিত্ব আওয়ামী-সুহৃদ আগ্রাসী হিন্দুস্তানরূপ অজগরের হিংস্র রসনার অষ্টে-পৃষ্টে বন্দী। জাতিকে তাই - শেষ প্রচেষ্টা স্বরূপ আজ এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব তথা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সমরে আজ দল মত নির্বিশেষে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী এবং আগ্রাসন বিরোধী সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সীসা ঢালা শক্তিশালী জাতীয় ঐক্য ও দেশপ্রেমিক সংহতিবন্ধন। নির্বাচনী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ঐক্যবদ্ধভাবে পরাভূত করতে হবে ভারতের পাঁচাটা দালাল চরম ধর্মদ্রোহী মীর জাফর আওয়ামী। এ জন্য জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কোনই বিকল্প নেই। এ ঐক্য ও বিকল্প যদি ব্যর্থ হয় তবে ১৭৫৭-এর পলাশীর পরাজয়ের মত দেশ ও জাতির ভাগ্যাকাশ থেকে আবারও আমাদের আজাদীর সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়বে। যার নব উদয়ের সুবেহ সাদেকের জন্য হয়তো আরো কয়েকশত বছর জাতিকে গোলামীর জিঞ্জির পরে অপেক্ষায় থাকতে হবে চরম জিল্লাতি আর পরম যন্ত্রনার জিন্দেগীকে যাপন করে।

মুখ্য তথ্যপঞ্জি

- আবু রূশ্‌দ, *বাংলাদেশে 'র' ঃ আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান*, জিনাফ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১
- মুনির উদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ ঃ বাহাত্তর থেকে পচাঁত্তর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮০
- মিজানুর রহমান চৌধুরী, *রাজনীতির তিনকাল*, হাফেজ-মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০১
- আহমেদ মুসা, *ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ*, ঢাকা
- স্টালিন সরকর, *বাংলাদেশের রাজনীতি, রুমা প্রকাশনী, ঢাকা*
- *4-years of Tyranny and Misrule*, *Special Volume of Weekly Evidence,* Dhaka (Vol. 18th year, No. 16-20, July-27, 2000)
- Ashoka Raina, *Inside RAW ঃ The Story of India's Secret Service*, New Delhi, 1989
- R. Swaminatham (Interview), *Illustrated weekly of India*, Oct-14, 1990.
- Ashok A. Biswas "RAW's Role in Furthering India's foreign policy", *The new Nation,* 31 Aug. 1994.
- Anthony Mascarenhas, *Legacy of Blood*, London, 1982.
- Different volumes /Issues of the following dailies, weeklies of Bangladeshঃ
  দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক যুগান্তর, ডেইলী ষ্টার, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক বাংলার বাণী, দৈনিক মানবজমিন, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক জনকণ্ঠ, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, অবজারভার, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, সাপ্তাহিক যায় যায় দিন, উইকলী হলিডে।
- *বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন যেমন মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, অধিকার ইত্যাদি।*